নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG : ১ম পত্র 'ক'
এবং ১ম পত্র 'খ'
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়

1 □ প্রাক-তুর্কী পর্ব : ১০ম-১২শ শতক

একক 1	সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত বাঙালির সাহিত্য	7-18
একক 2	চর্যাপদ	19-47
একক 3	চৈতন্য-পূর্ব কৃষ্ণকথার ধারা	48-95
একক 4	বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্য	96-102
একক 5	প্রাক্-চৈতন্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য	103-131
একক 6	প্রাক্-চৈতন্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য	132-148

পর্যায়

2 □ চৈতন্যযুগ : ১৬শ শতক-মধ্য, ১৭ শতক
এবং চৈতন্যোত্তর যুগ : মধ্য ১৭শ-১৮শ শতক

একক 7	বাংলা সাহিত্য : চৈতন্য যুগ	151-195
একক 8	বাংলা সাহিত্য : চৈতন্যোত্তর যুগ	196-234

পর্যায়

3 □ রবীন্দ্রনাথ (সমগ্র)

একক 1	রবীন্দ্র সাহিত্য (কাব্য-কবিতা)	237-257
একক 2	রবীন্দ্রনাথ নাটক	258-266
একক 3	রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস	267-288
একক 4	রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও প্রবন্ধ	289-307

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৪ □ বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্য

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ মূল আলোচনা

৪.৩ অনুশীলনী

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের উদ্ভবের পটভূমি ও সুফীধর্মের সঙ্গে তার যোগ আবিষ্কার করতে পারবেন। হিন্দী-অওধী ও ফারসী ভাষায় লেখা অন্যান্য প্রণয়কাব্য কীভাবে বাঙালি কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে জানতে পারবেন। রোমান্স প্রণয় কাব্যের প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তি পরিচয় সম্ভবন্ধে জানা সম্ভভব হবে। সগীরের কাব্য ইউসুফ জোলেখার কাহিনী, প্রেমভাবনা, কবিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ ধারণা করতে পারবেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত হল মুসলমান কবি রচিত বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের ধারা। এ ধারায় রচিত সাহিত্য পূর্বাগত সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার বর্জন করে নির্ভেজাল মানুষকেই তার উপজীব্য করে তুললো। এতদিন বাঙালি হিন্দু কবিরা যা কিছু লিখে আসছিলেন তার সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে মিশে ছিল নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলির অনুষঙ্গ। কিন্তু সেই ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল মানবাশ্রিত কাব্য রচনার নজির গড়তে পারলেন মুসলিম কবিরা। এর পিছনে ইসলামের ভূমিচারী দৃষ্টির ও সুফীধর্মের আত্যন্তিক মানবপ্রীতির সদর্থক ভূমিকা ছিল। এটা তথ্যসমর্থিত ঘঠনা যে, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু কবিরা মুসলমান কবিদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও তাঁদের লেখাতে মানুষেরা সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞান তেমন স্পষ্টতা পায়নি। মনসামঙ্গলে চাঁদ পৌরুষের বলে দৈব-প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বামহাতে পূজা দিয়ে দৈবীমাহাত্ম্যেরই জয় ঘোষণা করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যটি ছিল গভীরতর অর্থে মানবজীবনের ইতিকথা, কিন্তু তাঁকেও যুগধর্মের নীতিনিয়ম মেনে স্বীকার করে নিতে হয় ধর্মের বর্ম। রক্তে-মাংসে গড়া ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুক্ত বাস্তব সংসারের মানুষ ছিলেন শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁকওে কি সময়ের আবেষ্টনী থেকে বের করে আনা সম্ভভব হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সেকালে লেখা সমস্ত চৈতন্যজীবনীতে বর্ণাশ্রমধর্মের যুগাযুগান্তব্যাপী গভীরতল সঞ্চারী শিকড়কে উপড়ে ফেলার দরুন তিনি সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে পরিগণিত হন ত্রাতা বলে। যুগের আবহ সেই সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা মানুষটিকে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্ণের অবতার বলে নির্দেশ করেছে। অথচ এইসব সাহিত্য-প্রতীতির পাশাপাশি মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয় আখ্যানধর্মী কাব্যের আত্মিক তফাৎ কত দুস্তর। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মানুষকে দিলেন মুক্তি— সেই মানুষ যে দেহ ও মনের ক্ষুধায় কাতর, যার আছে প্রবৃত্তি, আসক্তি, বিবেক, নৈতিকতা, দয়া, ক্ষমা, লোভ, মোহ, যার কাছে প্রেম-মিলন-বিরহ কোন তত্ত্বের বিষয় নয়, জীবনের জ্বলন্ত বাস্তব। মনে রাখা প্রয়োজন হিন্দুধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও প্রতিষ্ঠান নর্ভির, সেখানেও নানাবিধ কৃত্য, সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি আছে। কিন্তু সে ধর্মের অনুশাসনে

মানুষের ভৌমচেতনা বেশ স্পষ্ট। ধর্ম প্রবক্তা হজরত মহম্মদ কোথাও দাবি করেননি যে তিনি ঈশ্বরকল্প কোন সত্তা, বরং তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা : 'আনা বাশারুম মিসলুকুম্'—অর্থাৎ আমি তোমার মতই একজন মানুষ। হয়তো এ পথ ধরেই মুসলমান কবিদের হাতে সাহিত্যে মানবতাবাদের সঞ্চার ঘটেছিল। তবে তার পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে, যাকে আশ্রয় করে এইসব কবিরা রোমান্স কাব্য সাধনায় স্বতন্ত্র একটি ধারার জন্ম দিয়েছিলেন সেই মরমীয়া সূফীবাদ ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। সূফীধর্ম নৈষ্ঠিক ইসলামেরই একটি শাখা, যাঁরা শরীয়তের বিধানকে শেষ গন্তব্য হিসেবে না দেখে মারিফতের মাধ্যমে আল্লাহের নৈকট্য লাভ করতে ও আত্মলীন হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেমময়। তাঁর প্রেম ও করুণা লাভ করাই সাধকজীবনের লক্ষ্য। আল্লাহের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক মার্গের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে আরব-ইরানে রোমান্স কাব্যধারা গড়ে ওঠে। সেই অর্থে মানবমানবীর প্রেমকাহিনী ছিল সূফী কবিদের কাছে রূপক। জালালুদ্দিন রুমী, আবদুর রহমান জামী, ফেরদৌসী প্রমুখ সূফী কবিগণ রাজা-বাদশাহ-আমীর-বণিক প্রভৃতি শাসক ও বণিক শ্রেণীর প্রচলিত প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। অনেকের ধারণা, সামন্ত সমাজব্যবস্থায় ধার্মিকতার ও নৈতিকতার সাথে আপোষ করতে কবিদের এ পথ বেছে নিতে হয়েছিল। যাইহোক, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সুফীদের আগমন ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাঁদের মারফত বাংলাদেশে এইসব প্রণয়বৃত্তান্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি মুসলমান কবিরা স্বসংস্কৃতির রসে নিজেদের মনের শিকড় ভিজিয়ে নেওয়ার তাগিদে আরবী ও ফারসীতে লেখা এইসব কিস্সার শরণাপন্ন হন। তবে তাঁদের কাব্যে এর ধর্মীয় বাতাবরণ ও তাত্ত্বিক নির্গলিতার্থটি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁরা খাঁটি মানুষকেই তার যাবতীয় ত্রুটি ও অম্পূর্ণতাসহ সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্যের উপজীব্য যে মানুষ এবং ভক্তিরস ছাড়া সাহিত্য যে বিশুদ্ধ জীবনরসের উপর নির্ভর করতে পারে এই ধারণায় মধ্যযুগের বাঙালি পাঠককে দাঁড় করাতে সমর্থ হল এই বিশেষ কাব্যধারা। এ ধারার প্রথম সূচনাকার বলে যাঁকে দাবি করা হয়েছে তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

বাংলা রোমান্স প্রণয়-কাব্যের ধারাটি অনুবাদ শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ এতে ব্যবহৃত কাহিনীগুলি কবিদের নিজস্ব উদ্ভাবনা ছিল না, এদের উৎস লুকিয়ে ছিল অন্যত্র। সমালোচকেরা ভাষা, চরিত্র ও কাহিনী পটভূমির প্রেক্ষিতে সেই উৎসকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হিন্দী-অওধীতে লেখা ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারা, অন্যটি আরবী-ফারসীতে লেখা আরবীয়-ইরানীয় প্রণায়োপাখ্যানের ধারা। তবে এই দুই ধারাতেই লেখক হিসেবে যাঁদের পাই তাঁরা ধর্মে মুসলমান এবং কম-বেশি সূফীতত্ত্বের দ্বারা প্রাবিত। দ্বাদশ শতক থেকে হিন্দী অওধীতে যে রোমান্টিক প্রণয়-আখ্যান চলে আসছে তার প্রমাণ মেলে আবদুর রহমানের সংনেহয় রাসয়, চান্দ বরদাইয়ের পৃথ্বিরাজ রাসউ, আমীর খসরুর খিজির খান ও দেবলরানী, মুল্লা দাউদের চান্দায়ন, মিঞা সাধনের মৈনাসৎ, জায়সীর পদুমাবৎ প্রভৃতি কাব্য থেকে। ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে মুখ্যত হিন্দু চরিত্রের আশ্রয়ে মুসলমান কবিরা এ ধরনের ১৪/১৫টি বিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সমানভাবে ফারসীতে লেখা হয়েছে ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা, লায়লীমজনু, খসরু-শিরীন, সয়ফলমুলুক-বদিউজ্জমাল, হফ্ত পয়কর, সলমন-অবসাল, হানিফা-কয়রাপরী, জেব্লমুলুক-শামারোখ প্রভৃতি বই। বলা হয়ে থাকে যে, এগার শতকের কবি ফেরদৌসী ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা কাব্য রচনা করে এ শ্রেণীর কাব্যের দ্বার উন্মোচন করেন। যদিও সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পনের শতকের কবি আবদুর রহমান জামী। এই গ্রন্থটিরই বাংলা অনুবাদ করেন শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমের রোমান্টিক আখ্যান। তাঁর এ পথেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিলেন মুহম্মদ

কবীর, শা বিরিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খা, দৌলত কাজি, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম, শেখ সাদীর মতো খ্যাত-অখ্যাত কবিরা।

৪.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যে কোন সাল-তারিখের উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে 'রাজ্যক ঈশ্বর' পৃথিবীর সার কোন এক 'মহা নরপতি গ্যেছ'-র কথা বলেছেন, তিনি 'রাজ-রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত। দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত।। মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।' বলা বাহুল্য 'গ্যেছ' গিয়াসউদ্দনের সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপ। এখন মুশকিল এই যে, মধ্যযুগে বাংলার শাহীতক্তে সূরবংশীয় একাধিক গিয়াসুদ্দিনকে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। 'বাংলাসাহিত্যের কথা' গ্রন্থে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন যে, বাংলার মসনদে একই নামধারী তিনজন সুলতান রাজত্ব করেছেন। যথা—গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-৬০), গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ (১৫৬০-৬৩) এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩-৬৪)। এঁরা ব্যতীত আর একজন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ রাজত্ব করেছেন ১৩৮৯-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে। অধিকাংশ গবেষক এই শেষোক্ত সুলতানের রাজত্বকালে মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল বলে নির্দেশ করেছেন। কেননা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বাইরে এই ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, গুণীর পৃষ্টপোষক, ধার্মিক এবং সজ্জন—যে তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কবির বর্ণনা। তাছাড়া সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এই সুলতানের গুণকীর্তন করেছিলেন পারস্যের কবি হাফিজ ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। এইসব যুক্তির অবতারণা করে শহীদুল্লাহ কাল-পরম্পরায় সগীরের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—'মধ্যযুগের আদি লেখক বড়ু চণ্ডীদাস, তৎপরে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং তৃতীয় লেখক কৃত্তিবাস।' বলিষ্ঠ বিরোধী তথ্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তকে মানতে বোধহয় বাধা নেই।

সগীরের কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। তিনি এর কাহিনীটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে ধন্দ আছে। অনেকের মতে, কাব্যটির উৎসে ছিল 'শাহনামা'-র রচয়িতা ফেরদৌসী তূসীর (৯৩৭-১০২০ খ্রি.) লেখা ফারসী কাব্য 'ইউসুফ-জোলেয়খা', যেটি একাদশ শতকের রচনা। এই গ্রন্থের আর একটি আদর্শের কথাও বলেছেন কেউ কেউ। সেটি হল আবদুর রহমান জামীর লেখা 'ইউসুফ-ওয়া-জোলয়খা', যার রচনাকাল ১৪৮৩ খিষ্টাব্দ। কিন্তু এই মতটিকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে যে, সগীর এ কাব্য গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) লিখে ফেলেছিলেন। এছাড়া কবি নিজে আর একটি উৎসের কথা জানিয়েছেন তাঁর কাব্যের সূচনায় এবং আমাদের মনে হয় সেটাই পূর্বোক্ত দুইজন আরবীয় কবিরও কাব্য-উৎস। উৎসটি হল পবিত্র কোরাণ শরীফ। ঐ ধর্মগ্রন্থের 'সূরা ইউসুফ' অধ্যায়ে মোট ১১১টি আয়াতে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মোপদেশ দান। ধার্মিক এবং চরিত্রবান ব্যক্তিরা আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হন—এইরকম একটা নীতিকথা বেরিয়ে আসে কোরানে বর্ণিত আখ্যান থেকে। সগীরও ভক্তজনের 'শ্রুতি-ঘট' পরিপূরণের জন্য সেই কাহিনীকেই আশ্রয় করেছেন। কবির স্বীকারোক্তি—'কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ। ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত অশেষ।। কহিব কেতাব চাহি সুধারস পূরি।' ড. ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে সগীরের কাব্যাদর্শ প্রসঙ্গে আর একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন, সেটি কোরানের তফসীল বা ব্যাখ্যাপুস্তক, যার লেখক ইমাম গজ্জালী। এতে

দেখা যায়, জোলেখা পশ্চিমদেশের রাজা তাউমুসের কন্যা ছিলেন। কবিও কাব্যমধ্যে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া আরেও অনেক প্রসঙ্গের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তফসীরের তুলনায় সগীরের বর্ণনা বর্ণাঢ্য, পল্লবিত, নাটকীয়, পারস্পর্যযুক্ত ও আবেগমধুর। আরো একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস্ অংশে যোসেফের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গেও কাঠামোগত মিল আছে কোরানের ইউসুফ কাহিনীর। এবং এখানেই শেষ নয়। কবি সগীর নিজে তাঁর প্রয়োজন মতো বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত গল্পের খণ্ডাংশগুলি সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন ও একটি আস্ত স্বকপোলকল্পিত কাহিনী গল্পের শেষাংশে জুড়ে দিয়েছিলেন। সেটি হল ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ শাহাবালের কন্যা বিধুপ্রভার প্রণয়বত্তান্ত। মুসলমানী আখ্যানে হঠাৎ হিন্দু চরিত্রের আমদানি কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। তার মীমাংসা খোঁজা যায় ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে—'এই বর্ণনাতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান কবি পূর্বতন হিন্দু সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-৩য় খণ্ড)।

মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য শুরু করেছেন আল্লাহ ও রসুলের বন্দনা দিয়ে। অতঃপর আছে মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজস্তুতি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের দরবারের কর্মচারী ছিলেন। নইলে তাঁর রাজস্তুতি অত প্রগাঢ় হতো না। আখ্যানের সূচনায় আছে তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি এবং স্বপ্নদর্শনে এক রূপবান পুরুষের প্রতি রূপাসক্তি। কিন্তু জোলেখার সঙ্গে ভুলক্রমে আজিজ-মিশরের বিবাহ হয় এবং আজিজ সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ নয় জেনে জোলেখা হতাশ হয়ে পড়েন। এরপরে কোরান ও ফেরদৌসীর বর্ণনানুসারে ইউসুফের জন্ম ভ্রাতৃদ্রোহ বিড়ম্বনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে। এক বণিক তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁর নাম মনিরু। পরে তিনি তামার মুদ্রার বিনিময়ে ইউসুফকে বিক্রি করে দেন। নীল নদীর জলে ইউসুফ স্নান করলে তাঁর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় এবং অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দলে দলে লোক ভীড় করে। জোলেখা এই অপূর্ব রূপবান ইউসুফকে দেখ মুর্ছা যান এবং পরে নিজ ধনরত্ন দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। পরের ঘটনা বর্ণনায় তফসীবের অনুসরণ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সগীর উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তাঁর ঘটনাপূর্ণ বিবাহ ও বাসর যাপনের বর্ণনা। ফারসী কাব্যের আখ্যানভাগে ইউসুফ-জোলেখার মিলন ও পরিশেষে মৃত্যু দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সগীরের কাব্যে ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে মধুপুরের রাজদুহিতা বিধুপ্রভার পরিণয়কে কেন্দ্র করে কাহিনী পল্লবিত ও প্রলম্বিত হয়েছে। এই অংশটি একেবারে কবির নিজস্ব কল্পনা। দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ইউসুফ একটি অদ্ভুত জন্তুর পিছনে অশ্ব চালিয়ে একা বিজন বনে এসে পড়েন। বনের এক সরোবরের পাড়ে সুরম্য পুরীর মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিধুপ্রভার পিতা শাহাবাল গন্ধর্বদের রাজা। বিধুপ্রভা স্বপ্নদৃষ্ট এক নবীপুত্রের প্রতি তাঁর প্রণয়াসক্তির কথা বললেন। ইউসুফ স্বপ্নতত্ত্বভেদ করে জানালেন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিটি তাঁর ভাই ইবিন আমিন। অতঃপর বিধুপ্রভার পালিত ও সুশিক্ষিত শুকপাখীকে দূত করে পাঠানো হয় এবং ইউসুফ ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন। শুকের কাছে গন্ধর্বরাজকন্যার কথা শুনে আমিন প্রেমবেদনা অনুভব করলেন এবং গন্ধর্ব মহামন্দ্রে খগচর বা পাখির রূপ নিয়ে রাজকন্যার কাছে এলেন। বিধুপ্রভা স্বয়ংবর সভার আয়োজন হল। বিধুপ্রভার বরমাল্য আমিনকে অর্পণ করলেন। গন্ধর্বরাজ শাহাবাল তাঁর রাজ্যে রাজপদে জামাতা আমিনকে অভিষিক্ত করলেন। ভাইকে মধুপুরে রেখে ইউসুফ ফিরে এলেন মিশরে। ইবিন স্বজনবিরহে পীড়িত হলে স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে বিধুপ্রভা মিশরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁরা যথাসময়ে মিশরে উপস্থিত হলে আনন্দের রোল পড়ে গেল।

শাহ মুহম্মদ সগীর মূলত মানবীয় প্রেমোপাখ্যানের কবি। কাব্যটিতে যে প্রেমের কিস্‌সা অনুসরণ করা হয়েছে তার প্রকৃতি রূপজ, মোহজ। জোলেখার ভালোবাসা সম্পূর্ণ দেহগত। স্বামীর নপুংসকত্ব তার অতৃপ্ত জৈবিক কামনাবহ্নিকে শত শিখায় উদ্দীপ্ত করেছে। হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা নিয়ে সে প্রণয়াস্পদকে কামনা করে। সমাজ সংসার ধনসম্পদ, ইহলোক-পরলোক, পাপ-পুণ্য সব কিছু তুচ্ছ করে সে এক কূলপ্লাবিত নদীর মতো সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে। জোলেখার প্রেমের তিনটি স্তর অতি স্পষ্ট। সে প্রথমে রূপ দেখে শিহরিত হয়, মুর্ছা যায়। পরে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। সবশেষে প্রেমসাগরে সব কিছু ভুলে ভেসে যায়। তবে জোলেখা কলঙ্কিনী হলেও কলুষিতা নয়। সে কামোন্মত্তা হলে অন্য উপায়ে ভোগবাসনা নিবৃত্ত করতে পারতো। রূপতৃষ্ণা তার কামবোধের ইন্ধন যুগিয়েছে সত্য, তবে তার আত্মরতি একমুখী হয়েছে। যৌবন অপগত হলেও জোলেখা প্রেমাস্পদকে এক পলক দেখার জন্য রাজপথের পাশে অসীম প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও জোলেখা কিসের সাধনা করে? সে কি কামের? না, এ চিরঞ্জীব শাশ্বত প্রেম। যখন তার কাম ব্যর্থ হয় তখন প্রেমিকাকে কারাগারে পাঠিয়ে প্রতিশোধ নেয়, কিন্তু যখন প্রেম ব্যর্থ হয় তখন জোলেখার মনে আত্মক্ষোভ জাগে। কবি জোলেখাকে রক্তমাংসের এক বাস্তব চরিত্র করে এঁকেছেন। অন্যদিকে ইউসুফ চরিত্রকে নীতিধর্মের শুষ্ক কাষ্ঠপুত্তলিকা বলে মনে হয়। সংযমশীলতায় তিনি একজন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর হৃদয়ে প্রেমের কোন আসক্তি নেই, নেই কোন দ্বন্দ্বও। জোলেখার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইউসুফের অবস্থান।

কবি কি তাঁর কাব্যে কোথাও ধর্মের কোন অনুষঙ্গ রাখেননি? কাব্যটির সূচনাংশে 'পোথার কথন' পড়লে প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন একটা জবাব পাওয়া যায়। কবি প্রেমের আখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন 'ধর্মবাণী' প্রকাশের কারণে। তাঁর পূর্ববর্তী ইরানীয় কবিরা এ কাহিনীকে দেখেছিলেন ধর্মতত্ত্বের আলোয়। তাঁরা ইউসুফকে মাশুক তথা পরমাত্মা ও জোলেখাকে আশিক তথা জীবাত্মা হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। ইউসুফের রূপের প্রতি জোলেখার আসক্তি এই দৃষ্টিতে হয়ে দাঁড়ায় আশিক-মাসুকের মিলনকামনা। ইন্দ্রিয় সম্ভেভাগ বাসনার দ্বারা যে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, অন্তরের প্রেম দ্বারা তাঁকে পেতে হয়—এমন একটা গভীর দার্শনিক কথাও এই গল্পটির রূপকে বর্ণিত। সগীর এ তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কেননা তাঁর সূফীবাদে বিশ্বাস ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। 'শাহ' উপাধিটি পীরের প্রতিনিধিত্বের দ্যোতক। যাইহোক, সগীর সূফী ধর্মাদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে এ কাব্য রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ তিনি নিজেই করেছেন। লিখেছেন—'শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন। রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।।...ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা। ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা। ভাবক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা। এই স্বীকারোক্তির পর এ কাহিনী যে ধর্মীয় প্রেমোপাখ্যান তা নিয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট রচনাটির মধ্যে সগীর যথাযথভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রণয় আখ্যানের কবিদের লক্ষ্য ছিল গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা। সগীরও সেই পথেৰ অনুগামী। গল্পরচনা কবির লক্ষ্য ছিল বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোন হিসেব করেননি। কোরান ও অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত ঘটনায় মৌলিকতা না থাকলেও একটা গতি লক্ষিত হয়। পাঠককে গল্প শোনানোর নেশায় তিনি ইবিন আমিন-বিধুপ্রভা প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। অনেক সমালোচকের মতে, এতে বাইবেলের ও কোরানের গল্পের ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে। তবে তাতে যে রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা মানা যায় না। রোমান্স কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অলৌকিক উপাদানের বাহুল্য। কেননা এ ধরনের কাব্যে imagination এর তুলনায় fantasy-র প্রাধান্য বেশি। এখানেও স্বপ্ন, আকাশ-বাণী, অবলা শিশুর মুখে বাক্‌ক্ষমতা, মূক পশুর মুখে মানববাণীর প্রয়োগ আছে। সমস্ত কাব্যটিতে স্বপ্নের যেন বন্যা বয়ে গেছে।

স্বপ্ন দেখেছেন ইউসুফ, জোলেখা, বণিক, মিশররাজ, ইবিন আমিন, বিধুপ্রভা। জোলেখার স্বপ্ন তার জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত বলে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার যৌবনের ভোগাকাঙ্ক্ষাই স্বপ্নের মধ্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। কাব্যের মধ্যে রয়েছে ছয়-সাতটি দৈববাণীও। এতে কাহিনীর বাস্তব রস তরল হলেও কবির রোমান্সসুলভ খেয়ালী কল্পনা ডানা মেলে ওড়বার সুযোগ পেয়েছে। বিধুপ্রভার সমগ্র আখ্যানটি রূপকথাধর্মী। তার শুক মন্ত্রসিদ্ধ পাখি। শুকের মন্ত্রগুণে আমিন খগচরে রূপান্তরিত হয়ে মধুপুর রাজ্যে গমন করে। এতেও বাস্তবের লেশমাত্র নেই। রয়েছে বারমাস্যা গীতও। ইউসুফের প্রতি জোলেখার প্রেমের আর্তির প্রকাশে বারমাস্যার করুণরস নিঃসৃত হয়েছে। সর্বোপরি কাম ও প্রেমের রূপচিত্রণে সগীরের কৃতিত্ব স্বীকার্য। তাঁর বর্ণিত প্রেম বাস্তবতার ঊর্ধে উঠে কোনো অলৌকিক ব্যঞ্জনায় ঠুন্‌কো হয়ে পড়েনি। প্রেমের মাহাত্ম্যও ঐ বাস্তবতার মদ্যেই ফুটে উঠেছে।

অনুবাদক কবি হিসেবে মুহম্মদ সগীরের আরো একটি মনোভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু কবিরা শাস্ত্রকথাকে সংস্কৃতির বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে যে দ্বিধায় পড়েছিলেন, বোধহয় মুসলিম কবিদের ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটে থাকবে। তিনি গোঁড়া মুসলিমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবাণীতে লিখতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। স্বভাষার প্রতি এই যে মমতা তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি মুসলমান কবি হিসেবে দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই স্মরণীয় ও গর্বের বিষয়। কবি লিখছেন,—'না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়। দূষিব সকল তাক ইহা না জুয়ায়। গুণিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহা ভয় মিছা। না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।।' কাব্যকলার নিরিখে শাহ মুহম্মদ সগীর কেবল একজন মরমী কবি বলেই বিবেচিত হন না, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সীমাহীন দরদে একজন উচু দরের দেশপ্রেমিক বলেও তাঁকে গণ্য করা যায়।

সবশেষে উল্লেখ থাকে যে, মুহম্মদ সগীর ছাড়া ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের আরো পাঁচজন অনুবাদক কবি ছিলেন। এঁরা হলেন আবদুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদের আলী ও ফকির মহম্মদ। এঁদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহের রচনা কিছু উৎকৃষ্ট। কিন্তু এঁরা আমাদের আলোচ্য সময়সীমার বাইরে বলে এঁদের কাব্য সম্বন্ধে আপাতত নীরব থাকা গেল॥

৪.৩ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা রোমান্স প্রণয় কাব্য রচনার পটভূমিটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৩। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের মধ্যে রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট্য কতখানি রক্ষিত তা উদাহরণযোগে দেখিয়ে দিন।

৪। অনুবাদক হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের মূল্যায়ন করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। আরব-ইরানের রোমান্স কাব্যধারার সঙ্গে বাংলা রোমান্স কাব্যের সংযোগ কোন্‌খানে?

২। হিন্দী-অওধী ও ফারসীতে লেখা রোমান্স কাব্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। শাহ মুহম্মদ সগীরের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। ইউসুফ-জোলেখায় কি কোন ধর্মের অনুষঙ্গ আছে?

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। রোমান্স কাব্যধারা প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে?

২। রোমান্স কাব্যধারার সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় কি?

৩। শাহ মুহম্মদ সগীর কোন্ প্রশাসকের সময়ে আবির্ভূত হন?

৪। ইউসুফ-জোলেখার উৎস কি?

৫। ভাবক-ভাবিনী বলতে কি বোঝায়?

৬। সগীর ব্যতীত আর ক'জন কবি ইউসুফ-জোলেখা কাব্য অনুবাদ করেন?

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৯৭৫

২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ১৯৮৭

৩. আবদুল হাফিজ, বাংলা রোমান্স কাব্য-পরিচয়, ১৩৮৭

৪. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, ১৩৯৯

একক ৫ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ রামায়ণের অনুবাদের ধারা

- ৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল
- ৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব
- ৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা
- ৫.২.৪ চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্ব
- ৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা
- ৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা
- ৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা
- ৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা

৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা

- ৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল
- ৫.৩.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব
- ৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য
- ৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ
- ৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব

৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা

- ৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- ৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী
- ৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্য গড়ে ওঠার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক প্রণোদনার কথা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের ক্ষেত্রে কারা চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারেন

এবং কেন সে বিষয়ে ব্যাপক ধারণা করতে পারবেন। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে বিশদ জানতে পারবেন। অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্বের নানা দিক (যেমন—কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, রসসৃজন, কাব্যনির্মিতি কৌশল, ভক্তিতত্ত্ব প্রচার, বাঙালিয়ানা প্রকাশ) নিয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে পরেবেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তিপরিচয় এবং আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মাবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর কতটা মূলকে অনুসরণ করেও নিজস্বতা দেখিয়েছেন, তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণভক্তি প্রচারে সহায়তা করেছেন এবং তাঁর কাব্যে বাঙালি সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে মহাভারতের অনুবাদে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন সেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যে কয়েকটি বিশেষ শাখায় বিকশিত হয়েছিল, অনুবাদ সাহিত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। এ শাখার সূচনা হয় চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে। যদি সে-উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে এর গুরুত্ব আরো সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। কোন মূলকে আশ্রয় করে ভাষান্তরিত রচনাই হল অনুবাদ। 'অনু' পূর্বপদে ভাবাশ্রয়িতার বোধ খুব স্পষ্ট। এ শ্রেণীর রচনায় লেখক কোন মৌলিক কাহিনীর সষ্টা নন, কেবল ভাষান্তরীকরণের মাধ্যমে মূলের গল্প ও রস পরিবেশন করাই তাঁর লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এতে একদিকে যেমন সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়, তেমনি অন্যদিকে ঘটে ভাষার সমৃদ্ধি।

মধ্যযুগে নবগঠিত বাংলাভাষার আশ্রয়ে সংস্কৃতভাষার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আবদ্ধ শাস্ত্রকথা জনসমাজে প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশেষ কারণে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় তুর্কী-নেতা বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় এদেশের শান্ত-বৈচিত্রহীন নিরুদ্বিগ্ন জনজীবনকে ঘুলিয়ে দেয়। দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার মানুষের মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। তুর্কী আক্রমণের এ হেন প্রচণ্ড আঘাতে হিন্দু সমাজের ও সংস্কৃতির ভিত নড়ে ওঠে। এদেশের তথাকথিত নিম্নবর্গস্থ হিন্দুরা ভয়ে, লোভে, সাম্যের আশায় দলে দলে মুসলমান হতে থাকলে উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের টনক নড়ে। শ্রেণীস্বার্থেই তাঁদের মধ্যে জেগে ওঠে জাতিচেতনা। তাঁরা অচিরে অনুধাবন করলেন যে, হিন্দুসমাজের এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি। ততদিনে রাজনৈতিক অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তাই ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিন্ন চেতনায় বাঁধতে চাইলেন নড়বড়ে বৃহদায়তন সমাজকে। এই ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সুপ্রাচীন আর্যশাস্ত্র ও কাব্যনির্ভর। অতএব সংস্কৃত ভাষার নিগড়ের মধ্যে তখনো পর্যন্ত পন্দী হয়ে থাকা শাস্ত্রকথা এবার দেশীভাষায় প্রচারের উদ্যোগ নিলেন তাঁরা। ঘটলো ঐতিহ্যপূর্ণ আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে আপামর বাঙালির চিত্তসংযোগ। নির্জিত হিন্দুর মানসিক শক্তি, সাহস ও উদ্যম সঞ্চারে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা তাই অপরিসীম। প্রথম দিকে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়, পরে নানা পুরাণ অবলম্ভবন করে অনুবাদকেরা পৌরাণিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটান।

পণ্ডিত সমাজের একাংশ মনে করেন যে, অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক অভিব্যক্তিক ঘটেছিল কথকতার মাধ্যমে। যাঁরা পুরাণকথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সাধারণের কাছে সেসব গল্প পাঁচালির আকারে পরিবেশন করতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শূদ্র বা অন্ত্যজরা সেকালের সংস্কৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে অবতলবর্তীদের মধ্যে ধর্মপিপাসু মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে মধ্যবর্তী হিসেবে পালাগায়ক বা কথকের আবির্ভাব ঘটে। আবার সংস্কৃত ভাষাজালে আবদ্ধ শাস্ত্রকথাকে যাঁরা সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে গোঁড়া শাস্ত্রব্যবসায়ীদের ক্রোধ যে চাপা ছিল না তার প্রমাণ এই প্রবাদোপম পংক্তি—'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে বামুনঘেঁসে/এই

তিন সর্বনেশে।' তবে অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত কবিরা তাঁদের কর্মের গুরুত্ব তথা ভূমিকা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু লিখেছেন—'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক-নিস্তারিতে যাই পাঞ্চালী রচিয়া।।' লোক-নিস্তারণ অর্থাৎ লোকশিক্ষাই অনুবাদের হেতু। কবি 'লোক' বলতে সেইসব মানুষকেই বুঝিয়েছেন যাঁরা সংস্কৃত বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ অবস্থাবৈগুণ্যে শাস্ত্রকথা যাঁদের অবধানের প্রয়োজন ছিল। প্রায় একই সুরে কথা বলেন ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাসও সপ্তদশ শতকের কবি দ্বিজ হরিদাস। নল-দময়ন্তীর আখ্যান-সূচনায় কামতারাজসভার কবি পীতাম্বর লেখেন—'পুরাণাদি শাস্ত্রে যেই রহস্য আছয়। পণ্ডিতে বুঝয়ে মাত্র অন্যে না বুঝয়।। এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার। নিজ দেশভাষা-বন্ধে রচিয়ো পয়ার।।' এ কথার প্রতিধ্বনি বাজে হরিদাসের কলমেও—'সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে। ভাষাকথা কহি আমি তথির কারণে।।' আবার উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও অনুবাদ করতে গিয়ে সব রচনাকার একই আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়নি। কবির প্রকৃতি অনুযায়ী কাব্যের চরিত্র গড়ে ওঠে। কবির প্রকৃতিও নির্ধারিত হয় তাঁর পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, কবিত্বশক্তি প্রভৃতির দ্বারা। তাছাড়া তর্জমাকারীর সাহিত্যগত উদ্দেশ্যও লেখাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল বিশুদ্ধ গল্পরস পরিবেশনের তাগিদে মূলের অতিরিক্ত অনেক অপ্রধান, এমনকি অপ্রয়োজনীয় কাহিনীও কেউ যুক্ত করে দিতে পারেন। এ সবের কারণে অনুবাদের প্রকৃতি পাল্টে যায় এবং নানা অনুবাদ বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত হয়। যেমন—আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, ছায়ানুবাদ, সারানুবাদ ইত্যাদি। নানা গ্রন্থের অনুবাদে তো বটেই, একই গ্রন্থের বিভিন্ন কবির অনুবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি বৈশিষ্ট্য খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১. রচনায় কম-বেশি বাঙালিয়ানার অনুপ্রবেশ ও ২. ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি। প্রথমটি উদ্দিষ্ট পাটকবর্গের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তাঁদের পাঠরুচি-কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়টি সমকালের ধর্মভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাঙালি কবিরা সর্বভারতীয় কাহিনীকে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী পাঠকের উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে গিয়ে পটভূমি, চরিত্র, রসসৃষ্টি, নিসর্গপ্রকৃতি, কাব্যভাষা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্বতা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এইসব অনুবাদের কোথাও কোথাও বাংলাদেশের ভৌমসত্তার হৃদস্পন্দন অনুভূত হয়। কিছু কবির অনুবাদ কালজয়ী হয়ে ওঠার এটাও একটা প্রধান কারণ। আর ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে কবিদের দাসত্ববুদ্ধির অভিপ্রকাশ স্পষ্ট। অবশ্য যুগীয় পরিমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা সেকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন কবিদের ছিল না। তাঁরা ভক্তিবাদ প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থ লিখে কালের দাবিকেই সম্মানিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অনুবাদ সাহিত্যের ধারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চললেও আমরা এ পর্যায়ে প্রাক-চৈতন্যপর্বের তিনটি মুখ্য প্রবাহের বিশিষ্ট কবিদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবো। ধারাগুলি হলো—রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত।

৫.২ রামায়ণ অনুবাদের ধারা

ভারতবর্ষের আদিকাব্য রামায়ণ, আদিকবি ঋষি বাল্মীকি। ভারতীয় জীবন ও ভাবসত্তার সঙ্গে রামায়ণ গভীর আত্মীয়তার সূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নানা পরিবর্তনশলীতার মধ্যে ভারতবর্ষ যে তার আদি ও অকৃত্রিম চেহারা বজায় রাখতে পেরেছে তার মূলে রামায়ণের শিক্ষা ও আদর্শ বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল। রামায়ণ জীবনরসের কাব্য। তাই এখানে দর্শন থাকলেও সে শুষ্ক বিদ্যা বিতরণ করে না। নরনারীর চিরায়ত প্রেম ভালোবাসা সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে ওঠে উপভোগের এক সামগ্রী। এই মহাকাব্যের সঙ্গে জাতির হৃদয়ের নিগূঢ় সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয় ভাষার ব্যক্ত করে 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছিলনে, 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের

কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।....গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' বস্তুত বাল্মীকি রামায়ণে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, তিনি মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ 'নরচন্দ্রমা' স্বরূপ। রামচন্দ্রকে বাল্মীকি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সম্রাট প্রভৃতি সম্পর্কের আদর্শ স্থানীয় পুরুষ করে তুলেছেন। সর্বস্তরের ভারতবাসীর কাছে রামচন্দ্র অনুসরণযোগ্য এক মহান চরিত্র। যাইহোক, বাল্মীকির রচনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে আরো প্রায় ৬/৭টি রামায়ণ ও ২/৩টি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার ঘটনা প্রমাণ করে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে এই মহাগ্রন্থ কত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। রামকাহিনী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-কম্বোজ-চিন-ভিয়েতনাম-মালয়-ইন্দোনেশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার, ভিন্টারনিৎস্ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণকে অপ্রাচীন বলে মন্তব্য করলেও অন্তবর্তী তথ্যে রামায়ণই সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত টানতে হয়। এছাড়া রামায়ণকে কেউ কেউ রূপক হিসেবেও বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষের আর্য সভ্যতার বিস্তারের ইতিকথা নাকি এর মধ্যে সূচিত। 'সীতা' শব্দের অন্য অর্থ 'হল্যা ভূমি'। রামচন্দ্র কর্তক লঙ্কাপুরী থেকে রাবণহত্যা করে সীতা উদ্ধারের কাহিনী অনার্যপ্রধান অরণ্যঙ্কুল দক্ষিণ দেশে কৃষিসভ্যতা পত্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। রামায়ণে অনুস্যূত জীবনবোধ যে চিরায়ত, তার উদ্‌ঘোষণা বাল্মীকি নিজেই করে গিয়েছেন এই মহাকাব্যে—'যাবদ্ স্থাস্যন্তি গিবয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।' এই মহৎকাব্যের অনুবাদ প্রাদেশিক ভাষায় শুরু হয় একাদশ শতকে। প্রথমে তামিলে, পরে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায়। বঙ্গদেশে রামায়ণ অনুবাদের সূচনাকার ছিলেন কবি কৃত্তিবাস—'কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলঙ্কার।'

৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

উনিশ শতকে বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচীন পুথিসংগ্রহের আগ্রহ দেখা দিলে বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে যাঁর পুথির অনুলিপি সবচেয়ে বেশি মিলেছিল তিনি হলেন কৃত্তিবাস। এ ঘটনা কৃত্তিবাসের বিপুল জনপ্রিয়তারই স্মারক। লোকসাধারণের বোধের জগতে নতুন কিছু সংযুক্ত করতেই যে তাঁর লেখনী ধারণ এর আভাস মেলে। তাঁর উক্তিতে—'সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।' কৃত্তিবাসের কাব্য ধনীর রাজপ্রসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত পঠিত। অথচ এত বড় লোককান্ত কবির ব্যক্তিপরিচয় আজও পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগের লেখা দুটি গ্রন্থে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটুকরো করে তথ্য দেওয়া আছে। প্রসিদ্ধ কুলাচার্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের লেখা 'মহাবংশাবলী'তে বলা হয়েছে—'কৃত্তিবাস কবির্ধীমান সৌম্যঃশান্ত জনপ্রিয়', আর জয়ানন্দ মিশ্র চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন—'রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালি করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।' শ্রীরামপুরে কর্মরত মিশনারীরা প্রেস স্থাপন করে বাইবেলের পাশাপাশি আর যে-গ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশ করেন সেটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ। প্রকাশের সুবাদে কৃত্তিবাস সম্পর্কে গবেষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তেমন তথ্য মেলে না। ১৮৩৪ সালে যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হয়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আবার বেরলো তখনো কবির জীবনকথা বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। ১৮৫২-তে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা

বিষয়ে যে-বক্তৃতা দেন বীটন সোসাইটিতে সেখানে কবির কাব্য নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও তাঁর ব্যক্তিপরিচয় অনুল্লেখিত থাকে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত'-এ (১৮৬৯) দুটি তথ্য দিলেন—'ফুলিয়ার কৃত্তিবাস' ও তিনি 'মুরারি ওঝার নাতি'। ১৮৭০-এ ঢাকা থেকে হরিশচন্দ্র মিত্র 'কৃত্তিবাস পরিচয় সংগ্রহ' -এ রামায়ণ গায়কদের খাতা থেকে কাব্যপংক্তি উদ্ধার করে ছেপে দিলেন। তাতে পাওয়া গেল কৃত্তিবাসের পিতা ও মাতার নাম, ভাইয়ের সংখ্যা ও নাম। অনেকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনরকম প্রমাণ বা সূত্র ব্যতিরেকে। ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কিন্তু ১৯০১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র আত্মপরিচয় শীর্ষক একটি রচনাংশ ছেপে দেন। তিনি এটি পেয়েছিলেন বাঁকুড়া ও হুগলীর সীমান্তে অবস্থিত বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির কাছ থেকে। কিন্তু যে-পুথি দেখে এটি তিনি নকল করেছিলেন পরে সেটিকে তার লোকসমক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। সে সময়ে মূলটি অপ্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই ধারণা করেছিলেন এটি একটি জালিয়াতির ঘটনা। এর বহুবছর পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভারতবর্ষ পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে প্রাপ্ত কত্তিবাসের আত্মবিরণী প্রকাশ করলে বোঝা গেল দীনেশচন্দ্র প্রকাশিত অংশটি জাল নয়। ভট্টশালী সংগৃহীত পুথিতে কৃত্তিবাসরে আত্মপরিচয় বিস্তৃততর। উক্ত দুই বিবরণী মিলিয়ে আমরা কবি কৃত্তিবাসের জীবনের রূপরেখা এখানে আঁকতে পারি।

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ছিলেন নারসিংহ ওঝা। ইনি পূর্ববঙ্গে বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। একদা ঐ অঞ্চলে মুসলমান অক্রমণ ঘটলে তিনি গঙ্গার পূর্বতীর ফুলিয়াতে এসে বসবাস করতে লাগলেন। পূর্বে মালীদের বসবাস ছিল এই স্থানে। ফুলের চাষ ব্যাপক পরিমাণে হত বলে এর নাম ফুলিয়া। নারসিংহের বংশধর ছিলেন মুরারি। মুরারীর পুত্র বনমালী, যিনি কৃত্তিবাসের পিতা। তাঁর মায়ের নাম মালিনী। কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই, মতান্তরে সাত—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব শ্রীধর, বলভদ্র ও চতুর্ভুজ। আর ছিল এক ভগিনী। কৃত্তিবাস তাঁর জন্ম বার ও তিথির উল্লেখ করেছেন—'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥' কৃত্তিবাস তাঁর পিতামহ-প্রদত্ত নাম। বারো বছর বয়সে উত্তর দেশে পড়তে গেলেন বড় গঙ্গা পেরিয়ে। গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়েশ্বরকে পাঁচ শ্লোক পাঠালেন। দ্বারী হাতে শ্লোক দিয়ে রাজার অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন। সপ্তঘটি বেলাতে রাজার আহ্বানে নয় দেউড়ি পেরিয়ে পৌঁছুলেন। রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর চারিদিকে পাত্রমিত্র। কৃত্তিবাসের উল্লেখ মতো এঁরা হলেন—জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ নারায়ণ, গন্ধর্ব রায়, শ্রীবৎস্য, মুকুন্দ। চারিদিকে নৃত্যগীত সমারোহের মধ্যে রাজা মাঘ মাসের রৌদ্রতাপের আরাম ভোগ করছিলেন আঙিনায়, 'রাঙা মাদুরি' বিছিয়ে। রাজা হাতছানি দিয়ে ডাকতে কবি তাঁর নিকটে গেলেন। চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে সাত শ্লোক পড়লেন তিনি। দেবী সরস্বতী প্রসাদে সেই রমণীয় শ্লোকে রাজা মুগ্ধ হয়ে কবিকে পুষ্পমালা উপহার দিলেন। কেদার খাঁ চন্দনের জল ছিটোলেন। উপহার মিললো পাটের পাছড়া। সভাসদরা কবিকে রাজার কাযছ থেকে আরো কিছু চেয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কবি পার্থিব সম্পত্তিবিমুখ। তিনি এই ভিক্ষা করলেন—'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥' একথায় রাজা সন্তুষ্ট হয় কবিকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ করলেন। কবি রাজসভা থেকে বহির্গত হলেন। সভার সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। অতঃপর কবি রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর আত্মপরিচয়ের শেষাংশে তিনি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে লিখেছেন—'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥ বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান। রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥ সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস

পণ্ডিত ॥' রামায়ণে কিছু লোক মনোরঞ্জক গালগল্প ঠাঁই পাওয়ায় অনেকের ধারণা কৃত্তিবাস তেমন পণ্ডিত কবি ছিলেন না। কিন্তু কবির সাক্ষ্য মেনে নিলে এ ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়। বিপুল পাণ্ডিত্য না থাকলে বাল্মীকির কবিত্ব অনুভব করে তাঁর প্রাঞ্জল ভাবানুবাদ রচনা করা সত্যই দুঃসাধ্য কর্ম।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি প্রাপ্তির সূত্রে পরবর্তীকালের গবেষকরা তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যত্নবান হয়েছেন। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, কবি তাঁর বিবরণে জন্মতিথি, মাস ও বার উল্লেখ করলেও শকাব্দ বা বঙ্গাব্দ কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। তাছাড়া যে গৌড়েশ্বরের দরবারে তিনি সম্মানিত হন তাঁর সভাসদদের নাম উল্লেখিত হলেও রাজার নামটি অনুক্ত থেকে গেছে। ফলে গবেষক মহলে সৃষ্টি হয়েছে ধন্ধ এবং তার সুত্রে বাদানুবাদ। আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিয়ে মোটামুটি একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো।

কবি আত্মবিবরণের সূচনাতেই পূর্ববঙ্গস্থিত কোন এক 'বেদানুজ' রাজার কথা বলেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এটি হবে দানুজ রাজা। এখন, দানুজ নামধারী তিনজন রাজা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছেন পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ে। দনুজ মাধব বা দনুজ রায় ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। আর একজন ছিলেন দনুজ মর্দন দেব, যাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭-৯৮ খ্রিঃ। আর ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক দনুজ রায়। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা এই দনুজ রায়ের পাত্র ছিলেন।

এবার কবির উল্লেখিত বার-তিথির প্রসঙ্গ। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুসারে যে-বৎসর মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী রবিবরা পড়েছিল, কবির উল্লেখিত 'পূর্ণ' শব্দটিকে মর্যাদা দিয়ে সেই সালটি নির্ধারিত করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩৫৪ শক বা ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালীর আবিষ্কৃত পুথিতে 'পূর্ণ' স্থলে রয়েছে 'পূণ্য' শব্দটি, যা মধ্যযুগের সাধারণ লিপি-বিভ্রান্তি বলে অনেকে মনে করেন। ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র 'পূণ্য' শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়বারের জ্যোতিষ বিচারেপৌঁছন ১৩২০ শকে বা ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই দুই সালের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? সে সিদ্ধান্তের জন্য অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রের সাহায্য প্রয়োজন। এখন সেগুলির অনুসন্ধান করা যাক।

১. কুলপঞ্জিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খান ও খুড়তুতো ভাইয়ের পৌত্র গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ততদিনে কৃত্তিবাস পরলোক গমন করেছিলেন। নইলে তাঁর মতো খ্যাতিমান মানুষের জীবিতকালে কেমন করে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা বংশের প্রতিনিধিত্ব করেন?

২. জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গলে আছে, মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানে ফুলিয়া নিবাসী হরিদাস আনুমানিক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ স্বগ্রাম ত্যাগ করে নীলাচলে যাত্রা করেন। তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদ সুষেণ পণ্ডিত। ইনি ফুলিয়ার বিখ্যাত কুলীন মনোহরের পুত্র, কৃত্তিবাসের খুড়তুতো ভাই লক্ষ্মীধরের পৌত্র, অর্থাৎ সম্পর্কে কৃত্তিবাসের পৌত্র। তখন তাঁর মধ্যবয়স। অতএব এর থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন এমন অনুমান করা বিধেয়।

উপরোক্ত দুই যুক্তির বলে সমৃদ্ধ হয়ে কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। এবার প্রশ্ন তিনি কোন্‌ প্রশাসকের রাজসভায় সম্মানিত হন? কবির যে-বর্ণনা দেখা যায় তাতে সংবর্ধনায় হিন্দু রীতিরই প্রাধান্য। রাজার সভাসদরা সবাই হিন্দু। ইনি কি কোন হিন্দু রাজা? তাহলে কবি তাঁর নাম উল্লেখ করেন না কেন? ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন, গৌড়ে ঐ সময়ে একজনই মাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি গণেশ। যিনি

১৪১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর সভাতে কবি পৌঁছুলে তখন তাঁর বয়স হয় বিশ বৎসর। তাছাড়া এতবড় কাব্য নিশ্চয়ই এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়নি। ১৪১৮ সালে গৌড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ করে সমস্ত হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের পক্ষে এইরকম অবস্থায় কাব্য লেখা সম্ভব হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সেজন্য রাজা গণেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করেননি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণন্দ্রকুমারর বসু কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের পক্ষে যুক্তি, কংসনারায়ণের পাত্রমিত্রের সঙ্গে কৃত্তিবাস উল্লেখিত গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রের নামসাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র ধরে কংসনারায়ণকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপন করা যায় না। সেজন্য অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নতুন কিছু তথ্যের সংযোগে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে গৌড়েশ্বরটি হলেন রুক্নুদ্দিন বরবক শাহ। ইনি বিদ্যোৎশাহী, গুণীর প্রশংসাকারী ও বাঙালি হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষক, এঁর রাজসভায় মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে বিরুদ্ধধর্মের স্পর্শ রাখবেন না বলে সমস্ত হিন্দু পাত্রমিত্রের নাম লিখলেও গৌড়েশ্বরের নামটি উহ্য রেখেছেন। তাছাড়া রাঙা মাজুরী পেতে রোদ পোহানো এই মুসলিম প্রশাসকের পক্ষেই বেশি সম্ভভব। অবশ্য এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত টানা এখনও সম্ভভব হয়নি। তবে অধিকাংশ গবেষক ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন বলে মেনে নিয়েছেন।

৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব

বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ অনুবাদের কৃতিত্বের দাবিদার কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির কাব্যের হুবহু অনুবাদ তিনি করেন নি, করেছেন ভাবানুবাদ। বাঙালির গল্পরসের চাচিহদার দিকে তাকিয়ে যেমন কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন, তেমনি শিশু মনোরঞ্জক গালগল্পের আয়োজন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বা উৎস কেবল বাল্মীকি ছিলেন না, জৈমিনী রচিত মহাভারতও তাঁকে আখ্যান যুগিয়েছিল। মূল রামায়ণের কাহিনী-কাঠামো অটুট রেখে এইরকম গ্রহণ-বর্জন কৃত্তিবাসের রচনাকে স্বাদু ও উপভোগ্য করে তুলেছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে মৌলিক ভাবনার পরিমাণও কম নয়। গল্পের ক্ষেত্রে, চরিত্রচিত্রণে, রসপরিবেশনে, প্রবাদ-প্রবচনে কৃত্তিবাস নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আসলে তিনি উদ্দিষ্ট পাঠক কিংবা শ্রোতার কথা ভেবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে এইসব বিশিষ্টতা তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর বিশদ কৃতিত্ব পরিমাপে আমরা আলোচনাটিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে পারি—

৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা

আখ্যানধর্মী সাহিত্যে কাহিনী সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান। কৃত্তিবাসরে সময়ে রচনাকর্মে চরিত্রের চাইতে বৃত্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো বেশি। কবিও রীতির বাইরে পা রাখেননি। কৃত্তিবাস যখন অনুবাদে হাত দিচ্ছেন সেই সময়ে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে গেছে রামভক্তিবাদ। তিনি যে বিষ্ণুর অবতার সে বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত। তাই বিষ্ণুর চারি অংশে বিভক্ত হয়ে দশরথের চারপুত্র রূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী দিয়ে সূচনা হয়েছে আদিকাণ্ডের। এরপর রামাদি চার ভ্রাতার সঙ্গে সীতাসহ অন্য তিন ভগিনীর বিবাহ, তাড়কাবধ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—এ কাণ্ডের মূলকাহিনী। এর মধ্যেও দু' একটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশ করেছেন কৃত্তিবাস। যেমন—চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ। বাল্মীকি সূচনায় যে কাহিনী-সংক্ষেপ দেন সেটা ছেঁটে বাদ দিয়েছেন আমাদের কবি। অযোধ্যাকাণ্ডেও দু'একটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা গেছে। যেমন—দশরথ কৈকেয়ীকে যে-দুটি বরের কথা

জানিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা একটি বররূপেই কথিত। বনগমনের পূর্বে রামের বনবাসের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ যে যুক্তি প্রদর্শন করে বাল্মীকিতে তা তেমনভাবে পাওয়া যায় না। এই কাণ্ডের মূল উপজীব্য রামচন্দ্রের বনবাস এবং তার পিছনে কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি ও মন্থরার প্ররোচনা। কৃত্তিবাস অন্যভাবে কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুরতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কবির ব্যাখ্যা ঃ তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলেই তো রামচন্দ্র বনবাসে যেতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত দুরাচারী রাবণধ্বংস সম্ভব। আসলে ভক্তিরসের কারবারী কৃত্তিবাস এভাবে একটি নৃশংস ঘটনাকে ধর্মতত্ত্বের মোড়ক দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া বনবাসী রামচন্দ্রকে দেখে ভরদ্বাজমুনি যেভাবে তাঁর চরণবন্দনা করেন, তাও বাল্মীকি রামায়ণে দুর্লভ। বলা বাহুল্য যে, কৃত্তিবাস তাঁর রামচন্দ্রে দেবত্ব আরোপ করে তাঁকে সকলের পূজ্য করে তুলেছিলেন। নন্দীগ্রামে ভরতের কুস্বপ্ন দর্শনও বাল্মীকিতে মেলে না। দূতের দ্বারা নীত হয়ে ভরত যখন অযোধ্যায় এসে সমস্ত ঘটনা অবগত হলেন, তখন তিনি জননীর উপর চরম আক্ষেপে ও আত্মধিক্কারে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা কৃত্তিবাস করলেও মূলে নেই। অযোধ্যাকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সীতা কর্তৃক মৃত দশরথের অতৃপ্ত আত্মাকে বালির পিণ্ডদান এবং চারজন সাক্ষীর প্রতি সীতাবেদীর অভিশাপ ও আশীর্বাদ প্রদান। এটি পুরোপুরি কৃত্তিবাসের কল্পিত। ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গু ও বটবৃক্ষ নিয়ে বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে লোকসংস্কার প্রচলিত ছিল, কৃত্তিবাস এ ঘটনায় তার কাব্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অরণ্যকাণ্ডেও অত্রিমুণির পত্নী অনসূয়ার কাছে সীতা আপন জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন—যা আদৌ বাল্মীকিতে নেই। মূল রামায়ণে রাম কর্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধের পর সুতীক্ষ্ণমুণির উপাখ্যান আছে, যা কৃত্তিবাস প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। অগস্ত্য কর্তৃক ইল্বল নিধনের কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। এভাবে কাণ্ড ধরে বিচার করে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অজস্র পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। আসলে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে কাহিনী পরিবেশনের দিকেই কৃত্তিবাসের নজর ছিল, মূলের বিচ্যুতি নিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তায় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। সেজন্য কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, অম্বরীষ যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়গুলি বাদ দিয়েছেন, পরিবর্তে সংযুক্ত করেছেন সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ, বীরবাহুর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, সীতা কর্তৃক রাবণের মূর্তি অঙ্কন ইত্যাদি ঘটনা। এসব গল্প বলতে কবিকে হাতড়ে ফিরতে হয়েছে জৈমিনী ভারত, স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, কুর্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণে কথিত। জৈমিনী ভারত থেকে নিয়েছেন লব-কুশের দ্বারা ভরত-শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাভূত ও নিহত হলে বাল্মীকির প্রসাদে তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ। দস্যু রত্নাকর 'মরা' 'মরা' বলে যে শাপমুক্ত হয়েছিল এ কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে গৃহীত। হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানটি এসেছে দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তের উৎস যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ। গঙ্গা আনয়নের কাহিনী মেলে স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে। ঐ পুরাণে রয়েছে দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের কথা। কৃত্তিবাস কুম্ভকর্ণ হত্যায় সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাবের কথা জানিয়েছেন, যার উৎস অদ্ভুত রামায়ণ। এইভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ হয়ে উঠেছে ভারতীয় পুরাণকথার সমাহার, তবে অবশ্যই বাল্মকি তাঁর মূলাশ্রয়।

৫.২.৪ চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্ব

যে কোন কবির কাব্য গড়ে ওঠে যুগীয় পরিমণ্ডলের জল-আলো-বাতাসে। চরিত্রও তার অন্তর্গত। যুগের বিশিষ্ট দাবি বহন করে জন্ম দিতে পারে কোন কোন চরিত্র। থাকতে পারে তাতে যুগের ত্রুটি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতাও।

কৃত্তিবাস তুর্কী আক্রমণোত্তর পঞ্চদশ শতকের বাঙালি সমাজের কবি। মুসলমান আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশ শুধু অন্য শক্তির করতলগত হয়নি, ভেঙে পড়েছে প্রাচীন নীতি-আদর্শের কাঠামো, বিপর্যস্ত হয়েছে সমগ্র হিন্দুসমাজ। এ হেন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের উন্নত চরিত্র আশা করা অন্যায়। তাছাড়া কৃত্তিবাস লিখতে চেয়েছেন লোকমনোরঞ্জন পাঁচালী। মহাকাব্যের মহৎ, বৃহৎ সমুন্নত চরিত্রের অবস্থান সেখানে বড় বেমানান। ফলে তাঁর চরিত্রগুলি হয়েছে লোকজীবনানুগ। তাছাড়া বাল্মীকির তুলনায় বাঙালি কবির প্রতিভার আপেক্ষিক দীনতাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সব মিলিয়ে বাংলা রামায়ণের চরিত্রগুলি মূলের তুলনায় খর্বাকার, তেজোহীন অগৌরবান্বিত হয়ে গেছে। তবুও কৃত্তিবাস এতে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সঞ্চার করে কিছুটা চোহারা দিতে সমর্থ হয়েছেন। ভক্তিবাদ কৃত্তিবাসের কাব্যে অতিরিক্ত এক উপাদান। মুখ্যত দেশজোড়া রাম ভক্তির উচ্ছাসের পটভূমিতে এ কাব্যের সৃষ্টি। রামচরিত্রে এই নতুন মাত্রা যোজিত হওয়ায় রঘুকুলবীরের স্বভাব বহুলাংশে পরিবর্তিতত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। রামচন্দ্র এখানে যতখানি ক্ষত্রিয় বংশের বীর নায়ক, তার তুলনায় বেশি প্রেমের দেবতা, ভক্তিরসের আশ্রয়, ভক্তবৎসল ভগবান। এ রামচন্দ্র রোদনপ্রবণ বাঙালির স্বভাবসাযুজ্যে মনের মানুষ। তাঁর চোখে বিরহ-অশ্রুর আবির্ভাব সীতাহরণে, সীতার বনবাসে, সীতার পাতাল গমনে। তিনি রাজকীয় আভিজাত্য ছেড়ে আবেগব্যাকুল হয়ে উঠেছেন কোথাও কোথাও। নীতিপ্রচারেও যথষ্ট আগ্রহী। রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেকে কৃত্বিাসের সীতাও হয়ে ওঠেন অশ্রুমুখী বঙ্গকুলবধূ। নিতান্ত দু'একটি বিশিষ্ট জায়গা ছাড়া কৃত্তিবাস সীতাকে সমগ্র বঙ্গকুললক্ষ্মীর আদর্শ বা মডেল করে তুলতে চেয়েছেন। পতিভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন গড়ে তোলা হয়েছে সীতার সমস্ত কথাবার্তায় ও আচরণে। নারী পুরুষের ছায়ানুগামিনী—এই জাতীয় সামাজিক ধারণার পোষকতা করেন সীতা। অরণ্যকাণ্ডে রাবণ কর্তৃক অপহরণের আগে স্বামীপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে দেবর লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করেছেন, তার কুটিরে স্থিতিকে দুরাত্মার ছল বলে বিবেচনা করে পুরুষ কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। লক্ষ্মণ চরিত্রেও পরিবর্তন সাধন করেছেন কৃত্তিবাস। তাঁর লক্ষ্মণ উদ্ধত, অবিনয়ী। ভরত সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ আছে। বনবাস যাত্রার পূর্বে যেভাবে লক্ষ্মণ যুক্তিবিন্যাস করেছে তাতে একদিকে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া দশরথের স্ত্রৈণতা ও কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা বাল্মীকি রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাসী পাঁচালিতে সংক্রামিত হলেও তা যেন বড়ই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দশরথ কৈকেয়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও বাল্মীকির দশরথের মতো চরম রূঢ় কথা বলতে পারেননি। আবার কৈকেয়ী যেন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেন বনবাসযাত্রী রামলক্ষ্মণের হাতে বল্কল তুলে দিয়ে। এমকি যাত্রার পূর্বে রাম বিদায় প্রার্থনা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে কৈকেয়ী বিমুখ হন। হনুমানের চরিত্রও অনেকাংশে বাঙালি ঘরের অনুত ভৃত্যের মতোই। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের যে-পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিতান্ত রাক্ষসচরিত্র নয়। রাবণ ছদ্মবেশে রামেরই ভক্ত। তিনি শত্রুভাবে বিষ্ণুর কাছে মুক্তি পেতে চান। তাঁর রাম-বিরুদ্ধতার তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি হারিয়ে যায় যখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রায় অগ্রণী হয়ে বলেন—'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন। দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।। চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥' এইভাবে প্রায় সমস্ত চরিত্রের বঙ্গীয়করণে কৃত্তিবাস আপন কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। মহাকাব্যিক চরিত্রের আদিমতা, গাম্ভীর্য, সমুন্নতি কোনটিই বাংলা অনুবাদে রক্ষিত হয়নি, অথচ লৌকিক পাঁচালির উপযোগী চরিত্র হয়ে ওঠায় কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-ভরত-কৈকেয়ী-দশরথ-রাবণ-মন্দাদরী এককভাবে বঙ্গীয় পাঠককুলের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা

কাব্য রসের আশ্রয়। কেননা আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত : 'রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্'। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের বিধান এখানে নয়টি প্রধান রসের উপস্থিতি থাকলেও চারটি রসের মধ্যে যেকোন একটি অঙ্গীরস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। উক্ত চারটি রস হল—শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শান্ত। বাল্মীকির রামায়ণ করুণরসের কাব্য। অনুবাদক কৃত্তিবাসও মূলকে অনুসরণ করে করুণরসকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত রামায়ণের অধিকাংশ কাহিনীই বেদনাঘন। আখ্যানের সূচনায় রাজ্যাভিষেক থেকে রামকে প্রতিনিবৃত্ত করে কৈকেয়ী কর্তৃক বনে পাঠানো, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু, রামের নির্বাসনে অযোধ্যাবাসীর ক্রন্দন, কৌশল্যার হাহাকার, অরণ্যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, সীতার অদর্শনে রামের বিলাপ, রাম কর্তৃক বালীবধ, বালীর পত্নী তারার ক্রন্দন, রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ এবং শেষ পর্যন্ত রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু, মন্দোদরীর বিলাপ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তিত সীতার বিরুদ্ধে অপবাদ ও সে কারণে সীতার বনবাসে প্রেরণ এবং সবশেষে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতালপ্রবেশে ঘটনা যথেষ্ট মর্মান্তিক ও করুণরসের আশ্রয়। কৃত্তিবাস এসব ঘটনার বর্ণনায় বাল্মীকিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করে গেছেন। বাঙালি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ। তারই উপযুক্ত করে আখ্যান পরিবেসিত হওয়ায় স্থানগুলিতে করুণরসের প্রবাহ কোথাও কোথাও তরলতায় পর্যবসিত। তবে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলে বাঙালি পাঠকের কাছে গৃহীত হওয়ায় করুণরসের মানবিক আবেদন কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হয়ে গেছে।

প্রাচীন মহাকাব্য মাত্রেই যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা সম্বলিত আখ্যান। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অঙ্গীরস তাই বীররস রামায়ণে অনেকগুলি যুদ্ধের (রামলক্ষ্মণের তাড়কাবধ, খরদূষণের যুদ্ধ, বালিবধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, লবকুশের যুদ্ধ প্রসঙ্গ আছে। স্বভাবতই এ স্থানগুলিতে বীররসের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু কৃত্তিবাস মূলকে অনুসরণ করলেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এর কারণ মুখ্যত দুটি বলে মনে হয়। প্রথমত, ভক্তিরসের অহেতুক অনুপ্রবেশ ও দ্বিতীয়ত, যুগীয় পরিমণ্ডলে বীর-আদর্শের অভাব। ভক্তিরসে কাহিনী ও চরিত্র দ্রবীভূত হওয়ার ফলে বীররসের গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি দুইই নষ্ট হয়েছে। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় লঙ্কাযুদ্ধে রামের বিপক্ষে যারা সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই বীরবাহু, তরণীসেন, এমনকি রাবণের মধ্যেও। তারা ছদ্মবেশী রামভক্ত। ফলে তাদের আচরণে, উক্তিতে কোথাও কোন রৌদ্রস্বভাব ফুটে ওঠেনি। সমকালের বাংলাদেশেও নির্জিত হিন্দু বাঙালির অবস্থান। তাঁরা তখন শক্তিহীন, দুর্বল। অনন্যোপায় হয়ে অন্য ধর্মের মানুষের অধীনত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এহেন পরিস্থিতিতে মানসিক দুর্বলতা ও নিয়তিবাদের প্রকোপ ঘটা স্বাভাবিক। এ দুইই বীররসের পরিপন্থী। কৃত্তিবাস তাঁর রচনায় বীররসের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভে অক্ষম হন এই যুগীয় মানসিকতার দ্বারা পুষ্ট ছিলেন বলে। তাছাড়া ভক্তির আতিশয্যও বীররসকে তার স্বস্থান থেকে চ্যুত করেছিল।

অথচ কৃত্তিবাসের খ্যাতি মুখ্যত নির্ভর করেছে এমন একটি রসের সিদ্ধির উপর, যার অবস্থান আলংকারিকদের নির্দেশের বাইরে এবং যেটি রামায়ণ মহাকাব্যের অঙ্গরসের পরিপন্থী। সে রস হাস্যরস। বস্তুত রঙ্গব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতায় কবি সব শ্রেণীর রসসৃষ্টির প্রয়াসকে অতিক্রম করে গেছেন। এর পিছনের কারণগুলি অনুধাবনযোগ্য। কৃত্তিবাস লোকরুচির অনুগত করে পাঁচালী লিখতে চেয়েছিলেন, বোধহয় বিদগ্ধ পাঠকের রসাস্বাদনযোগ্য মহাকাব্য রচনায় তাঁর তত বেশি আগ্রহ ছিল না। সেকালের পল্লীনির্ভর গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালির রসবোধ লগ্ন হয়েছিল ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি ও পরিহাসপ্রবণ চটুলতায়। অন্তত কৃত্তিবাস নানা স্থানে মূল আখ্যানের বাইরে যেসব স্বাধীন কাব্যপ্রসঙ্গ যোজনা করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, তিনি গ্রামীণ বাঙালির রুচিবোধকেই প্রাধান্য দিয়ে কলম হাতে এগিয়ে গিয়েছেন, মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যরক্ষার দায়বোধ তাঁর ছিল না। এত কিয়ৎ পরিমাণে করুণরস বিঘ্নিত হলেও তিনি অবলম্বিত আদর্শ থেকে সরে আসতে পারেননি। হয়তো এক্ষেত্রে লোকপ্রিয়তার হানি

ঘটার আশঙ্কা তাঁর ছিল। তবে তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সেকালের বাঙালির যথার্থ স্বরূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর রচিত দু'একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা গেল।

কবি লঙ্কেশ্বর রাবণের শক্তিমত্তা নিয়ে উপহাস করেছেন হরধনু উত্তালনের প্রসঙ্গে। সীতাকে বিবাহ করতে এসে বিপুল ওজনের ধনু তুলতে অসমর্থ হলে কবি বড়িম্বিত রাবণ সম্বন্ধে লিখেছেন—'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে। মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥' সীতা অন্বেষণে গিয়ে হনুমান লঙ্কাপুরীতে বন্দী হলে তাকে নিয়ে রাক্ষসীরা পরিহাস শুরু করলে সেও রসিকতা করে বলে—'রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী। সুন্দরী শাশুড়ি পাব রাণী মন্দাদরী।। ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর। আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর।। প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী। রসরঙ্গে তাঁর সঙ্গে রব দিবানিশি।।' লঙ্কাকাণ্ডে 'অঙ্গদের রায়বার' একটি বিশিষ্ট অংশ। এতে উত্তরোল হাস্যরসের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের অনেক কবি কেবল ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে লোক হাসানোর জন্যে কাব্য লিখেছেন। যাইহোক, কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়েছেন অঙ্গদের বচনে। রাবণ ও অন্যান্য সভাসদরা যখন রাক্ষসী মায়ায় শত শত রাবণ মূর্তি ধরে অঙ্গদকে বিভ্রান্ত করতে চাইলো, তখন ইন্দ্রজিতের প্রতি অঙ্গদের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—'যে তোর দারুন পণ তেমন করে কে। কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।।' তার গালির মধ্যে বালি কর্তৃক রাবণের বন্দীত্বের ঘটনাও টিপ্পনী সহকারে উল্লেখিত—'হিতোপদেশ কি বুঝিবি শুন্‌রে ব্যাটা গরু। তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু।। নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি। লোকে বলবে এই ব্যাটাকে বেঁধেছিল বালি।।' এইসব দৃষ্টান্ত সূত্রে বলা যায়, বাঙালির রসরুচি সেকালে খুব উন্নত ছিল না। একদিকে আদিরস ও অন্যদিকে হাস্যরস—এই দুইয়ের সীমার মধ্যে দুর্বলশক্তি, হীনবীর্য নিরুদ্যমী বাঙালি বসবাস করছিল। কৃত্তিবাস এদেরই জন্য কাব্য লিখতে গিয়ে মূল আদর্শ থেকে স্খলিত হয়েছিলেন। যুগের দাবির কাছে তাঁর এই আত্মসমর্পণ সেকালের কবিদের অনিবার্য ভবিতব্য ছিল।

৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যের কাহিনী গঠনে অনুবাদকের তেমন কোনো নিজস্বতা থাকে না। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো মূলের ভাষারূপ বজায় রাখতে পারেন, যদি দুই ভাষার মধ্যে উৎসগত কোন যোগাযোগ থাকে। কৃত্তিবাস সংস্কৃত থেকে বাংলা করেছেন। ভাষার যোগ থাকা সত্ত্বেও বাল্মীকির কাব্যভাষা তিনি অনুসরণ করেননি। প্রাচীন কবির ভাষা উদাত্ত, গম্ভীর ও অলংকৃত। পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ভাষার এইসব বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছিলেন। তবে মোটের উপর কৃত্তিবাসের ভাষা সরল ও প্রসাদগুণযুক্ত। হাস্যরসের স্থানগুলিতে ভাষা তরল। তাঁর খেয়াল ছিল তিনি পাঁচালি লিখছেন। সেই অনুযায়ী সেকালের বিখ্যাত দুই ছন্দোবাহন পয়ার ও ত্রিপদী কৃত্তিবাসের অবলম্বন ছিল। অবশ্য সে সময়ে পয়ার তার নির্দিষ্ট ১৪ মাত্রায় নিয়মিত ছিল না। কোথাও বেশি, কোথাও কম। মনে রাখতে হবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী লেখা হয়েছিল গেয় কাহিনী কাব্য হিসেবে। গানে অক্ষরের বা মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকতে পারে। সুরের টানে অক্ষর বা মাত্রার এই ন্যূনতা পূরণ করা হয়। বর্তমানে যেসব গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তাতে খুব একটা পয়ারের চালে অসমতা দেখা যায় না। কারণ পুথি বারবার লিপিকরণের ফলে লিপিকরদের হস্তক্ষেপে ছন্দের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে, বাকিটা পূরণ করে দিয়েছেন আধুনিক কালের কাব্যসচেতন সম্পাদকগণ। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে পয়ারের ছত্রে এখনও অধিকাক্ষর রয়ে গেছে। যেমন—'টলবল করিয়া উপরে পর্বতের ঘোড়া', 'দূর হইতে দেখে তারে কুম্ভকর্ণ মহাবলী', 'মুনির গায়ে সানার টোপর হইল খান খান', 'নখরের চিহ্ন দিল পর্বতের চারিভিতে', 'ওলটি পালটি চাহেন রাম গোদাবরীর তীর' ইত্যাদি। ত্রিপদীর

ক্ষেত্রে ৮/৮/১০ মাত্রার ত্রিপদী বেশি লিখেছেন কৃত্তিবাস। মুখ্যত ঘটনা বর্ণনায় পয়ার ও দৃশ্য বর্ণনায় ত্রিপদী তাঁর অবলম্বন। ছড়ার ছন্দ তখন ধামালী নামে পরিচিতি। এটি চারমাতার দ্রুতলয়ের ছন্দ। কৃত্তিবাসে তারও আভাস পাওয়া যায় অঙ্গদের রায়বারে। বিষয়ের লঘুতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছন্দ যোজনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস।

কাব্যদেহের প্রসাধনে অলংকার প্রাচীনকাল থেকে নিয়োজিত। কবির ব্যবহৃত অলঙ্কারে তাঁর কাব্যের দ্বৈত প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট। বাল্মীকি শীলিত কাব্য তাঁর আদর্শ। সে সূত্রে কিছু সংস্কৃত অলংকার ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে গ্রামীণ শ্রোতার রসবোধের কাছে বিপুল আবেদন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এমন সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বৈচিত্র্যময় স্বাদ সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি অলংকারের উপর চোখ রাখা যাক—

সংস্কৃতানুগ অলঙ্কার ঃ ১. নিদ্রায় আকুল রামা হল অচেতন ।
চরণ পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ ॥
২. বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ।
৩. চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি ।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥

দেশী অলঙ্কার ঃ ১. তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী ।
২. কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে ।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥
৩. জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ।
৪. কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে ।

বলা বাহুল্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ দেশী অলঙ্কারগুলিতে।

৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক দেশ। এদেশের সাহিত্য-শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য। জল-হাওয়া-মাটির গুণে এখানে রক্তমাংসের মানুষও দেবতায় পরিণত হয়। রামায়ণী কথা সর্বপ্রথম মানবকথার সারাৎসার রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বাল্মীকির রাম সমস্ত মাবকুলের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন বিষ্ণুর এক অবতার। তখন তাঁকে ঘিরে সমগ্র ভারতে রামভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে রামচন্দ্র দেবালয়াশ্রিত দেবতা হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেন। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ও শেষ কাণ্ডে, অধ্যাত্ম, অদ্ভুত ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণে রামের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে একাদশ শতকে সন্ধ্যাকর নন্দী যে 'রামচরিত' লেখেন সেখানে রামকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, লেখমালা, মূর্তিশিল্পে ও মন্দিরসমূহে রামসীতার একত্র উল্লেখ ও অবস্থান এবং তাঁদের পূজাপ্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় চৈতন্যপূর্বযুগে রামচন্দ্র এদেশের মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। পনের শতকে কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন তখন তিনিও এই ধর্মীয় সংস্কৃতির

ঐতিহ্য স্বীকার করে অনুবাদে অগ্রসর হন। কৃত্তিবাসীর রামায়ণে ভক্তির দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দুটি যথাক্রমে নামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ ও পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্যভাব। মনে রাখতে হবে, বাংলার মাটিতে তখনো চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেনি। আসলে এ ভক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তিতত্ত্বের আকর। খুব সুন্দর মেধাবী বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদকে উল্লেখ করে লিখেছেন—'কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধর্মপাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাহার ভক্ত। রাবণ শত্রুভাবে তাহার কাছে হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু কিছু কাব্যপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে কৃত্তিবাস কর্তৃক প্রচারিত রামভক্তিবাদের স্বরূপ লক্ষ করা যাক। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হওয়ার প্রসঙ্গ বাল্মীকি রামায়ণে নেই, রয়েছে অদ্ভুত রামায়ণে। কবি সেই কাহিনী সংযুক্ত করে দেখালেন পাপী রত্নাকর কিভাবে 'মরা' 'মরা' বলতে বলতে 'রাম' নামে উদ্ধার পেয়ে আদিকবি বাল্মীকিতে পরিণত হলেন। রামনাম জগত্তারণের উপায়। একবার জপেই কোটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ করার ফলে রাজা দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মুনি তাঁকে অভিশপ্ত করেন। পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাজা বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের নির্দেশে তিনবার রাম নাম জপ করেন। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বলেন, 'এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥' এমনকি পুত্রকে তিনি চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দেন। লঙ্কাযুদ্ধে অনেক বানর সৈন্য ও রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। অথচ রামের পক্ষ অবলম্বন করেও বানরদের সদ্‌গতি হয়, মুক্তিলাভ করে রামের বিপক্ষদল রাক্ষসরা। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইন্দ্র যে কথা বলেন তাতে স্পষ্টত নামভক্তিবাদের জয় সূচিত হয়েছে। ইন্দ্র বলেছেন, 'বারণের মার বলি কপিগণ মরে। উদ্ধার পাইবে বল কি রামের জোরে ॥ রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস। রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥' হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তার মধ্য দিয়ে কবি দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হনুমান তার হৃদয় চিরে রামসীতার যুগল মূর্ত্তি দেখায়। দুর্বল হনুমানের শক্তি তো রামচন্দ্র। হনুমানের উক্তি—'দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল। তোমা বিনা নাহি কিছ হনুর সম্বল ॥' রামচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রেমের দেবতা। তাঁর ক্ষত্রিয় পরিচয়, পৌরুষ, বীর্যবত্তা সেভাবে উপস্থাপিত নয়। কবি ভক্তির গঙ্গোদকে শত্রু পক্ষের মানুষ তরণীসেন, রাবণ প্রমুখকে স্নান করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। তরণীশেন সমস্ত দেহে রামনাম লিখে যুদ্ধে আসে। এ হেন ভক্তের দেহে রামচন্দ্র কিভাবে অস্ত্রাঘাত করবেন। সীতা উদ্ধারের ইচ্ছা তাঁর মুহূর্তে উবে যায়। তরণীসেন যুদ্ধে মারা পড়লে তার কাটামুণ্ড রামনাম করতে করতে স্বর্গলোকে উড়ে যায়। রাবণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী স্বামীকে নিরস্ত করতে চাইলে রাবণের বক্তব্য—'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে। যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।' কবি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রায় সূচনাভাগে রামনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেছেন। নিজে প্রণিপাত হয়েছেন দেবতার চরণে। ভবসিন্ধু পার হওয়ার ক্ষেত্রে রামনামই যে ভেলা একথা বলতে তিনি ভোলেননি। তিনি লিখেছেন, 'রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা। সংসার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥ রাম নাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়। ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥' পুরোপুরি ভক্তের দৃষ্টিতে লেখা এ কাব্যে সেকালের ভক্তিভাবুক বাঙালি আপন আধ্যাত্মজীবনের স্পর্শ খুঁজে পেয়েছিল। বাঙালির জীবনসাধনার সঙ্গে এ

পাঁচালির আত্মিক মিলের জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাংলার জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হতে পেরেছিল। আর ছিল এর বিশিষ্ট গুণ বাঙালিয়ানা, যাতে এ জাতির মর্মকথা উচ্চারিত। কবি কৃত্তিবাসের ছ'শো বছর ধরে টিকে থাকার সেটাই আসল রহস্য। সে প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ের সমাপ্তি-প্রসঙ্গ।

৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা

বৃহত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন দেখা শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগে রাজনৈতিক কারণে। প্রাচীনযুগের সম্রাটরা প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করলেও সংস্কৃতি ও জীবনাচরণগত পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের এক ভুখণ্ড। এখানকার জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে যে-বাঙালি জাতি তার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জাতিগত লক্ষণগুলিই বাঙালিয়ানা নামে কথিত। তার দৈনন্দিন জীবন, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠান, বারোমাসের পাল-পার্বণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সুনির্দিষ্ট কর্মধারা, বাগ্‌ভঙ্গিমা এসব কিছুই বাঙালিয়ানার অন্তর্গত। বঙ্গের নিসর্গপ্রকৃতি, নদনদী, মাটি, গাছপালা, পশুপাখিও বৃহত্তর অর্থে বাঙালির বাঙালিয়ানাকে নির্মিত করে দিয়েছে। ফলে কোন কবির লেখায় যখন এর প্রসঙ্গ ওঠে, বুঝতে হবে তাঁর কলমে বাঙালির এই নিভৃত নিজস্ব জীবনভঙ্গিটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস সর্বভারতীয় রামায়ণী কথাকে বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটা দেখা যায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এ। কবির পাঁচলি কাব্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত খুব স্পষ্ট। সেকালের বাঙালি পরিবার ছিল একান্নবর্তী। পারিবারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সেখানে যে নিবিড় টান অনুভব করা যেত, কৃত্তিবাসের লেখায় এর প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্ব, দশরথের প্রতি রামচন্দ্রের শ্রদ্ধা, বিমাতাদের প্রতি ভক্তি, ভরতের অগ্রজকে সম্মানদান, সীতার সর্বংসহ দুঃখময় বধূজীবন, হনুমানের দাস্যভাব সবই যেন বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রত্যক্ষিক সত্য। এমনকি এটাও ভাবা চলে যে, সেকালের বহুবিবাহজনিত সপত্নীপ্রথাও রূপায়িত হয়েছে কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রার জীবনাচরণে। সর্বভারতীয় চরিত্রগুলির এইরূপ আঞ্চলিক রূপপ্রাপ্তি একদিকে যেমন অনুবাদকের ক্ষীণশক্তির পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে দীর্ঘকাল ধরে পাঠকসমাজে বেঁচে থাকার গূঢ় রহস্য। মহাকাব্যে যদি একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচেতনার ফসল হয়, তাহলে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির সমূহ জীববোধ যেভাবে উপস্থাপিত তাতে একে জাতীয় মহাকাব্যের সম্মান দেওয়া চলে। জাতির আত্মপ্রতিবিম্বনই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিল এবং সেদিক থেকে তাঁর সফলতা প্রশ্নাতীত। এইভাবে স্বকীয়তার উপস্থাপনায় বামপাঁচালি বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টির সমান্তরাল এক স্বতন্ত্র বঙ্গীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

বস্তুত পক্ষে কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রে, আখ্যানে, পরিবেশ বর্ণনায়, সামাজিকতায়, নিসর্গ প্রকৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বাঙালিত্বের ও বাংলাদেশের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করা যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করা যাক।

প্রথমত, চরিত্রগুলি সবই কমবেশি বাঙালি-প্রাণের রসে সঞ্জীবিত। ঘরোয়া আদর্শের ছাঁচে এগুলি তৈরি হওয়ায় পাঠক রামায়ণের গল্পকে বাইরের কাহিনী বলে মনে করার অবকাশ খুঁজে পায় না। বাঙালি বীরের শৌর্য ও দুর্বলতা দিয়ে রামচরিত্র তৈরি। তিনি পত্নীপ্রেমে দুর্বল এবং স্নেহে, মমতায় ও কোমলতায় সজল। সীতা বাঙালি গৃহবধূর মতো নতমুখী, সহিষ্ণু ও স্বামী-অনুগতা। রাবণকে মনে হতে পারে বাংলার দুর্বৃত্ত কোন জমিদার। কবি মুনিঋষিদের নির্মাণে পেটুক বামুন ঠাকুরদেরকেই আদল করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিকতার ক্ষেত্রে কবির আদর্শ বাংলাদেশের সমাজ। বাল্মীকিতে নেই এমন ঘটনাও কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন কেবল বাঙালি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। যেমন, বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্রকে বিমাতা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করে যাত্রার অনুমতি ভিক্ষা করতে দেখা যায়, যা মূলে অনুপস্থিত। অরণ্যকাণ্ডে বিদেহী দশরথের অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে সীতার বালির পিণ্ডদান সমধর্মী আর একটি বিষয়। নির্দোষ ভরত রামের বনগমনের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে তার জননী কৈকেয়ী ও দুষ্ট পরামর্শদাত্রী মন্থরার সঙ্গে যে আচরণ করে তা অনেকাংশে বাঙালি যুবকের চরিত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। লক্ষ্মণের ঔদ্ধত্য ও গোঁয়ার স্বভাব কবি তাঁর সমাজ থেকেই আহরণ করেছিলেন বলে মনে করি। বাঙালির আবেগপ্রবণতা, কোমলতা, দার্ঢ্য পরশ্রীকাতরতা তাঁর কাব্যে এভাবে নানা দিকে থেকে বাঙালিত্বের মুদ্রাচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক কৃত্তিবাস অবিকল তুলে ধরেছেন। যেমন, রামচন্দ্রের জন্মকেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠান (পাঁচুটি, ষষ্ঠীপূজা, অষ্টকলাই, নত্তা, জননাশৌচান্ত, অন্নপ্রাশন), পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি বর্ণনা আছে কাব্যে। রাজ্যাভিষেকের পূর্বদিন রাত্রে রাম ও সীতা সংযম অবলম্ভনপূর্বক উপবাসী থাকেন। পুত্রের মঙ্গলকামনায় কৌশল্যা শিবের পূজোয় রত হন। দশরথ ও রাবণের অন্ত্যেষ্ঠি সংস্কার বাঙালি হিন্দুর মতো।

চতুর্থত, বঙ্গদেশের বিবিধ স্থাননামের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস অযোধ্যার কাহিনীকে রাসরি বাংলার মাটিতে নামিয়ে এনেছে। গঙ্গা অবতরণের প্রসঙ্গে তিনি নদীয়া, নবদ্বীপ, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশের কথা লিখেছেন, যেগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল।

পঞ্চমত, বাঙালির খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপক উল্লেখ মেলে কৃত্তিবাসের পাঁচালিতে। রামচন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত ভরতকে নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল, দুধ, দই, কইমাছ, চিতলমাছ ইত্যাদি বাঙালির অভ্যস্ত খাদ্যসামগ্রী দিয়ে অভ্যর্থনা করে গুহক চণ্ডাল। ভরতের আহারের জন্য ভরদ্বাজমুনিও যেসব পিঠে পায়সের ব্যবস্থা করেন বাঙালির রসনায় তারা চির আস্বাদিত হয়ে এসেছে। কবির বর্ণনায় মেলে—'চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সামলী। সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি ॥' কবি বানর বাহিনীকে মানবীয় আকার দিয়েই এঁকেছেন। ফলে তাদের ভোজন দ্রব্যও বাঙালির ন্যায়। তারা খায় লুচি, কচুরি, ছানাবড়া, ছানাভাজা, জিলাপি, মণ্ডা, মতিচূর, রসকরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠা, পাঁপড়, পায়েস ইত্যাদি ভক্ষ্যদ্রব্য। বাঙালির পাকশালার বর্ণনা পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে সীতার রন্ধনে। তিনি দীর্ঘকাল অভুক্ত দেবর লক্ষ্মণকে দুর্দান্ত সব ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করেছেন। একটু উঁকি দেওয়া যাক সীতার রন্ধনশালে—'প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ। তার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ ॥ ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাল ব্যঞ্জন। ....শেষে অম্বলান্তে হল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।'

সবশেষে নিসর্গবর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সজলাশ্যামলা প্রকৃতি রামায়ণে উপস্থিত। পশুপাখিরা বর্ণনায় বাংলার জীবজন্তু ও পাখিরা খুব বর্ণবন্ত। সারস, কাদাখোঁচা, শকুন, কোকিল, চিল, কালপেঁচা, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, হরিতাল, পায়রা, বাজপাখি, বাদুড়, বক, টিয়া, চামচিকি, কাঠঠোকরা—কার নাম না উল্লেখ করেছেন কবি। বোঝা যায় কবি বঙ্গদেশের জীবনধর্ম ও পরিবেশের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে এ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত যথার্থ মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙালির হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মকাকাব্যে

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালি সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' কৃত্তিবাসী রামায়ণে পরিস্ফুট বাঙালিয়ানা সম্পর্কে এটাই সারকথা, শেষকথা।

৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা

বেদ-উপনিষদাদির পর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যে-জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা সুবিপুল সেগুলি হল পুরাণ। পুরাণগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক পূরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। পণ্ডিতগণের মতে, পুরাণগুলির জন্ম হয়েছিল কোন বিশেষ ধর্মনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে। বলা হয়ে থাকে, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের অভিঘাতে বৈদিক ধর্মের যে নবরূপান্তর ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ আছে পুরাণে। এই হিসাবে সংস্কৃত লেখা ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পর। পুরাণে পৌরাণিক দেবতাদেরই জয়জয়কার। প্রতিটি পুরাণে পাঁচটি লক্ষণ আবশ্যিকভাবে লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পৌরাণিক দেবতারাই পরবর্তীকালের ধর্মবিশ্বাসে জাঁকিয়ে বসেছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে পৌরাণিক সংস্কৃতিরই আধিপত্য দেখা যায়। পুরাণে, বলাবাহুল্য, কাব্যরস কম, তার পরিবর্তে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গল্পকথা, পূজার্চনাবিদি, প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস এবং প্রচুর পরিমাণে ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিকতা। তাই পুরাণের আবেদন রামায়ণ-মহাভারতের মতো রসপরতান্ত্রিক নয়। পুরাণ থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক চূর্ণসূত্র মেলে। মোট ছত্রিশটি পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণের প্রভাব জনজীবনে সবচেয়ে বেশি। কারণ এ পুরাণে বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় বিষ্ণু তথা তাঁর অবতার কৃষ্ণের জীবনকথা ও বাণী লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এই পুরাণ প্রধান ধর্মগ্রন্থ রূপে বিবেচিত। ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম প্রচারে ভাগবতের ভূমিকা অসামান্য। চৈতন্যোত্তর যুগে তো বটেই, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও যে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভাগবতের সুবিপুল জনপ্রিয়তা ছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের অনুবাদে দৃষ্ট হয়। ভাগবতকে কেন্দ্র করে কবি জয়দেবই প্রথম বড়মাপের কৃষ্ণকথাকাব্য গীতিপ্রবন্ধে লেখেন। কিন্তু তার ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যান প্রথম লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারনে বড়ু চণ্ডীদাস। তবে তাঁর কাব্যের প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে পৌরাণিক ছিল না। তিনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিটিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর প্রেমিক তথা কাম বিহ্বল মূর্তিটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এর পিছনে বোধ হয় লোকরুচির আনুগত্যটাই ছিল প্রধান প্রণোদনা। তিনি ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে কৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখলেও তাকে অনুবাদগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত করা চলে না। তিনি তা দাবিও করেননি। তাছাড়া অনুবাদ সাহিত্যের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল 'লোক নিস্তারণ'। বড়ু সে আদর্শের ধারে-কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে মালাধর বসুই সর্বপ্রথম ভাগবতকে মূলে অনেকটা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ঐ কালপর্বের ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার সেরা অনুবাদ। পরবর্তীকালের কবিরা মালাধরকেই আদর্শ ধরে এগিয়ে ছিলেন, যদিও অনুবর্তীদের রচনায় প্রেমভক্তিবাদের ব্যাপক প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

মধ্যযুগের অধিকাংশ কবির ব্যক্তি-পরিচয় অজ্ঞাত। মালাধর সম্পর্কে যতটুকু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা করা চলে। কবির নিজের দেওয়া বিবরণটি এইরকম—'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিনেল প্রভু ব্যাস ॥ তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন ॥' কবির কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নাকি গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাব্যে কবির স্বীকারোক্তি—'গুণ নাই অধম মুই নাই কোন জ্ঞান। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥' গ্রন্থ রচনার সময়ও নির্দেশ করেছেন কাব্য মধ্যে—'তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন ॥' কবির জন্মস্থান কুলীনগ্রামে তাঁর কুলপরিচয় সংগ্রহ করতে যান কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ। তা থেকেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য মেলে। সবদিক মিলিয়ে মালাধর সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বিবৃত করা গেল। মালাধর বসুর জন্ম বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। তাঁদের সাথে আসেন পাঁচ কুলীন কায়স্থও, যাঁদের মধ্যে অন্যতম দশরথ বসু। মালাধর সেই আদি কায়স্থের ত্রয়োদশ পুরুষ। কবির জন্মসন জানা যায়নি। তবে অন্যবিধ প্রমাণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বলে অনুমান করা হয়েছে। কবির পুত্র সত্যরাজ খান। এঁর পুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন বলে কথিত। কেউ কেউ আবার সত্যরাজ ও রামানন্দকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। কবির শিক্ষাদীক্ষার কথা কিছু জানা যায় না। তবে যেমন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তাতে তাঁকে যথেষ্ট পণ্ডিত বলেই মনে হয়। কবি তাঁর কাব্য শুরু করেন ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। শেষ হয় ১৪০২ শ অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এক গৌড়রাজের কথা উল্লেখ করেছেন, নাম নির্দেশ করেননি। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, ১৪৭৩ সালে নাগাদ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ। ইনি বিদ্যানুরাগী, গুণীর সমজদার ও হিন্দুধর্মের প্রতি অনকূল ছিলেন। রুকনুদ্দিন রাজত্ব করেন ১৪৫৯-৭৪ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী প্রশাসক ছিলেন সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। সেজন্য অনেকেই সঙ্গতভাবে অনুমান করেছেন যে, কবির 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন সুলতান রুকনুদ্দিন। কবির পুত্রের নাম 'সত্যরাজ খান'। এটি কি প্রকৃত নাম না উপাধি বিশেষ? কেউ কেউ বলেন, মালাধরের পুত্র লক্ষ্মীধর বসুই এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রবু রামানন্দ বসুকে খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কারণ তাঁর বংশের গুণী, কৃতী মলাধর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাগবতীয় ভক্তিরসের স্নিগ্ধ প্রস্রবণে সমগ্র বাঙালিকে আপ্লুত করে ভক্তিধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বিনয়োক্তিটি ছিল এইরকম—'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় অন্য জল রহু দূর ॥' রামানন্দকে যে মহাপ্রভু কতটা সম্মান দিতেন তার প্রমাণ মেলে রথযাত্রার সময় নীলাচলে প্রতি বৎসর পট্টডোরী আনবার অনুরোধে।

৫.৪.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব

সংস্কৃত ভাবগত একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট ১২টি স্কন্ধ আছে। অধ্যায় আছে ৩৩৫টি এবং শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। ভাগবতের রচয়িতা কে এ নিয়ে সংশয় বর্তমান। কথিত আছে যে, মহাভারতকার কৃষ্ম দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণগুলির স্রষ্টা। পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে, সতেরটি পুরাণ রচনা করে তার সারৎসার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেন। ভাগবতে কৃষ্মকথা প্রাধান্য পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এ গ্রন্থ বৈষ্মব সমাজে আদৃত হয়েছে। অনুমতি হয়, ভক্তিধর্মের প্রধানকেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে ভাগবতের জন্ম হয়। সেখানকার ভক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা মাধবেন্দ্র পুরী পূর্ব ও উত্তর ভারতে ভাগবত প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধগুলিতে অবশ্য কৃষ্মকথা নেই। এর দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে এবং একাদশ স্কন্ধের ৩১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম, বিংশ ও একবিংশ—এই তিনটি অধ্যায়ে কৃষ্মের জীবন উপস্থাপিত হয়েছে। মালাধর এই দশম ও একাদশ স্কন্ধকে অবলম্বন করে অনুবাদে অগ্রসর হন। তাঁর অনুবাদের লক্ষ্য ছিল 'লোক নিস্তারণ' অর্থাৎ জনশিক্ষা।

ভাগবতের কাহিনীর বাইরেও মালাধর পদচারণা করেছেন। অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণকথায় সেখানে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছেন, কাব্যে তাকে ঠাঁই দিয়েছেন। তবে ভাগবতের প্রেমিক কৃষ্ণকে সেভাবে উপস্থিত করেননি তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐশ্বর্য গুণান্বিত কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন। এটা ঘটনা যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আদর্শ প্রচারের পূর্বে বৈধীভক্তির প্রাবল্যে সমস্ত দেশ ভেসে গিয়েছিল। মালাধর তাঁর সময়ের ভাবনায় আবদ্ধ ছিলেন। তবে তিনিই মধুর পন্থার ভজন সম্পর্কে সম্যক্ অবগত ছিলেন, যার স্মারক 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্য। এই প্রেমময় বাক্যে মধুর ভজনের সংকেত পেয়ে উল্লসিত মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ'। মহাপ্রভুর প্রশংসাধনা মালাধরের কাব্য এর পর থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। আমরা এখন কাব্যটির নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য

মালাধর দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্র অবলম্বনে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত ঘটনা আছে মূল ভাগবতে। একাদশ স্কন্ধে মেলে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনী। অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ-উদ্ধবের কথোপকথনে মুক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, যতিধর্ম ইত্যাদি তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। মালাধর এই দুই স্কন্ধের মূল কাহিনী-কাঠামো এবং কিছু তত্ত্বাংশ তাঁর অনুবাদে অনুসরণ করেছেন। এছাড়া তিনি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কিছু কিছু আখ্যান গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যটিতে। মালাধর যে মূল ভাগবতের সব কটি স্কন্ধ তাঁর কাহিনীতে গ্রহণ করেননি, এতে তাঁর সহজাত পরিমিতিবোধ প্রমাণিত হয়েছে। আসলে অনুবাদ করতে গিয়েও কবি সবসময় নজর রেখেছেন কৃষ্ণকেন্দ্রিক নিটোল একটি গল্পের দিকে। সেটি যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনে অন্য উৎসের কাছে হাতও পেতেছেন। তত্ত্বকথা যতটা সম্ভব বর্জন করেছেন। তাঁর রচনাটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটিতে কাহিনীসজ্জার ক্রমটি এইরকম :

১. আদ্যকাহিনী (বৃন্দাবন লীলা) : এখানে কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িতা বসুমতীর ক্রন্দনপূর্ণ অভিযোগ থেকে কৃষ্ণের জন্ম-অঙ্গীকার, জন্ম, বাল্যলীলা, পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ থেকে রাসলীলা ও শেষ পর্যন্ত বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

২. মধ্যকাহিনী (মথুরালীলা) : এই পর্বে কংস নিধন, কুব্জা-সংবাদ থেকে শুরু করে উগ্রসেনের সেবক হয়ে কৃষ্ণের প্রজাপালন, পরে মথুরা ত্যাগ এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলদুর্গের মধ্যে দ্বারকাপুরী স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ-বলরাম মন্ত্রণা পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

৩. অন্ত্যকাহিনী (দ্বারকালীলা) : এখানে বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয় গ্রহণ, বলরাম-রেবতী বিবাহ, বসুদেব যজ্ঞ, সুভদ্রাহরণ থেকে শুরু করে ঋষিদের অভিশাপ, উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ বিনাশ, জরাব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মালাধর বসু যে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী ভাগবতীয় কৃষ্ণকথাকে কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো বিস্তৃত, আবার কখনো বা পুরোপুরি বর্জন করেছেন, তা তাঁর অনুবাদের ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে। ভাগবতে যেখানে কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা তথা গোচারণ প্রসঙ্গ দুটি অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, কবি সেখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এটি তুলে ধরেছেন। বরং বেশি কলম বুলিয়েছেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশক অংশে। কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে অংশে ভাগবতে গোপীদের ক্রন্দন বেশ বড় জায়গা নিয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। একই প্রবণতা দেখা যায় শাল্ববধের বিবরণেও। মালাধর এখানেও বিস্তৃত কাহিনীকে সংক্ষেপ করেছেন। কবি অভিনবত্ব সঞ্চারের জন্য অথবা কোন কারণে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন বা অন্যতর বিন্যাসও ঘটিয়েছেন। যেমন, ক্রুদ্ধ কংস যখন মহামায়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাথরে নিক্ষেপ করলেন, তখন কবির মহামায়া জানান কংসকে হত্যা করার জন্য যিনি আসবেন তিনি গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এভাবে স্থাননির্দেশ করা হয়নি। মালাধরের নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনাতেও। নাটকীয়তা সৃষ্টি জন্য কবি ঘটনার ক্রম কোথাও কোথাও উল্টে দিয়েছেন। যেমন ভাগবতে আছে কালযবন বধের পর জরাসন্ধের মথুরাপুরী আক্রমণের ঘটনা। মালাধর পুরী আক্রমণের ব্যাপারটি আগে এনেছেন। বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন বলরাম-রেবতীর বিবাহের, মূলে যা ভীষণ সংক্ষিপ্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনায় কবি কেবল ভাগবতের উপর নির্ভর করেননি। তিনি গল্পের ও চমৎকারিত্বের প্রয়োজনে গীতা, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যেরও দ্বারস্থ। দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে যখন বসুদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন তখন এক শৃগালী তাঁকে পথ দেখায়। কবির দেওয়া এ তথ্য ভাগবতের নয়, ভবিষ্যপুরাণের। উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শন তো প্রত্যক্ষভাবে গীতার প্রভাব। মহাভারত থেকে সংযুক্ত হয়েছে সুভদ্রাহরণের কাহিনী। পারিজাত হরণের কাহিনীকে বিশদ করে বলতে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে আখ্যান গ্রহণ করেছেন কবি। মহাভারতের গল্প অনুসরণ করেন জরাসন্ধ ও শিশুপালের জন্মকাহিনীতে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের আলোচনায় অনেকে মনে করেন যে, নৌকালীলা, দানলীলার অংশগুলি পরবর্তীকালে এ কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অর্বাচীন পুথিতে রাধার পাশাপাশি ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের উল্লেখও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের প্রক্ষেপ। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই অংশের পিছনে সেদিনের সর্বভারতীয় ভক্তিবাদী প্রবণতাই কাজ করে গিয়েছিল। অবশ্য এটা ঘটনা যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে-ভক্তিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি নয়, তা ভগাবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুবাদে আরো একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেটি হল, এই রকম বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবাশ্রিত কাব্যে শাক্ত প্রভাবের অজস্র নিদর্শন। যেমন—স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনায় রুক্মিণী দেবকীকে বলেছেন, 'পূজ দেবী চণ্ডিকা ভবানী।' নরকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় বন্দিনী রাজকুমারীরা ঘট পেতে মহেশ্বরীর 'পূজার সংবাদ দিয়েছেন মালাধর—যা মূল ভাগবতে নেই। রাসমণ্ডলে গোপিনী পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের বর্ণনায় কবি তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করেছেন। উদ্ধবের কাছে কর্মযোগের তত্ত্ব বলার সময় কবি তন্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য যোগবাশিষ্ঠ, গেরণ্ড সংহিতা, লিঙ্গপুরাণ, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই ব্যাপক শাক্তপ্রভাব বাংলাদেশের মূল ধাতু ধর্ম্মকেই প্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব কাব্য রচনা করতে গিয়েও মালাধর তাই শক্তি সাধনার বিশেষ প্রকরণকে তাঁর কাব্যে বর্জন করতে পারেননি। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে তন্ত্রনির্ভর যে শাখাটি লক্ষ্য করা যায় তার পূর্বসূচনা মালাধরের কাব্যেই—এ মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।' যাইহোক, অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি যে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছে ভাগবত-বহির্ভূত প্রসঙ্গ সংযুক্তিতে। আক্ষরিক অনুবাদে যে-ধরনের যান্ত্রিকতা দেখা যায় কবির রচনা তার থেকে মুক্ত। তবে রচনাসৌকর্যের

দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রামায়ণের মতো সুললিত হতে পারেনি। যেখানে তাঁর স্বকীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে রচনা কল্পনাশক্তির পরশমণিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একজন জীবনসচেতন শিল্পীর দেখা মেলে সমগ্র অনুবাদ কর্মটিতে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সাহিত্য ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'এই কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মালাধর যতটা নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করেছেন, সে যুগের আর কোনো কবি ততটা ঐকান্তিকতা দেখাতে পারেননি। দু'একটি প্রসঙ্গ বাদ দিলে কবি মূল কাহিনীকে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন, তাতে কোন সংশয় নেই।'

৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ

মালাধরের কাব্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির একটি বিশিষ্ট দিক উপস্থাপিত। চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচলিত থাকলেও অহৈতুকী প্রেমভক্তির ধারণা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তিকে ঘিরে বৈধী ভক্তির প্রবল প্রতিষ্ঠা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। মালাধর তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। এছাড়া কাব্যটি 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামেও অভিহিত হয়েছ। 'বিজয়' শব্দটি এখানে কৃষ্ণের কীর্তিকথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামে কবি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে গেছে। গ্রন্থটি যে রসাস্বাদনের চাইতে ভক্তির সূত্রে পুণ্যার্জনের পথেই অনেক সাহায্য করবে কবির প্রাক্-ভাষণ থেকে সেটা বোঝা যায়। কবি লেখেন—'গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার। শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥' এই প্রসঙ্গে একথা ভাবা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাক্-চৈতন্য পর্বে মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী প্রমুখ ভক্তিপথের সাধকগণ বাংলাদেশে যে-ভক্তিবাদী ভাবনার সূচনা করেছিলেন, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলিতে যে-কৃষ্ণকথা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল বিদগ্ধ সমাজে, তার দ্বারা কোনভাবে উদ্দীপিত হয়ে মালাধর অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কবি কেন তাঁর অনুবাদে সেদিকটিকে প্রাধান্য দিলেন না তা অনুধাবনযোগ্য। অনেকে এই ক্ষেত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে দায়ি করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসলমান প্রশাসকদের অত্যাচার ও ইসলামধর্মের আক্রমণে নির্জিত হিন্দুসমাজে যে বলিষ্ঠ ও বীর্যবান মানুষের আবির্ভাব ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছিল, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সেই ঐশ্বর্য ও প্রতাপের মূর্তিমান বিগ্রহ। একটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষ্ণ যেন জাতীয় বীরের প্রতিমূর্তি। তাই কৃষ্ণকেন্দ্রিক গল্পে আদিরসের স্থলে ঐশ্বর্যগণের প্রাধান্য। আবার কারও মতে, কবির পৃষ্ঠপোষক রাজসভার ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাব তাঁর উপর পড়ায় কৃষ্ণের মধুর ভাবাশ্রিত গোপীজনবল্লভীয় প্রেমরসের তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর দেবত্ব ও শাস্ত্রীয় মহিমা। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে, যে-ভাগবত কবির অনুবাদের আদর্শ তাতে ঐশ্বর্যমিশ্রিত কৃষ্ণলীলারই প্রাধান্য। ফলে মালাধরের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈধীভক্তির প্রথাসিদ্ধ রূপটি দুকূলপ্লাবী আত্মনিবেদনের ভাবোচ্ছ্বাস সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট একটি চরণকে ('নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ') মহাপ্রভু তাঁর দার্শনিক ভাবনার দিক থেকে খুবই মূল্যবান বলে মনে করতেন। এই কাব্যপংক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে রাগানুগা সাধনার মূল ভাবনাটি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তিটির জন্য বৈষ্ণব সমাজে ইহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। তাহা না হইলে ভাগবতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্যভাবের সাক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের

বিষয়।'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তাই যে কবির অন্যতমত লক্ষ্য ছিল, তার কিছু কাব্যগত প্রমাণ এখানে দাখিল করা যেতে পারে। ব্রজলীলার মধ্যে কৃষ্ণ কয়েকটি অসুর বধ করেছিলেন। এর বর্ণনাতে কবির কলম যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা ভাগবতে নেই, কিন্তু মালাধরের কাব্যে আছে। বীররসের বর্ণনায় কবি খুব স্বচ্ছন্দ। অবিষ্টাসুরের বর্ণনা এর অন্যতম। কৃষ্ণ যেভাবে অবলীলায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেছেন, তাতে কবির অনন্ত শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবাত্মক রূপটি খুব স্পষ্টমাত্রায় ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, জয়দেবের পরে মালাধর আইবর্ভূত হলেও তাঁর কাব্যে কোথাও কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধার নাম উল্লেখ করেন না।

৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যমূল্য বিচারে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যা বাঙালির জীবনাচরণ ও ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ, করার ফলে মালাধরের মধ্যে সংগুপ্ত হয়েছিল। কবি মূলের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও বাঙালি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কোথাও কোথাও। ভাগবতের পটভূমি মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকা। সেখানকার নিসর্গপ্রকৃতি, জনজীবন কিংবা লোকাচার বাংলাদেশের তুলনায় অবশ্যই আলাদা। অথচ কবি এমন ভাবে কাহিনী বর্ণনা করেন যাতে পাঠক এই সত্য বিস্মৃত হয়ে নিজের চারপাশের প্রতিবেশকে তাঁর মনের পর্দায় দেখতে পান। জননী যশোদা ও বাঙালি ঘরের মায়ের মধ্যে আমরা কোন পারিবেশিক ভেদ খুঁজে পাই না, যখন তিনি পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেন, "আইস বাপু বলরাম কানাঞিত লইয়া। ভাত খ্যায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া ॥' অঘাসুর বধের পর কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বালকদের খাদ্য বণ্টন করেছেন এ চিত্রও নিতান্ত বাংলাদেশের। কাব্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা ভাত খাওয়ার এইসব সংবাদ কি বাংলার খদ্যাভ্যাসকেই স্মরণ করায় না?

খাদ্যাভ্যাস ছাড়া কাব্যে মেলে বাংলাদেশের অতি পরিচিত বৃক্ষাদির বর্ণনা। কবি মথুরার রস্তার ধারে গুয়া, জলপাই, কামরাঙার গাছ দেখতে পেয়েছেন, বৃন্দাবনের বনে রয়েছে তাল, তমাল, আমলকী, বাসক, পাকুড়, পলাশ প্রভতি গাছ। আবার কবি যখন কৃষ্ণের জন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন, 'পুত্রের জনম দিনে/কাজর দিলা নয়নে/শূন্য ঘরে আছেন শ্রীহরি' তখন একান্ত বাংলারই এক সদ্যোজাত শিশুর চিত্র ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রসঙ্গে যশোদা যখন বলেন, 'মিথ্যা না দুসিয় পুত্রখানি' তখন বাংলাদেশের মাতৃহৃদয়ের অভিমানই রূপ পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বাংলার বর্ণবিভাজন, ফুল, ফল, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি—সব কিছুই কাব্যক্ষেত্রে উঠে আসে। কবির উপমা চয়নেও বঙ্গদেশের অনুষঙ্গ উপস্থিত। কৃষ্ণ যখন কেশী দানবের দেহ বিদীর্ণ করে মাটিতে ফেললেন, তার বর্ণনায় কবি লেখেন, 'ফুটি কাঁকুড়ি যে হৈল খান খান'। এতো একান্তভাবে বাংলাদেশেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা সজাত।

মালাধরের কবিত্বের আলোচনায় অনেকেই হত্যাশাব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবনায় অগোচরে কাজ করে গেছে কবি কৃত্তিবাসের সিদ্ধি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলা প্রয়োজন যে, রামায়ণ কিংবা মহাভারতের গল্প সাধারণ্যে যতটা পরিচিত ভাগবতের কাহিনী ততটা নয়। সেদিক থেকে জনপ্রিয়তায় ঐ দুই মহাকাব্যের গল্পের কাছে ভাগবত দাঁড়াতে পারে না। এইরকম আপেক্ষিক দুর্বল স্থানে দাঁড়িয়ে মালাধরের যাত্রাসূচনা হয়েছিল। ফলে জনপ্রিয়তার নিরিখ দিয়ে তাঁর কাব্যের সিদ্ধি ব্যাখ্যা করাটা অনুচিত। অন্যদিকে, কাব্যরচনায় তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল লোক-নিস্তারণ। ফলে বিশুদ্ধ কবিত্বের জন্য কবিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর ছিল না। আর তাছাড়া

'কবিত্ব' শব্দের অর্থ যদি হয় দ্যুলোক-ভূলোক সঞ্চারী কল্পনাশক্তির ক্রিয়া তাহলে বলতে হবে মালাধর কেন কোন অনুবাদকের সেই ক্ষমতা প্রকাশ পায়নি তাঁদের সৃষ্টিতে। বরং কবিত্বের অর্থকে সংকীর্ণ করে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কাব্যটিতে কবি একটি পূর্বকথিত গল্পের নিটোল ভাষান্তর ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'কাহিনী বয়নে যেমন তিনি মাঝে মাঝে মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তেমনি বর্ণন সৌকর্যে ও অনুভূতি প্রকাশের আন্তরিকতায় কখনও তাঁর কাব্য প্রাণময় হয়ে উঠেছে।' বর্ণনার সৌকুমার্য ফুটেছে যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়ার জন্মের মুহূর্তটিতে—'উঙা উঙা করিয়া কান্দএ কন্যাখানি। চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি ॥' এছাড়া কৃষ্ণপ্রেমতদ্‌গত গোপীদের চিত্রাঙ্কণে কোমলভক্তি নিষ্নাত মাধুর্যের স্পর্শ মিলবে কৃষ্ণের চারপাশে ভীড় করে আসা গৃহত্যগিনী গোপিনীদের বর্ণনায়—'এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল। হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল ॥ স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে। বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে ॥' কৃষ্ণের বংশীনাদে জীব ও জড় জগতের যে আনন্দিত প্রতিক্রিয়া কবি বর্ণনা করেন তার কবিত্ব মূল ভাগবতকে বোধ হয় ছাপিয়ে গিয়েছে। এর এক ঝলক—'কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল। তা শুনি ময়ূর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥ সুখান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে। বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে ॥' মথুরাগামী কৃষ্ণের সংবাদ বন্দাবনে প্রচারিত হলে সমস্ত গোপিনীরা যে-ভাষায় বিলাপ করতে থাকে তার আবেগ ও আন্তরিকতা সত্যই অপূর্ব সঙ্গীতধর্মে কাব্যমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

'আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে ।
আলিঙ্গন না করিব দেব দামোদরে ॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন ।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্ভবন ॥
আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে ।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে ।
কান হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

তবে কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অলংকার ও ছন্দ-প্রয়োগে তিনি সৃজনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর ব্যবহৃত অধিকাংশ অলংকার গতানুগতিক ও ভাগবত অনুসারী। যেমন—'পূর্ণিমার চান্দ জিনি বদলকমল। খঞ্জন জিনিঞা সোভে নয়ান যুগল ॥' অবশ্য এরই ফাঁকে কোথাও কোথাও বাঙালি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলংকার নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন—পুতনার বর্ণনায়, 'লাঙ্গালের ঈষ যেন দন্ত সারি সারি। গিরিসম কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥' তাঁর কলমে মূর্ছিতা রুক্মিনী—'কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝরে।' সব শেষকথা এই যে, বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ম ধর্মের উত্তাল তরঙ্গ জেগে ওঠবার বেশ কিছু সময় আগে মালাধর প্রায় অপরিচিত কৃষ্ণকথাকে সাধারণের ভোগ্য এক সামগ্রীতে পরিণত করেছিলেন। সেখানে তাঁর কেউ দোসর ছিল না, ছিল না প্রতিদ্বন্দীবও। মনে রাখা জরুরী যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত প্রথম রচনা। এই কাব্যের ধর্মীয় গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে মহাপ্রভু যখন মালাধরের বংশধর বসু রামানন্দকে সশ্রদ্ধায় বলেন, 'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥' তখন শ্রীচৈতন্যের এই অভিব্যক্তিই হয়ে ওঠে কাব্যটি সম্পর্কে সবচেয়ে সেরা মূল্যায়ন। মহাপ্রভুর আস্বাদনধন্য গ্রন্থটি তাই চৈতন্যোত্তর কালে নৈষ্টিক বৈষ্ণব সমাজে স্থান ককের নিতে বিশেষ বিলম্ব করে না।

৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা

রামায়ণের মতো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত মহাভারতও ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ। একটি জাতির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সামগ্রিক পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রামায়ণে ছিল দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাত, আর মহাভারতে আছে একই সংস্কৃতির অভ্যন্তর ভাগের নীতিগত সংঘর্ষ। স্বজনঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পাশব প্রতিহিংসা, আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ বীরত্ব, দেবোপম ক্ষমা ট্র্যাজেডির হাহাকার পর্বে পর্বে বিন্যস্ত করে মহাকাব্যের কাহিনীকার মানবভাগ্যের যে করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন তা কাব্য হিসেবে যেমন অতুলনীয়, তেমনি তা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিভূমিও বটে। মহাকবি বেদব্যাস কুরু পাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনার সূত্রে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিশদ পরিচয় রেখেছেন ভারতকথার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তাই এ গ্রন্থ একাধারে পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ। আর ধর্মাদি চতুর্বর্গে সন্ধান দেয় বলে মহাভারত 'পঞ্চম বেদ' নামেও কথিত। মহাভারত যেন একটি বিশাল জীবন নাট্যের প্রদর্শন শালা, যার প্রারম্ভিভক সূচনায় ভারতকথার উন্মোচন, অগ্রগতির পর্বে জিগীষা ও জিঘাংসার কুটিল ইন্ধন, চরমোন্নতিতে রণরঙ্গমুখর অস্ত্রের ঝনৎকার, অবনয়নে ক্রোধশান্তি ও উপান্তে গৈরিক বৈরাগ্যমণ্ডিত এক গভীর ট্র্যাজিক বেদনা। আয়তনিক বিচারে মহাভারত বিশাল এক গ্রন্থ। আঠারো পর্বে বিন্যস্ত ও লক্ষাধিক শ্লোকে সমাপ্ত। অনেকের ধারণা, মহাভারত-বর্ণিত ঘটনা বাস্তব ও ঐতিহাসিক। আর্যভট্টের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বরাহ-মিহিরের মতো, জ্যোতিষশাস্ত্রে কিংবদন্তিরা মনে করেন প্রায় খ্রি. পূ. ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি লিখিত প্রমাণের দ্বারা বর্তমানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, খ্রিঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যেই মহাভারত বর্তমানে আকারে গড়ে উঠেছে এবং খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর যবদ্বীপ ও কম্বোজে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আদিপর্বের শ্লোক থেকে অনুমিত হয়, বেদব্যাস ছাড়া তাঁর পঞ্চশিষ্য সুমন্ত, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (পুত্র) পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা রচনা করেন। তার মধ্যে মহামুনি জৈমিনীর অশ্বমেধপর্বের কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সপ্তম শতকের মধ্যে যে এই মহাগ্রন্থ শিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মজিজ্ঞাসা ও রসপিপাসাকে তৃপ্ত করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল, সে আভাস পাওয়া যায় বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ। শুধু আর্যাবর্তেই নয়, দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষাতেও মহাভারতের কাহিন সাঙ্গীকরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদেও হয়েছিল অল্পবিস্তর। বাংলায় এর সূচনা ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে। ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, সুলতান হসেন শাহের কর্মচারী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সর্বপ্রথম এর চর্চা শুরু হয়। তাঁর পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালেও এ চর্চা অব্যাহত থাকে। এ দুজন কবি চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর একজন কবির কথা জানিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। তাঁর নাম সঞ্জয়। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে এঁদের সাহিত্যকৃতির আলোচনা তাই পরবর্তী খণ্ডাধ্যায়গুলির বিষয়।

৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ইনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসক (লস্কর) পরাগল খানের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন। পরাগল ধর্মে মুসলমান হলেও বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক ছিলেন। তিনি হিন্দু পুরাণের গল্প শুনতে ভালবাসতেন, কিন্তু গল্পরস

নিবৃত্তির প্রধান বাধা ছিল সংস্কৃত ভাষা। সেজন্য পৃষ্ঠপোষিত কবি পরমেশ্বরকে নির্দেশ দিলেন ভারত কাহিনী রচনার, যাতে একদিনের মধ্যেই সমগ্র কাব্যটি শুনে উঠতে পারেন। কবি তাঁর ভণিতায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস', 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর', 'কবীন্দ্র' প্রভৃতি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সমালোচক অপর এক মহাভারত অনুবাদক শ্রীকর নন্দীর সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব নির্দেশ করেছেন। কবিদ্বয়ের অভিন্নতা বিষয়ে যাঁর কলম সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত, তিনি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই মত সমর্থন করেন শহীদুল্লাহ ও সুশীল কুমার দে। বস্তুত পরাগলী মহাভারতে প্রাপ্ত একটি ভণিতায় 'শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া' চরণটি এঁদের ধারণার মূলে কাজ করেছে। কিন্তু এ মত নানা কারণে মানা যায় না। প্রথমত, আমরা জানি, প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের পুথিসাহিত্য গায়েনদের মুখেই বেঁচে থাকতো। সেক্ষেত্রে গায়েনদের মুখে দুই কবির নাম এক স্থানে চলে আসাটা অসম্ভব কিছু নয়। দ্বিতীয়ত,শ্রীকর-নন্দী'-কে যদি কবির নাম এবং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর'-কে যদি উপাধি বলে ধরে নিই, তাহলে তা যুক্তি হিসেবে দাঁড়ায় না। 'কবীন্দ্র'-এর সঙ্গে 'পরমেশ্বর' সংযোগের ফলে প্রথমটি উপাধিতে পরিণত হয়েছে। অতএব শ্রীকর নন্দী নাম প্রক্ষেপ মাত্র। তৃতীয়ত, 'শ্রীকর নন্দী' যদি কবির নামই হতো তাহলে ছুটি-খানী মহাভারতে তিনি বার বার ঐ নাম ব্যবহার না করে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ভণিতা ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বক্তবই যুক্তিযুক্ত—'অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' এবং ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'শ্রীকর নন্দী' ভিন্ন লোক।'

কবন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যের নাম 'পাণ্ডব বিজয়', যদিও পৃষ্ঠপোষকের অনুমতিক্রমে লিখিত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পরাগলী মহাভারত'। এই কাব্যে বাংলার দুইজন শাসকেরক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—হোসেন শাহা ও নসরৎ খান। নসরৎ হোসেনের পুত্র। প্রথম জন রাজত্ব করেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রি. এবং দ্বিতীয় জন ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। যেহেতু কাব্যের বর্ণনায় দু'জন প্রশাকই উল্লেখিত তাই কবির কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কাব্য শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে যে লস্কর পরাগল কবিকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়েছিলেন এটি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একজন মুসলমান প্রশাসকের হিন্দু কাব্যকাহিনী শোনার এরূপ বাসনার কারণ কি? এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া পথ নেই। যতদূর মনে হয়, যোদ্ধৃ মনো ভাবের মানুষ ছিলেন পরাগল। অথচ যুদ্ধবিগ্রহমূলক ইসলামী কাহিনীর সাক্ষাৎ বাংলাভাষায় তখনো পাননি। সেজন্য মহাভারতের কূট ষড়যন্ত্র, বিবদমান দুই শক্তির যুদ্ধবিগ্রহ, সৈন্যাপত্য কৌশল এই তুর্কী শাসককে মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য তিনি কবিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'এইসব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া। দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালী রচিয়া ॥' কবিও অন্নদাতার মর্জিমাফিক মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসরণ করে অতি সংক্ষিপ্ত এক অনুবাদ পেশ করলেন। কবি তাঁর ইচ্ছামতো রচনা কার্যে স্বাধীনতা পাননি বলে রচনাটিতে প্রতিভার বিশেষ কোন ছোঁয়া মেলে না। শিল্পগুণের দিক থেকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। তবুও এ রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা মহাভারতের মতো দীর্ঘ আয়তনিক কাব্যের অনুবাদ এর আগে সাহস করে করতে কেউ অগ্রসর হননি। কবি সুদূর চট্টগ্রামে বসে এ কাব্য লিখেছিলেন। সেদিক থেকে রাঢ় বঙ্গে লেখা পূর্বসূরীদের কাব্যের কোন আদর্শ পাননি। নিজেকেই ভাষাপথ খনন করে পয়ার-ত্রিপদির চালে কথাকে দুলিয়ে রসগ্রাহী অন্নদাতা প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হয়েছে। অনুবাদটির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—১. পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে কবি কোন পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে মূলকে দৃঢ়বাবে অনসুরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ২. মুসলমান প্রশাসকের জন্য রচিত হলেও কাব্যভাষায় আরবী-ফারসীর বিরল ব্যবহার করেছেন। তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে তৎসম শব্দের প্রয়োগ। ৩.

রাজসভার পাঠের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করলেও সুযোগ থাকা সত্ত্বও কবি উৎকট প্রসাধন বা নাগরিক বিলাসকে প্রশ্রয় দেননি, যা পরবর্তীকালের সভাকাব্যগুলির অন্যতম লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরাগলী মহাভারত তেমন শিল্পগুণান্বিত রচনা নয়। তবে কবির রচনাশৈলীতে যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতার দেখা মেলে। যার ফলে পুরো রচনাটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন—'পরিধান পীতবাস কুসুম বসন। নব মেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন ॥' পয়ারের পাশাপাশি ত্রিপদী ব্যবহারে কবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন—'ক্রুদ্ধ হৈল দুর্যোধন/আদেশিলা দুঃশাসন/দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি। রাজার আদেশ পাইআ/দুঃশাসন গেল ধাইআ/সভাতে আনিল একেশ্বরী ॥' বর্ণনায় নাটকীয়তা ও চিত্ররূপ সৃষ্টির দক্ষতাও ছিল পরমেশ্বরের। যেমন—'যেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল। ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মেশামিশি হৈলে ॥' মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এ ধরনের সিদ্ধি যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী

বাংলা ভাষায় মহাভারতের দ্বিতীয় অনুবাদক শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দীকে পাওয়া গেল ঐ একই রাজসভাতে। এই কবি খুব সম্ভব পরাগলের পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে মহাভারতের বিশেষ এক পর্বের অনুবাদ করেন। কবি কাব্যের সূচনায় লিখছেন, 'লস্কর পরাগল কানের তনয়। সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয় ॥' কেউ কেউ ছুটিখানের প্রকৃত নাম নসরৎ খান বলে নির্দেশ করেছেন। আবার এদিকে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের পুত্রও নসরৎ। তিনি অবশ্য কবির লেখনীতে নসরৎ 'শাহ' বলে উল্লেখিত হয়েছেন। কবির অন্নদাতার প্রভু হিসেবে শ্রীকর নন্দী একই সঙ্গে হুসেন ও নসরৎ শাহের নাম সমস্থানে উল্লেখ করেছেন—'নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা। রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥ নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। পঞ্চ গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি ॥' পিতা-পুত্রের একত্র নামোল্লেখ থেকে সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকরের অনুবাদটির রচনাকাল ১৫১২ থেকে ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বলে অভিমত দিয়েছেন।

যতদূর মনে হয়, শ্রীকর নন্দীর কাব্য রচনাকালে লস্কর পরাগল জীবিত ছিলেন না। তাঁর পুত্র নসরৎ খান 'ছোট খান' হিসেবে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কাছে 'ছুটি খান' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনি পিতার মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। তিনি তাঁর পিতার মতোই সুদক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। মহাভারতের অনুবাদে তিনিও শ্রীকর নন্দীকে আদেশ দেন—'শুনিব ভারতপোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনীর পুরাণ-সংহিতা ॥ অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিলা খান মহাশয় ॥' আমাদের মনে হয়, ছুটিখান কেবল রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিষয় নির্বাচন করেছিলেন কবি নিজে। শ্রীকর আগের অনুবাদ সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন বলে কাহিনীতে নূতনত্ব সঞ্চারের তাগিদে কেবল জৈমিনী বিরচিত অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। ঐ পর্বটিতে যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বীররসের বাহুল্য আছে। মুসলমান সেনাপতির মনোভাব বুঝে যে কবি বিষয় বেছেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যটি রচনায় যে ছুটিখানের অন্য আর এক উদ্দেশ্য ছিল, কবি তারও উল্লেখ করেছেন পোষ্টা প্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করে। নসরৎ খান নাকি বলেছিলেন, 'দেশী ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার। সঞ্চারিবে কীর্তি মোর জগৎ সংসার ॥' একথা যদি সত্য হয় তাহলে মুঘল-পূর্ব স্বাধীন সুলতান কিংবা প্রশাসকরা যে বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক দরদ দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় শ্রীকর নন্দী যে অনেক স্বাধন ছিলেন তা কাব্যের কাহিনী সূত্রে বলা যায়। মূল মহাকাব্যের একটি মাত্র পর্বকে অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়ায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য অনেক নতুন কাহিনী অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সেইসঙ্গে মূলকেও বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। যুবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ, জনা, প্রমীলা, বভ্রুবাহন, চন্দ্রহাস, হংসধ্বজ, চণ্ডিকা, সুরথ ইত্যাদি উপাখ্যান কবি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কবিত্বের বিচারে কবীন্দ্রকে অতিক্রম করার সামর্থ্য ছিল শ্রীকরের। রচনার যথেষ্ট সরলতা দেখা যায়। রাজসভার কবি হওয়া সত্ত্বেও কবি পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা বর্জন করেছেন। অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীতে বীররসের প্রয়োগ সুপ্রচুর। কবি মূলের রস বজায় রেখেও অনাবিল হাস্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ভীমের একটি উক্তির কথা স্মরণ করা চলতে পারে। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে ভীমের যাওয়ার কথা উঠলে কৃষ্ণ পরিহাস করে বলেন যে, তাঁর মতো স্থূলোদর পেটুকের এ থেকে বিরত থাকা ভালো। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ত ভীম ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন,

‘মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥
তোহ্মার উদরে যত বৈসে ত্রিভুবন ।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ॥
তুমি স্থূলোদর নহ, আমি স্থূলোদর ।
বিমর্ষিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর ॥
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইলা তুহ্মি ।
তোহ্মা হতে বহু ভক্ষ হইল কি আহ্মি ॥’

এভাবে জৈমিনী ভারতের রসিকতা ও ব্যঙ্গের প্রসঙ্গগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন শ্রীকর নন্দী। কাব্যের বর্ণনা অংশ কবিত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ না হলেও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত। ছুটি খানের নির্দেশে কাব্যটি রচিত বলে এবং একই রাজসভায় স্বল্পকাল ব্যবধানে দুটি একই ধরনের রচনা সৃষ্টি হয় বলে তাদের পৃথকীকরণের কারণেও শ্রীকর নন্দীর অনুবাদকে অনেকে ‘ছুটি খানের মহাভারত’ বলেও নির্দেশ করেছেন।

৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়

আদিপর্বের মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে আরো দুটি নাম পণ্ডিত ও গবেষক মহলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এঁরা হলেন বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়। প্রথমজনের আবিষ্কর্তা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও দ্বিতীয়জনের আবিষ্কর্তা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন। বসু মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্পর্কে এত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে, বহু পরিশ্রমে কুলজী গ্রন্থ ঘেঁটে এই বিস্মৃতনামা কবির পরিচয় উদ্ধারের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। অথচ বিব্রত হয়ে পড়লেন যখন বিজয় পণ্ডিতের রচনার সঙ্গে পরাগলী মহাভারতের পাতায় পাতায় বিপুল সাদৃশ্য দেখতে পেলেন দীনেশচন্দ্র এই মিল বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও সম্পূর্ণ রহস্যের কিনারা করলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরাগলী মহাভারতের ভণিতা অংশ উদ্ধার করে দেখালেন যে, ‘বিজয় পাণ্ডব কথা’ বাক্যাংশটি লিপিকর প্রমাদে ‘বিজয় পণ্ডিত কথা’-য় পরিণত হয়েছে।

বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বগত সংকট এত সহজে সমাধান করা গেলেও সঞ্জয়ের ব্যাপারে কিছু ধোঁয়াশা এখনও রয়ে গেছে। এর আবিষ্কর্তা দীনেশচন্দ্র সেনের দাবি ছিল সঞ্জয়ই বাংলা ভাষায় আদি মহাভারত অনুবাদক। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নাকি তাঁর রচনাকেই আত্মসাৎ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সঞ্জয়ের পুথিতে একস্থানে আছে 'সঞ্জয়ে পয়ারে কথা গহিল যেন মত। হেন মতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত ॥' এই কথার উপরে ভিত্তি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এর সম্পাদক মুণীন্দ্রকুমার ঘোষও সঞ্জয়কেই মহাভারতের আদি অনুবাদক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয়ের নামে প্রচলিত পুথি আর পরগলী মহাভারতের পাঠ তুলনা করলেই বোঝা যায় কবীন্দ্রের রচনাটিই অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ সঞ্জয়ের নামে চলে গিয়েছে। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সঞ্জয়ের ভণিতাগুলি বিচার করে বলেন যে, গ্রন্থের উপাদেয়তা ও উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্যে কোন গায়ক বা সংকলক দ্ব্যর্থবোধক 'সঞ্জয়' নাম ব্যবহার করেছিলেন। দু' একটি ভণিতা এইরকম মিলেছে—'সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়' কিংবা 'সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা'। দীনেশচন্দ্র ও মুনীন্দ্র কুমারের মতে, এই ভণিতাই নাকি প্রমাণ করে সঞ্জয় নামে পৃথক কবির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা ঐ ভণিতা থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এ যে-ভণিতা ব্যবহার করা হয়েছে তা আদৌ সংশয়মুক্ত নয়। মূল লেখক যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি মহাভারতের পৌরাণিক 'সঞ্জয়' চরিত্রের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, পূর্ববঙ্গের ভারত-পাঁচালি রচয়িতাদের কাব্যপ্রবাহে মিলিত হয়ে তথাকথিত সঞ্জয়-মহাভারতের সৃষ্টি করেছে। এই হিসাবে 'সঞ্জয়' একটি যৌথ নাম। অন্যদিকে অনুবাদটিতেসঞ্জয় তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় দাখিল করতে গিয়ে বলেছেন—'ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জনম। সঞ্জয়ের ভারতকথা কহিলেক মর্ম ॥' এবং 'দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার। সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালী প্রকার ॥' এর থেকে দু' একজন গবেষক মনে করেন যে, এই কবি বিজয় পণ্ডিতের মতো একেবারে কাল্পনিক কোন চরিত্র ছিলেন না। তাছাড়া সঞ্জয়ের নামে যে-মহাভারত পাওয়া গেছে তা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় আকারে বড় এবং ভাষাও তুলনামূলকভাবে আধুনিক। খুব সম্ভবত কোন গায়েন পরাগলী মহাভারতকে সামনে রেখে তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু অংশ যোজনা করে গানের উদ্দেশ্যে এ মহাভারত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—"সঞ্জয়" কোন কবির নামও নয়। হরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র 'সঞ্জয়' -এর নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী গান করতেন।" অতএব সঞ্জয় নামের আড়ালে আলাদা কোন রচনাকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এর রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'চার কথা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

সঞ্জয়ের মহাভারত আয়তনে বাকি দুটি মহাভারতের তুলনায় বড়। কাব্যটিতে মূল মহাভারতকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের চেষ্টা আছে। তবে রচনাচাতুর্যে সঞ্জয়ের লেখা উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তবে বিষয়ের অভিনবত্ব দেখা যায় দ্রোণপর্বের পুথির অন্তর্গত 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' শীর্ষক রচনায়। মহাভারত বহির্ভূত এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হলে দ্রৌপদী, সত্যভামা, রুক্মিনী, জাম্ববতী, সুভদ্রা, রেবতী প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্তঃপুরিকারা অভিমন্যু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রণক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন—এই রকম একটি কল্পিত কাহিনী গৃহীত হয়েছে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ'-এ। এতে পাণ্ডবপক্ষীয়দের হাতে কৌরবরা যথেষ্ট নাকাল হয়। অবশ্য পালাটির শেষে ভণিতা দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ণ দাসের। ইনি লিপিকর না পাঁচালী গায়ক তা এখনও অনির্ণীত ॥

৫.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় যে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২। রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের প্রদত্ত আত্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। কৃত্তিবাসের কাহিনী গ্রন্থনে মৌলিকতা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। কৃত্তিবাসের রচনায় রামভক্তিবাদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালি জীবন কতটা উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে উদাহরণ যোগে আলোচনা করুন।

৬। ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৭। অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব পরিমাপ করুন।

৮। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের ছাপ কতটা ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৯। প্রথম পর্বের মহাভারত অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা সম্ভবন্ধে আলোকপাত করুন।

২। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার অভিমত দিন।

৩। বাংলা অনুবাদে কৃত্তিবাস চরিত্র সৃষ্টিতে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তার পরিচয় দিন।

৪। হাস্যরস ও করুণরস সৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত অলংকারগুলির বিশিষ্টতা কোথায় তা বুঝিয়ে দিন।

৬। শ্রীচৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যের প্রতি কেন আসক্ত ছিলেন তা আলোচনা করুন।

৭। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতকে কতটা অনুসরণ করেছে তা বিভিন্ন কাহিনী উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

৮। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত 'পাণ্ডব বিজয়' কে 'পরাগলী মহাভারত' বলার কারণ কি? কাব্যটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯। শ্রীকর নন্দীর অনুবাদের বিশিষ্টতা কোথায় তা দেখিয়ে দিন।

১০। বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়ের মহাভারত অনুবাদ সম্ভবন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। অনুবাদের মুখ্য কারণটি কি ছিল?

২। বাংলায় অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী কী?

৩। 'কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলংকার'—এটি কার কথা?

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম কোথায় ছাপা হয়?

৫। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান কোথায়?

৬। বাল্মীকি ছাড়া কৃত্তিবাসের অন্য একটি আদর্শের নাম বলুন।

৭। বিভীষণের পুত্রের নাম কী?

৮। 'হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোনরে ব্যাটা গরু'—উক্তিটি কার?

৯। তুলসীদাস রচিত গ্রন্থটির নাম কি?

১০। ভাগবতে মোট কত স্কন্ধ ও অধ্যায় আছে?

১১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্য নামগুলি কী কী?

১২। শ্রীচৈতন্যের কাছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন্ ছত্রটি প্রিয় ছিল?

১৩। 'পঞ্চম বেদ' কোনটি?

১৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার রাজসভায় আবিভূত হন?

১৫। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কোন্ পর্বটিকে আশ্রয় করেছিলেন?

১৬। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের আবিষ্কর্তা কে?

১৭। সঞ্জয়ের কাব্যের প্রধান সমর্থক কে?

১৮। 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' অংশটি কার রচনায় আছে?

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. **সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৯১**

২. **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫**

৩. **ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮**

৪. **শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৯৪**

৫. **সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৮**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৬ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্য

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ মূল আলোচনা

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

৬.৪.১ মানিক দত্ত

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাটপট সম্পর্কে জানতে পারবেন। 'মঙ্গল' নামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। দীর্ঘ চারশ' বছর ধরে কত রকমের মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে সে বিষয়ে হদিস করতে পারবেন। দেবী মনসার উত্থান ঘটলো কীভাবে তা জানা যাবে। চৈতন্যপূর্ব যুগে কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব যে মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন তাঁদের ব্যক্তি পরিচয়সহ কাব্যগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে পারবেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব কেমন করে ঘটলো এবং বাংলা মঙ্গলকাব্যে কবে থেকে তিনি বন্দিত হতে লাগলেন এ বিষয়ে জানতে পারবেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলে অনুমতি একমাত্র চণ্ডীমঙ্গলকার মানিক দত্ত সম্বন্ধে ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে স্তিারিত জানতে পারবেন।

৬.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠতর ধারা। অনুবাদ কাব্যের মতো এরও প্রধান নির্ভর আখ্যান, তবে এর কোনো সংস্কৃত-মূল কাহিনী উৎস নেই। গ্রাম-বাংলার ব্রতকথাগুলি যেমন লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃন্তমূল থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছিল একদিন, তেমনি অগণিত বাঙালির ঐহিক কামনা-বাসনার রূপায়ণ ঘটেছে মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায়। বস্তুত লৌকিক দেবদেবীদের পূজাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য প্রচারের গল্পের কোনো জড় খুঁজে পাওয়া যাবেনা কোন প্রতিষ্ঠিত পুরাণে। বরং এগুলির মধ্য দিয়ে সেদিনের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনেক হদিস খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনী, চত্রি, পটভূমি, মেজাজ—সব কিছুতেই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বাংলাদেশকে

এমনভাবে পাওয়া যায় যা আর কোন মধ্যযুগীয় সৃষ্টিতেই মেলে না। এজন্য মঙ্গলকাব্যকে অনেকে প্রাচীন বঙ্গের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ফসল বলেও গণ্য করেন। সমকালীন সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারে এটি একমাত্র তুলিতে হতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণের আপার্থিব প্রেমকথা ভাবালু বাঙালির রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা যেভাবে পূরণ করেছিল, সেভাবে মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মিলন তার বস্তুমুখী জীবনতৃষ্ণাকে অনেকাংশে মেটাতে সফল হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির শেষ গন্তব্যস্থল ছিল মরমীয়া অতীন্দ্রিয়বাদে, আর মঙ্গলকাব্য পৌঁছে দিয়েছিল অলৌকিকতা-সংস্পৃক্ত বস্তুবাদে।

প্রসঙ্গত 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। কেউ বলেন, শব্দটি তৈরি হয়েছে সুভাষণরীতি থেকে। ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে কিংবা তাঁদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে সমাজমন তৈরি করে নিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ 'মঙ্গল'। অন্য কোন পণ্ডিত শব্দটি উৎস খোঁজেন দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে, যা বিবাহ-সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলে মনে করা হয়। কারণ মালয়ালম্ ভাষায় 'মঙ্গল্যম্'-এর অর্থ বিবাহ, তামিল ভাষায় বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর, আর তেলুগুতে 'মঙ্গল' বলতে বোঝায় ক্ষৌরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, কুর্গ অঞ্চলে নানাবিধ সামাাজিক অনুষ্ঠানকেই 'মঙ্গাল' শব্দে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার অন্য ভাবনার সমালোচকেরা 'মঙ্গল' শব্দের উৎস খুঁজে পান রাগসঙ্গীতের নামাবলীর মধ্যে। নারদের মতে, ভৈরব রাগের পুত্রবধূ হল 'মঙ্গলকৌশিকী', আর ক্ষেমকর্ণ পাঠকের মতে মঙ্গলরাগ হিন্দোল রাগেরই অন্তর্গত একটি উপরাগ। তবে একথা সত্য যে, মঙ্গলকাব্য সব সময় মঙ্গলরাগে গীত হতো না। 'মঙ্গল' নামের হদি পেতে কেউ কেউ কাব্যটির সময় নির্ভর গীতি-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এটি গান গাওয়া হতো বলে এর অভিধা নাকি মঙ্গলকাব্য। কিন্তু তথ্য হিসেবে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ধর্মমঙ্গল পালা বারো দিনে উপস্থাপিত হতো সূর্যের সংখ্যা দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে। উপরোক্ত সমূহচিন্তায় বোধহয় কাব্যের প্রকৃতিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই কোন কোন সমালোচক ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন। তাঁদের মতে, মর্ত্যভূমিতে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তগণের মঙ্গল বিধানের জন্য যেসব লৌকিক দেবদেবীর অলৌকিক মহিমার কথা একদা ব্রত পাঁচালির আকারে প্রচারিত হয়েছিল, পরর্তীকালে তাদের কাব্যরূপগুলিই 'মঙ্গলকাব্য' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়। কোন যুগপ্লাবী বিশেষ ঘটনা ও বিপন্ন মানবচৈতন্যের তাগিদ এর সঙ্গে যুক্ত আছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, সমাজে প্রসারিত শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির উত্থানই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণা, তবুও সব মঙ্গলকাব্যে এই ছকটিকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। M. N. Srinivas-এর মতে, আর্যসভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের ফলে যে সংস্কৃতায়নের সূচনা ঘটে, মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীদের উচ্চবর্ণভূক্তির চেষ্টা নাকি তারই স্মরক। কিন্তু এর বিপরীত ভাবনাটিও সমানভাবে বিবেচ্য। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দিক থেকে নিম্নতলস্থ দেবদেবীদের জাতে তোলার চেষ্টা ব্যাপারটি বিচার সাপেক্ষ বিষয়, যেখানে তথাকথিত উচ্চ অভিজাতরাই মঙ্গলকাব্য নিয়ে উক্ত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারে সাহায্য করেছেন, বিপরীতটা নয়। একথা এখন খুব স্পষ্ট যে, অন্ধতা-অজ্ঞতা-অদৃষ্টবাদ-ভীতিবোধ তথা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস যখন দৃঢ়ভাবে চেপে বসেছিল বাঙালি জনমানসে, তখন সেই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্য সমূহের উদ্ভব। যে প্রয়োজন ও আততির সঙ্গে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলোর যোগ তা একান্তভাবে সেকালের বাস্তব সমস্যা ছিল। তুর্কী আক্রমণের কালে নতুন শক্তির অত্যাচার ও বলাৎকৃতির সামনে বাঙালির জাতীয় জীবন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দরকার পড়ছিল উদ্ধত ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুর একত্র

সংহতির অথচ সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থার শাসনে-শোষণে কেবল নির্যাতন ভোগ করছিল। তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের মানসিক যোগাযোগ আদৌ ছিল না। নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় হিন্দুসমাজে বড় ফাটল দেখা দিলে স্বার্থনির্ভর জাতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত হিন্দুরা নীলরক্তের উন্নাসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে এতকালের অবহেলিতদের পাশে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বর্ণাশ্রমীদের কঠোর অনুশাসন এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিথিল হতে শুরু হয়, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অপৌরাণিক দেবদেবীদের স্বীকৃতি দিতে থাকেন পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্তর্গত বিদগ্ধ জন।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত লাগাতার মঙ্গলকাব্য অনুশীলিত হওয়ায় এর রচনাভঙ্গিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। যেমন, বন্দনা, গন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে সব মঙ্গলকাব্য বিভক্ত হবে। তাতে থাকবে চৌতিশা, বারমাস্যা, ফলফুলবৃক্ষ বিহঙ্গের তালিকা, ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, বিবাহের বিশদ বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি। দেবতারা স্বর্গলোক থেকে কাউকে শাপভ্রষ্ট করে পাঠাবেন মর্ত্যভূমিতে। অতঃপর নানা প্রতিকুলতা জয় করে উক্ত দেব কিংবা দেবীর পূজা প্রচার করে আবার ফিরে যাবেন স্বর্গলোকে। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, পৌরাণিক দেবদেবীর বর্ণনা, দিগ্বন্দনা, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয়ও মঙ্গলকাব্যের আবশ্যিক উপাদান বলে গণ্য। রচনার ঐতিহাসিক কালানুক্রম বিচার করলে দেখা যায়, অনার্য-মূল দেবদেবীদের পূজা প্রচারের কাহিনী দিয়ে মঙ্গলকাব্যধারার সূচনা ঘটলেও অচিরে তা বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হয়। অবশ্য সার্বিকভাবে এরা সকলেই 'মঙ্গল' নামযুক্ত হলেও প্রভাব ও প্রাচুর্যের দিক থেকে সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় :

ক. প্রাথমিক তথা প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্য—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল।

খ. মধ্যস্তরের জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল।

গ. গৌণস্তরের মঙ্গলকাব্য—অনাদিমঙ্গল, কমলামঙ্গল, কিরীটিমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, জীমূতমঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের রূপাঙ্গিক এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈদিক দেবতাদের পাশাপাশি বৈষ্ণবদেবতাকে ঘিরেও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচেষ্টা চলে। এর প্রমাণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, গোপালমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, ব্রজমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে। প্রাক-চৈতন্যযুগে প্রধানস্তরের মঙ্গলকাব্যগুলিই কেবল বিকশিত হয়েছিল। ঐ তিনটি বলিষ্ঠ ধারার মধ্যে আবার মনসা ও চণ্ডীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ধর্মমঙ্গলের সূচনা বোধহয় শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর ষোড়শ শতকে। অতএব আমাদের নির্ধারিত পর্বে আলোচ্য হয়ে ওঠেন মনসামঙ্গলের কবি কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব এবং অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাণিক দত্ত।

৬.৩ মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচলনের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রতিষ্ঠা। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সর্প হিংস্র বিষধর এক প্রাণী। তার এক মোক্ষম ছোবলেই মানুষের প্রাণান্ত। এই আধিভৌতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এককালে বিপন্ন মানুষ সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করেছিল, যিনি বঙ্গদেশে কালক্রমে মনসা নামে

পরিচিতা হয়েছে। পণ্ডিতগণের অভিমত, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে সর্পপূজা প্রচলিত থাকলেও সর্প-সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল প্রাচীন মিশরে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। ইউফ্রেটিস তীরবর্তী তুরানী জাতির মানুষি নাকি প্রথম সর্পপূজার প্রচলন করে। তারপর এই জাতির শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হলে সেইসব অঞ্চলে সর্পপূজা বিস্তৃত হয়। ভারতে আর্যরা আসার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরাই সাপকে ঘিরে নানারকমের ধারণা ও সংস্কার গড়ে তোলে। পরে এর প্রভাব এসে পৌঁছয় পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রে। মনসা কোথাও সর্পাভরণা, কোথাও সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবী, আবার কোথাও বা নিজেই সর্পরূপিনী। বাংলাদেশে একাদশ শতকের আগে ভাস্কর্য শিল্পে দেবী মনসার চিহ্ন মিলেছে। চৈতন্য ভাগবতে পঞ্চদশ শতকের শেষবাগে বাঙালি সমাজে বিষহরি পূজার কথা উল্লেখিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনী বাংলার আদিম লোকসমাজের সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সর্পের পরিচয় প্রথমাবধি ছিল না বলে মনে হয়। যজুর্বেদের কাল থেকে তাঁদের মধ্যে সর্পজ্ঞান ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিক মনসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। জাঙ্গুলি প্রকৃতপক্ষে বিষবিদ্যা। তান্ত্রক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে আরো একজন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন কুরুকুল্লা— সর্প ও সর্পবিষের নিয়ন্ত্রী। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্পদেবী 'মন্‌চা অম্মা'। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, এই দেবী পরে 'মনসা মা'-তে পরিণত হয়েছেন। মনসাকে যাঁরা পৌরাণিক দেবীর রূপান্তর বলে মনে করেন ড. সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনে করেন নানা দেব ভাবনা ও রপকল্পনা বিভিন্ন সময়ে মিলেমিশে গিয়ে মনসার পরিচিত মূর্ত্তি গঠন করেছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বৈদিক ইলা, সরস্বতী শ্রী, বৈদিক বাক্, গৌরী, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, পরবৈদিক কমলাসনা, দেবী, পরবৈদিক নাগলাঞ্ছন দেবী এবং লৌকিক বাস্তুদেবতা। মহাভারতের যুগে মনসাকে নিয়ে জরৎকারু ও আস্তিককেন্দ্রিক গল্প রচিত হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচিন পুরাণগুলিতে মনসার বিস্তারিত উল্লখ দেখা যাচ্ছে। মনসামঙ্গলের গল্পসূত্রে যেটা মনে হয় সেটা হল, মনসার পূজা প্রথমে অভিজাত হিন্দু সমাজ মেনে নেয়নি। জেলেও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তিনি পূজা পেতেন। মহিলাদের দ্বারা বন্দিত হওয়ার কারণে তাঁকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেবী বলে ধারণা করতে হয়। অবশেষে এই দেবী বৃহত্তর হিন্দু সমাজে পূজা হয়ে উঠলেন চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয়, সর্পধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা পৃথিবীর আদিমতম ধর্মসংস্কারগুলির অন্যতম। ইনি একই সঙ্গে পশু-পূজা, বৃক্ষপূজা, নদী উপাসনা এবং মাতৃকা আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছেন। শিব-কন্যা হিসেবে ইনি গৃহীতা হলে অনার্যদেবীর আর্যীকরণ ঘটে এবং তখনই শিবের কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে সমীকৃতা হন। তাঁর জন্ম সংক্রান্ত দুটি কাহিনীই প্রাগার্য উৎসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। বর্তমানে মনসাপূজার মন্ত্র পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দান হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উপাচারের উপস্থিতি সেই প্রাগার্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনসামঙ্গল গান এই মনসপূজারই অঙ্গ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা সময়ে আবির্ভূত কবিরা একই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও সকলে সমান প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন না। তাঁদের লেখায় আখ্যান, চরিত্র, বক্তব্যে, উপস্থাপনায় বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সকলের শিল্পচেতনা অভিন্ন না হওয়ায় স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কবিদের আলোচনায় মুখ্যত সেইসব পার্থক্যগুলি অন্বেষণের চেষ্টা করবো।

৬.৩.১ কানা হরিদত্ত

পারিপার্শ্বিক বাহ্য প্রমাণসূত্রে যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় মনসামঙ্গলের কাহিনী প্রথম কাব্যরূপ লাভ করে কানা হরিদত্তের হাতে। পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে কাব্য লিখতে গিয়ে উল্লেখ

করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে ।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর ।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্ভবন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুদ্ধ/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন"র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী ।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি ।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর ।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

সংকীর্ণ ভুমি ছেড়ে কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাহিনীগুলি যে রূপ পাচ্ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে চৌতিশাস্তবের সংযুক্তিতে। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে স্মরণীয় যে, চৌতিশার সংস্কৃত অবয়বটি প্রথম উপস্থাপিত হয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে।

৬.৩.২ বিজয় গুপ্ত

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট জনপ্রিয় কবি হলেন বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্য একদা বরিশাল অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গায়েনের মুখে মুখে বিজয় গুপ্তের রচনা এতটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে কবির নিজের লেখা রূপটি তাঁর থেকে উদ্ধার করা শক্ত। তাঁর লেখায় আধুনিক শব্দ, নতুন পালা, আকর্ষণীয় বর্ণনা যে পরে সংযুক্ত হয়েছে এবং সেটা কাব্যটির বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যই সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিজয় গুপ্তের পুথি প্রথম সম্পাদনা করেন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। সেই গ্রন্থ থেকে কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গ্রন্থসূচনায় কবি আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মুলুক ফতেহাবাদের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটির পশ্চিমে ঘাসর ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদী। কবির জন্ম শিক্ষিত বৈদ্যবংশে। ফুল্লস্রী পরে গৈলা-ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। এর রচনাকাল নিয়ে বিতণ্ডা আছে। একাধিক পুথিতে তিনটি সময় হেঁয়ালির ভাষায় উল্লেখিত। এগুলি যথাক্রমে 'ঋতু শশী বেদ শশী', 'ছায়াশূন্য বেদশশী' ও 'ঋতু শূন্য বেদ শশী', যাদের থেকে ১৪৯৫, ১৪৭৮ ও ১৪৮৪ খিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুলতান হুসেন শাহার নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু কে এই হুসেন শাহ? ইনি যদি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হয়ে থাকেন তাহলে ১৪৯৩ সালে সিংহাসনরোহন করেন এবং মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাঁর রাজ্যশাসনের খ্যাতি সুদুর বরিশালে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বরং মুলুক ফতেহাবাদের সূত্রে কেউ কেউ এক্ষেত্রে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের সময়কে নির্দেশ করতে চান। ইনি প্রজাসাধারণের কাছে হোসেন শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজত্ব করেছেন ১৪৮১-১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর নামেই মুলুক ফতেহাবাদ চিহ্নিত হয় ও এখানকার টাঁকশাল থেকে তাঁর কতকগুলি মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়। 'ঋতু শূন্য বেদ শশী' পাঠ যে পুথিতে মিলেছে সেটি কবির নিজের গ্রাম গৈলা ফুল্লশ্রীতে প্রাপ্ত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মনসার মন্দির ও মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কবির দেওয়া তথ্যানুযায়ী তাঁর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিনী।

বিজয় গুপ্তের কাব্য বেস আয়তনবিশিষ্ট। তিনি সমস্ত কাহিনীকে মোট আঠাশটি পালায় বিভক্ত করেছেন। বিজয় গুপ্তের রচনাসূত্রে আমরা পুরা মনসামঙ্গল কাহনী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা করতে পারি। তাঁর বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম—নারদের কৌশলে চণ্ডী রচিত নন্দন কাননে শিব একদা প্রবেশ করলে পুষ্প সৌরভে আমোদিত হয়ে মনে মদন পীড়া অনুভব করলেন। তাঁর বীর্য স্খলিত হলো। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন পদ্মবনে। পদ্মের মৃণাল বেয়ে সেই বীর্য পাতালে নামলো। সেখানে জন্ম হল মনসাকুমারীর। তিনি অযোনীসম্ভূতা শিবকন্যা। একদা শিব তাকে লুকিয়ে গৃহে আনলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন চণ্ডী। শিবের অনুপস্থিতিতে চণ্ডী প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে মনসার এক চোক কানা করে দিলেন। মনসাও তাঁকে দংশন করে অচৈতন্য করে ফেললেন। অবশেষে শিবের অনুরোধে মনসা বিষ শোধন করলে চণ্ডীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। মনসার বয়সকালে শিব কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। মুনিও বিবাহের পরেই ক্রোধী মনসাকে পরিত্যাগ করে যান। মুনির আর্শীবাদে মনসার আস্তিকসহ অষ্টনাগ সন্তান জন্মালো। চণ্ডীর পরামর্শে শিব মনসাকে রেখে এলেন সান্তালি পর্বতে। নেতা তার রক্ষয়িত্রী। এই নেতারই পরামর্শে মনসা প্রথমে রাখালদেরকে বিপদে ফেলে পূজো আদায় করেন। পরে

মনসাপূজক রাখলদের সঙ্গে হাসান-হোসেনের বিবাদ বাধলে দেবী হাসানের পুরীর সবাইকে হত্যা করেন। সেখানেও তাঁর পূজা মেলে। অতঃপর জালু-মালুকে অনুগ্রহ করলেন। তাদের সমৃদ্ধি ঘটলো। এবার চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন তিনি। শৈব চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে সম্মত হল না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করলেন। বন্ধু শঙ্কর গারড়ির সাহায্যে গুয়াবন বাঁচালে মনসা কৌশলে শঙ্করকে হত্যা করলেন। নটী বেশ ধারণ করে চাঁদের মহাজ্ঞানও হরণ করে নিলে। চাঁদ চললেন বাণিজ্যে। কিন্তু সেখানেও মনসার চক্রান্তে সপ্ত ডিঙা মধুকর সমুদ্র ডুবে গেল, কোনক্রমে প্রাণে বাঁচালেন চাঁদ। যথেষ্ট নাকানি-চোবানি খেয়ে ঘরে ফিরে সংবাদ পেলেন সপ্তম পুত্র লখীন্দর জন্মগ্রহণ করেছে। কিছুকাল পরে তার বিবাহ দিলেন সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে। মনসা অনুচরী কালনাগিনীকে প্রেরণ করে বাসর ঘরে দংশন করিয়ে লখীন্দরকেও হত্যা করলেন। মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেসে চললো নানা প্রলোভন জয় করে। পরে নেতার সাহায্যে গিয়ে পৌঁছল স্বর্গলোকে। সেখানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে মনসার দ্বারা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হল। শর্ত একটাই দাম্ভিক শৈব চাঁদকে মনসার পূজা দিতে হবে। স্বর্গলোক থেকে ফিরে বেহুলা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে শ্বশুর চাঁদকে পূজা দিতে অনুরোধ জানালো। আপ্লুত চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা দিতে সম্মত হলেন। পূজার ফলে চাঁদের হৃত সম্পদ, মৃত সন্তানেরা প্রাণ ফিরে পেল। সেই থেকে মর্ত্যে মনসার পূজা ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিজয় গুপ্তের কাব্যবোধ যে যথেষ্ট ছিল তা তাঁর রচনাটি পড়লে বোঝা যায়। তবে তিনি গবীর ভাবানুভূতির তুলনায় বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। এর ফলে রচনা কিয়ৎ পরিমাণে নীরস হয়ে গেছে। তিনি আখ্যানটিকে একটি সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সূত্রটি হল দেবী মনসার মহিমা কীর্তন এবং পূজাপ্রাপ্তি। রাখালিয়া, জেলে-মালো, মুসলমান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নীচুবর্গের জনসম্প্রদায় পেরিয়ে উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজে কীভাবে মনসা স্বীকৃতি লাভ করলো তারই গল্প এখানে বিবৃত হয়েছে। গল্পে অলৌকিকতা যথেষ্ট থাকলেও কবি কাহিনীতে সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবী মনসা যেভাবে সমগ্র কাহিনীতে চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছেন তার সঙ্গে চৈতন্যপূর্ব পাঠান আমালের রাজকীয় ষড়যন্ত্রময় পরিস্থিতির তুলনা চলে। মুসলমান কাজিরা হিন্দু প্রজার উপর যে-ধরনের অত্যাচার করতো তার আভাস যে মেলে হাসান-হোসেনের পালায়। এছাড়া টুকরো টুকরো আখ্যানে খুঁজে পাওয়া যাবে ধনীর বিলাসিতা, জমিদারী সংঘর্ষ, বাল্যবিবাহ প্রথা, গুপ্তহত্যা, সমকালীন বিবাহ রীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ। বিজয় গুপ্তের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এইটাই যে তিনি ধর্মমূলক আখ্যান বিবৃতিতে সমাজসচেতন প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করেননি। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের গল্প উপস্থাপনায় সেযুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন। কাব্যে বাস্তবধর্মিতার এতটা প্রভাব থাকায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠককে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশি মাত্রায় যুক্ত করে ফেলে। হয়তো, তাঁর রচনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার এটা একটা লুকোনো রহস্য।

চরিত্রসৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের পৈনণ্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। দেব ও মানব দুই শ্রেণীর চরিত্র রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এক নিরিখে বিচার করলে বলতে হয়, বিজয় গুপ্ত প্রকৃতপক্ষে মানবজীনরেই কবি। তিনি স্বর্গের দেবতাকেও দোষেগুণে মানুষের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন। উদাহরণ—মনসা, শিব, চণ্ডী। মনসা তাঁর কাব্যে গোত্রপরিচয়ে দেবী বটে, কিন্তু স্বভাব-পরিচয়ে রাক্ষসী, দানবী। তাঁর মতো ক্রুর প্রতিহিংসাময়ী খল ষড়যন্ত্রকারিণী কোন দেবীকেই ভারতীয় পুরাণে পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাহিনীতেও দেখা যায় তিনি ছলে-বলে কৌশলে পূজা আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন নীতিবোধ, বিবেকের দংশন তাঁর

পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। কবি দেখিয়েছেন যে দেবীর বিড়ম্বিত জীবনের নানা ঘটনার মধ্যেই ছিল এই ক্রুর প্রতিহিংসার বীজ। যিনি আকস্মিক বীর্যপতনের ফল, যাঁর শৈশবে মাতৃস্নেহ কপালে জোটে না, বিমাতা একচক্ষু কানা করে দেন রোষে, দেবকন্যা হয়েও বিবাহ হয় মুনি তনয়ের সঙ্গে, যাঁর ভাগ্যে স্বামীসুখ সয় না, দেবসমাজে ঠাঁই না পেয়ে বাস করতে হয় নির্জন পর্বতে—তাঁরগ মনে ক্ষোভ, রোষ, দুঃখ, অভিমান, বেদনা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এর থেকে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা এবং সে সংগ্রামে তাঁর কোনো বৈধ রণনীতি নেই। অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এইভাবে চরিত্রটির বাস্তব প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় মনসা হয়ে উঠেছেন বিজয় গুপ্তের কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিন্দু। শিবও সমানবাবে কবির কাব্যে দেবত্ব পরিহার করে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য রঙ্গপটুত্ব, স্ত্রৈণতা তাঁকে সাধারণ মানুষের স্তরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চণ্ডী পৌরাণিক মহিমা থেকে স্খলিত হয়ে বাঙালি পরিবারের স্বার্থকুটিল গৃহবধূতে পরিণত। কবির চাঁদ চরিত্রে বীর্যবত্তার অভাব নেই, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। সনকার পুত্রহারানোর হাহাকার যথেষ্ট আবেদনময়। এদের তুলনায় আরো ভালো ফুটেছে বেহুলা। সতী নারীর আদর্শে কবি তাকে এঁকেছেন। অবিচলিত চিত্তে সমস্ত আঘাত বরণ করায় তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিজয় গুপ্তের পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর কাব্যে তাই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আলংকারিক কলাকৌশলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। তাঁর কয়েকটি বিদগ্ধ বাচনভঙ্গী আজও বাংলার জনজীবনে প্রবচনের মর্যাদালাভে সমর্থ হয়েছে—'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে' কিংবা 'অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর। অতি বড় গাঙ্ হইলে ঝাটে পড়ে চর ॥' রসসৃষ্টিতেও বিজয় গুপ্ত স্বাদবৈচিত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যানটি করুণ রসে অভিসিক্ত। কবির বর্ণনায় তার উচ্ছলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি হাস্যরসের একটি স্মিত প্রবাহ সমগ্র কাব্যশরীরে বয়ে চলেছে। চণ্ডী ও শিবের কপট প্রণয়, ডোম নারীকে দেখে শিবের কামাসক্তি, পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার রহস্যালাপ, গণকের ছদ্মবেশে নারদের ভূমিকা, ভাসান পালায় মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মধ্যেও গোদার আকৃতি, উক্তি ও আচরণ যথেষ্ট হাস্যরসের আমদানি করে। কবি রঙ্গরস পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শোভনতার বেড়াও টপকে গিয়েছেন। আদিরসের প্রতি বিজয় গুপ্তের আকর্ষণ ছিল এবং সেটা বোধহয় যুগরুচির দাসত্বের কারণেই। কেউ কেউ তাঁর কাহিনী বিন্যাসে দেখেছেন সামঞ্জস্যের অভাব। এর কারণ বোধহয় জীবনের বহির্ভাগের খণ্ড খণ্ড কাহিনীর উপর তাঁর অধিক নির্ভরতা। এ বি,য়ে ড. ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, 'বিজয় গুপ্তের আগাগোড়া কাব্যে সামগ্রিকতাবোধজনিত ভাবসাম্যের অভাব রয়েছে বলে মনে করি। আসলে বিজয়গুপ্ত ছিলেন যুগসন্ধির কবি। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের উপাদানকে একই চরিত্রের মধ্যে সংহতি দান করা বা বিভিন্ন চরিত্রকে ভাবৈক্যে নিবিষ্ট সামগ্রিকতা দান করবার মতো সংসক্ত জীবনাবাণীর সঞ্চয় কবির ছিল না। তাই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রতি, সংহত অখণ্ডতার চেয়ে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংপূর্ণতা সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। এই জন্যেই দেখি, বিজয় গুপ্তের কাব্যের বিভিন্ন পালা বিভাগের যেন আর অন্ত নেই—আর প্রতিটি পালাই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।' তবে ছন্দের ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য প্রশংসার দাবি রাখে। দলবৃত্তের চারমাত্রায় চাল বজায় রেখে পয়ারেরই দ্রুত লয়ের কিছু পংক্তি রচনা করে কবি ছন্দোবৈচিত্র্যের আভাস দিয়েছিলেন। যেমন—'প্রেতের সনে/শ্মশানে থাকে/মাথায় ধরে/নারী। সবাই বলে/পাগল পাগল/কত সৈতে/পারি ॥' দেশী শব্দের প্রয়োগেও কবির কুশলতা প্রশ্নাতীত। মনে রাখতে হবে, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যের ধারার মধ্যে প্রথম সনতারিখযুক্ত রচনা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, তিনি মঙ্গল কাব্যের যে চাহারা ও চরিত্র বেঁধে দিয়েছিলেন অল্পবিস্তর রূপান্তরসহ সেটাই দীর্ঘ চারশো বছর ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে। কবির এই কৃতিকে খাটো করবার মতো অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ সংশয়বাদীদের হাতে এখনও এসে পৌঁছয়নি।

৬.৩.৩ বিপ্রদাস পিপিলাই

পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের বিশিষ্ট কবি হিসেবে যেমন বিজয় গুপ্ত উল্লেখিত হন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা হিসেবে বিবেচিত হন বিপ্রদাস পিপিলাই। ড. সুকুমার সেনের মতে, বিপ্রদাসই মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো কবি। কিন্তু তাঁর দাবি অনেকেই মানতে চাননি, কারণ কাব্যের মধ্যে স্থাননামে ও ভাষায় যে আধুনিকতা প্রত্যক্ষ করা যায় তা প্রাচীনত্বের পরিপন্থী। যাইহোক, ড. সেন এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে বিপ্রদাসের কাব্যটি সম্পদনা করে বের করেছিলেন। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন 'মনসাবিজয়'। কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ রচনার সময়কালও নির্দেশিত হয়েছে। কবি লিখছেন—'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের সুলতান ॥ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। শুনিয়া বিবিধ লোক পরম পীরিত ॥' এই হেঁয়ালীধর্মী নির্দেশ থেকে ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়, যে-সময়ে বাংলার মসনদে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অধিষ্ঠিত। কবির কাব্যের যে-তিনটি পুথি পাওয়া গিয়েছে তার প্রত্যেকটিতে এই একই সন তারিখ পাওয়ায় এটা তর্কাতীতভাবে ধরে নিতে হচ্ছে যে কবি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেবল কাব্যরচনার কাল নয়, কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে কবি সামবেদীয় পিপ্পলাদ শাখার বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বাস করতেন নাদুড়্যা বটগ্রামে। এটি বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত। কাব্যে ব্যবহৃত কিছু অঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ থেকেও ঐ স্থান কবির জন্মস্থান রূপে সনাক্ত করা যায়।

বিপ্রদাসের কাব্যের কাহিনী বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশ স্বতন্ত্র, বিশেষ করে এর সূচনাংশ। প্রথমেই রয়েছে শিব-গঙ্গার বিবাহ প্রসঙ্গ। দৈত্যবধে আনন্দিত দেবতারা দৈত্যসূয় যজ্ঞে রন্ধনের জন্য শান্তনু ঋষির পত্নী গঙ্গার ডাক পড়ে। শর্থ থাকে যে, যজ্ঞশালায় গঙ্গা রাত্রিবাস করতে পারবে না। শিব সেই শর্তেই নিয়ে এলেন গঙ্গাকে। কিন্তু কাজকর্মের চাপে শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শান্তনুও স্ত্রী গঙ্গাকে আর ফেরত নিতে চাইলেন না। তখন অগত্যা শিবই বিয়ে করলেন গঙ্গাকে। শিবের পিতা ধর্ম। সেই ধর্মের দেখা পাওয়ার জন্য শিব বল্লুকা নদীর তীরে বারো বছর ধরে তপস্যা করে তবে পিতার দেখা পান। ধর্ম আদেশ দেন শিব যেন পদ্মফুল তুলতে কালীদহে যান। চণ্ডী শিবের সঙ্গে কালীদহে যেতে চাইলে শিব নানা কৌশলে তাঁকে নিরস্ত করেন। একদিন ফুল তোলবার সময়ে মদনপীড়া অনুভব করায় শিবের বীর্যপাত হলো। একটি কাক তা উদরস্থ করতে গিয়ে অপারগ হয়ে উগরে দিল। সেটি জলে পড়ে পাতাল ভেদ করে পৌঁছল বাসুকী নাগের জননী নির্মাণির মাথায়। তিনি ঐ ক্ষীরের মতো দ্রব্য দিয়ে একটি পুতুল গড়ে তার জীবন্যাস করে বাসুকীর কাছে দিলে মনসা নাগেদের বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। এরপর বাসুকী তাকে রেখে এলন কালীদহে। এখানেই পিতা শিবের সঙ্গে দেখা হল মনসার। শিবকে দেখে মনসা জেদ ধরলেন পিত্রালয়ে যাবার। কিন্তু শিব চণ্ডীর ভয়ে প্রথমে রাজি হলেন না, পরে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে আনলেন বাড়ীতে। ফল যা ঘটবার তাই ঘটলো। চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ শুরু হলো। এরপ কবি মূল কাহিনীটিতে তাঁর কল্পিত শাখা কাহিনীটি জুড়ে দিয়েছেন। মূল গল্পের মধ্যে মধ্যে আরেও কিছু নতুন প্রসঙ্গ আছে। তবে সেগুলি এতটা অভিনব নয়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে পুরো ঘটনাধারা বিবৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই মিলে। অন্য মনসা-মঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই, নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত অল্পতর অথবা বৃহত্তর আয়তন লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। তাই তাঁহাদের রচনায় পূর্ণ আখ্যানগুলি অনাদৃত এবং সেগুলির যোগসূত্র অতীব

ক্ষীণ।' অর্থাৎ গল্পে সঙ্গতিবিধানের দিক থেকে বিপ্রদাস অন্য কবিদের তুলনায় এগিয়ে। বর্ণনায় কবি উৎকট আতিশয্যকে বর্জন করেছেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। হাসান-হোসেন পালাটি বিজয় গুপ্তের তুলনায় বেশী দীর্ঘ এবং সুপরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে মুসলমান সমাজের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেবল এ কাব্যেই লভ্য। এ কবি পণ্ডিত হলেও কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্যকে অযথা গুরুভারবিশিষ্ট করে তোলেননি।

চরিত্রসৃষ্টিতেও বিপ্রদাস কিঞ্চিৎ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দেবতাকে নিয়ে মানুষ গড়ার চেষ্টা করেননি। তারা আগাগোড়া স্বাভাবিক সুসঙ্গত। মনসার চরিত্রে কঠোরতা নির্মমতা থাকলেও স্থানবিশেষে করুণা ও স্নেহমমতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তবে কবি সমালোচিত হবেন চাঁদ চরিত্রের জন্য। চাঁদের পৌরুষ সেভাবে দীপ্তিমান নয়। বরং কাহিনীর শেষে চাঁদকে অনতপ্ত করে যেভাবে মাতা নত করিয়ে দেন তাতে চাঁদ চরিত্রে সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। এমকি চাঁদ মনসার কাছে শাস্তিপ্রার্থনা করে বলেছে, 'মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার। দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার।।' বিপ্রদাসের মনসা ছলনা করে বেহুলাকে বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেয়। বেহুলা ও সনকা চরিত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে করুণ ও হাস্য দু'প্রকার রসে কবির অনায়াস দক্ষতা দেখা গেছে। লখীন্দরের মৃত্যু হলে মনসার শোক কবির কলমে এইরকম—'চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্ভেবাধন। পড়িল ধরণীতলে হরিয়া চেতন।। উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুতলি। পূর্ণিমার চন্দ্র পূনি কারে দিনু ডালি।।'

বিপ্রদাসের কাব্যটির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ উঠেছে এর আধুনিকতাকে ঘিরে। ড. সেনের প্রাচীনত্বের দাবি সেইসব কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। কবি চাঁদের বাণিজ্যত্রার প্রসঙ্গে যেসব স্থান নামের উল্লেখ করেচেন তার মধ্যে বেশ কিছু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সৃষ্টি। যেমন—নিমাইতীর্থ শ্রীপাট খড়দহ। বাকি কয়েকটি স্থাননামও সংশয়ের বাইরে নয়। যেমন—ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ইছাপুর, রিষড়া, কোন্নগর, এড়েদহ, চিৎপুর, কলকাতা। কাব্যের ভাষাতেও কেউ কেউ দেখেছেন আধুনিকতার ছাপ। যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ—'তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ। পট্টবস্ত্র পরিধান সূর্যের কিরণ।। চরণে নূপুরধ্বনি বাজে রুণুঝুণু। নানা রত্নে মণিময় দীপ্ত করে তনু।।' এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে? সমস্ত দিক বিবেচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বিপ্রদাসের মনসাবিজয়কে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে গণ্য করেছেন।

৬.৩.৪ নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেবের কাব্য কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও অধিকাংশ সাহিত্য-ঐতিহাসিক তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের কবি বলে নির্দেশ করেছেন। এই কবির কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ পুথিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিবরণের নিষ্কর্ষ এই—একদা কবির পিতামহ উদ্ধারণদেব রাঢ় দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিনী। তাঁর মাতামহ প্রভাকর। কবিরা জাতিতে কায়স্থ এবং গোত্রে মৌদ্গল্য। পূর্ব্ববঙ্গের কবি হিসাবে তিনি পদ্মাপুরাণই লিখেছেন। এঁর লেখা গ্রন্থ শ্রীহট্টেও বেশ প্রচলিত। এজন্য শ্রীহট্টের অধিবাসীরা বলে থাকেন যে কবির জন্মস্থান শ্রীহট্টেই। আসলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বোরগ্রাম একদা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাংলাদেসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে একমাত্র যে-কবির কাব্য অন্য রাজ্যে অন্য ভাষাভাষীর মধ্যে বিপুল প্রচার লাভ করেছে তিনি হলেন এই নারায়ণ দেব। এঁরকাব্য আসামে অসমীয়াদের মধ্যে সুপ্রচলিত। অবশ্য তার ভাষা অসমীয়া। দুটি রচনা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় একটি আর একটির ভাষান্তরিত রূপমাত্র। আসামে বহু প্রচলনের কারণে সেখানকার সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের কবি বলে দাবি করেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারায়ণ দেবের যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা তাঁর কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর পদ্মাপুরাণে লৌকিক উপাদানের চাইতে পৌরাণিক উপকরণ বেশি মেলে। কবি কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ , মহাভারত, কুমারসম্ভভব প্রভৃতির দ্বারা কল্পনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও কালদাসের বর্ণনাভঙ্গিও অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে। তবে, বলাবাহুল্য, সবক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেননি। লৌকিক পৌরাণিক সংস্কৃতির সমন্বয় চেষ্টা, যা কিনা তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, নারায়ণ দেবের রচনার সেটা সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। কবির কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাবও কম নয়, যার নিদর্শন ধুয়াতে বৈষ্ণবপদের ব্যবহার।

নারায়ণ দেবের কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটিতে কোন আখ্যান নেই, কেবল আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে আখ্যান থাকলেও চাঁদবণিকের গল্প সেখানে নেই, রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যান। আখ্যানগুলি তিনি বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর তৃতীয় খণ্ডে জায়গা পেয়েছে চাঁদ মনসা-বেহুলা-লখিন্দরের পরিচিত গল্পটি। কবির কাব্য অন্যান্য মনসামঙ্গলকাব্যের তুলনায় বড় হলেও দেবলীলার তুলনায় নরলীলা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যধিক পুরাণনির্ভরতার খেসারত দিতে হয়েছে চরিত্র রচনাতেও। কবি মানবচরিত্রগুলির প্রতি যত্নশীল হতে পারেননি। তবে তাঁর চাঁদ ও বেহুলা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিরা চাঁদ চরিত্রে অনমনীয় পৌরুষ ও দেবীর কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। এদিক থেকে নারায়ণ দেব খুবই সতর্ক ও সম্পন্ন শিল্পচেতনার পরিচয় রেখেছেন। চাঁদ মনসাকে পূজা দেয় বটে তবে দেবীর কাছে কবুল করে—'পিচ দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিব।' সাড়ম্বরে পূজার পরিবর্তে বাম হাতে পিছন ফিরে ফুলজল দেওয়া চাঁদের দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে চাঁদের মুখে কোন অনুতাপ বাক্য বসাননি কবি। বেহুলার ক্ষেত্রে কবি দেখিয়েছেন যে, সে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার পর জননী সুমিত্রার কাছে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে তাঁর চোখের বাইরে চলে গেছে। একটি পত্রে সে আত্মপরিচয় লিখে রেখে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গারোহন করেছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে রূপক হিসেবে দেখবার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন , 'যেদিন বেহুলা প্রথম গাঙ্গুরের ভাসানে মৃতের সহযাত্রিনী হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে চিরতরে জীবিতের সমাজের বাইরে চরিয়া গিয়াছে। সেইদিন তাহার সহমরণ হইয়াছে। অতএব তাহার প্রত্যাবর্তন একটা রূপকের মতো। কবি নারায়ণ দেব ইহাই কল্পনা করিয়া প্রত্যাগত বেহুলাকে মুহূর্তের জন্য মাত্র সমাজের কল্পনা চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।' কবির কাব্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশেছে সরলতা ও স্বভাবিকতা। চরিত্রে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে তিনি ঘটনাবর্ণনার মাঝে মাঝে বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। করুণ রসের উপস্থাপনায় নারায়ণ দেব বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। মনসা ও বেহুলার অন্তর্ভেদী হাহাকার তাঁর কাব্যে উচ্চ স্বরগ্রামে গিয়ে পৌঁচেছে। তাঁর বেহুলা ব্রীড়াশীলা নারী হয়েও নির্মম দৈবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলা। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় তার মর্মস্পর্শী বিলাপ করুণরসে পাঠকের মনকে আর্দ্র করে দেয়। স্বামীর মৃতদেহকে সম্বোধন করে সে বলে—'জাগ প্রভু কান্দী নিশাচরে। ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।। তুমি ত আমার প্রভু আমি যে তোমার। মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।' ড. ভট্টাচার্যের মতে, 'করুণরসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড় কেহ নাই।' কিন্তু কবি করুণরসের সমান দক্ষতায় হাস্যরসও সৃষ্টি করেছেন। রঙ্গব্যঙ্গমূলক বক্রোক্তি রচনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ডোমনী বেশিনী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের রঙ্গপরিহাস তো সব কবির তামাসা প্রকাশের এক প্রিয় কাব্যপ্রসঙ্গ। নারায়ণ দেবের কলমও সেখানে হাসির ছটায় ঝিকমিক করে উঠেছে। একটু দৃষ্টান্ত :

ডুমুনি বলে দাড়ি পাকাইলা কি কারণ ।
নারীর উপরে এখন হে দেহ মন।।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকা বেল।।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বশ করিবার।।

কোন কোন সমালোচক কবিকে অভিযুক্ত করেছেন আদিরসের স্থূলতার জন্য। বিবাহবাসরে সমাগতা নারীগণের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের এক অত্যাবশকীয় উপদান। এখানেও কবি বেহুলার বিবাহে উপস্থিত বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তি প্রকাশের হাস্যকর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া কাব্যের অনেক জায়গায় কামাবেশের উপস্থাপনা আছে। নাবালক লখিন্দরের মধ্যেও আদিরসের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কেউ কেউ নারায়ণ দেবের রুচির প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, কবি পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আদিরসের উতরোল বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল যুগরুচি। এর কাছেও কবিকে হার মানতে হয়েছে।

কোন কোন সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ দেবকেই মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিতে চান। তাঁদের যুক্তি, এ কবির কাব্যে কাহিনী, চরিত্র, রস সৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বিষয় সুচারুভাবে মিলে মিশে চমৎকার কবিত্বে পরিণত হয়েছে। এজন্যই কি এ কবির কাব্যের অনুলিপি এত বেশি? ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বাস্তবিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যুগধর্মের জন্য তাহা ততটা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।' পরবর্তীকালে যাঁরা পদ্মপুরাণ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারায়ণ দেব কর্তৃক প্রভাবিত হন। দ্বিজ বংশীদাস এঁদের মধ্যে অন্যতম। নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ও আসামে 'সুকবিবল্লভ' নামে পরিচিত। কবির পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের যে বংশ লতিকা মিলেছে তার সূত্রে নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে নির্দেশ করা সঙ্গত।

৬.৪ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা

চণ্ডীমঙ্গলের আরাধ্যা দেবী হলেন চণ্ডী। এই দেবীর উদ্ভবের ইতিহাসও মনসার মতো বিচিত্র। লৌকিক এবং পৌরাণিক উভয় সংস্কৃতির সঙ্গে চণ্ডীর যোগ আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সভ্যতার কোন্ পর্বে চণ্ডী উদ্ভূত হয়েছিলেন সে নিয়েও গবেষক মহলে সংশয় বর্তমান। সাপের সঙ্গে মনসার যেমন প্রত্যক্ষ যোগ আছে, সেভাবে চণ্ডীকে সরাসরি কোন টোটেমের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। কালকেতুর আখ্যানে তিনি অরণ্যপশুর রক্ষয়িত্রী দেবী, ধনপতি-পালায় তিনিই আবার হারানো-প্রাপ্তির দেবতা, তাঁর বরে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সদাগরের গৃহ। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী ছলনা করার জন্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করেন—কখনো মৃগী, কখনো গোধিকা, আবার কখনো বা ষোড়শী বামার মূর্তি। তাই এই দেবীর উৎস নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তবে চণ্ডীর সঙ্গে যে অরণ্যের যোগ ছিল তা দুটো আখ্যানেই পরিস্ফুট হয়েছে।

পৌরাণিক সাহিত্যে ও বাংলার স্থাপত্যকলায় চণ্ডীর আবির্ভাব বহু প্রাচীন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত যা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে খ্যাত তা খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন।

অর্বাচীন কালের পুরাণ বলে বিবেচিত স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, বারাহীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, বামন পুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডীর দেবীত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ গবেষকের ধারণা, দশম শতকের পূর্বেই চণ্ডীদেবীর প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই দেবীর সঙ্গে গোধিকা উপস্থিত, কোথাও আবার গজলক্ষ্মীর মতো দুটি হস্তীও আছে। এর তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে চণ্ডীর আবির্ভাবের উৎসে পৌঁছে গিয়েছেন কেউ কেউ। সবাই যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা নয়, তবুও তাঁদের ভাবনাগুলির সারাৎসার এখানে পেশ করা যেতে পারে।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই স্ত্রীদেবতা ও মাতৃকামূর্তির পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে শক্তি সম্পকিচ্ছুত তত্ত্বচিন্তা প্রথম প্রকাশ করেছেন আর্য ঋষিগণ অম্ভভূণ ঋষির বাক্নাম্নী কন্যার উক্তিতে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ সংখ্যক সকূক্তে যে অরণ্যানীর উল্লেখ আছে তিনিই 'বহু শত শতব্দীর ইতহাস বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও বিচিত্র লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরনো বাঙ্গালা সাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন।' এছাড়া ড. সেন মনে করেন, দুর্গার দুটি রূপ প্রাচীনকাল তেকে পাশাপাশি চলে আসছে। একটি রূপে তিনি পর্বতদুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী, অন্যরূপে মরুকান্তারবাসিনী পালয়িত্রী। অবশ্য প্রথম রূপটিরই বাহন রূপে গোধাকে লক্ষ্য করি আমরা। অধ্যাপক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও সমানভাবে চণ্ডীর পৌরাণিক উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বিশ্বসারতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর রূপ, ধ্যান ও পূজাবিধির প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সংকলিত বলে অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনীর আখ্যান যে বীজরূপে পাওয়া যায় তাও জানিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে—

"ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি/যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং সসূনো/রক্ষোহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তি।।

কিন্তু যে সমস্ত গবেষকগণ অনার্যদের নারীদেবতাকেন্দ্রিক ধর্মভাবনার মধ্যে চণ্ডীর উৎস সন্ধান করেন তাঁরা উপরোক্ত মত অস্বীকার করেন। চণ্ডীর এই অপৌরাণিক উৎসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ছোটনাগপুরের ওঁরাও সমাজের দেবী 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে চণ্ডী নাম ধারণ করেছেন। ওঁরাও যুবকদের পশুশিকারে সাফল্য ও যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে চাণ্ডীবোঙ্গার পূজো করে। কালকেতু উপখ্যানে চণ্ডীর বারবার রূপ-পরিবর্তনের কথা মনে রেখে আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন যে, চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কাহিনীর চণ্ডী ও ওঁরাও সমাজের দেবী চাণ্ডী অভিন্ন। এ দুই দেবীই অরণ্য পশুর হিতাকাঙ্খী। গবেষক-অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত চণ্ডীর অনার্য উৎসের সন্ধানে প্রাচীন পৃথিবীর আদিম ধর্মচিন্তার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি প্রাচীন মিশরের আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তার, গ্রীসের দিমিতর প্রমুখ প্রধান মাতৃকাদেবীদের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধেছেন 'শাকম্বরী' দুর্গাকেও। ভারতবর্ষে এই শস্যদায়িণী মাতৃকাদেবীর আবির্ভাব আর্যানুপ্রবেশের পূর্বে। পৌরাণিক দুর্গার বোধনে নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পূজা এই প্রাচীন শস্যদেবীর পরিচয় বহন করে। ড. সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'দুর্গা তথা চণ্ডিকা যে একদা অরণ্যমণ্ডলেরই কোনো দেবী ছিলেন তার আরো একটি প্রমাণ হল তাঁর 'কোকমুখা' নামটি। কোক অর্থে ব্যাঘ্র (মতান্তরে বন্য কুকুর বা শৃগাল) স্পষ্টতই এই পশু ও মানবের সমন্বিতরূপ সংবলিত দেবীর কল্পনা সম্পূর্ণভাবে মানবিক মূর্তিসম্পন্ন দেবকল্পনার চেয়ে পূর্ববর্তী।'

চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গালকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গাল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্ভবন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কোন্ সময়ের রচনা তা এখনো নিঃসংশয়িত ভাবে স্থিরীকৃত হয়নি। এর প্রথম কারণ, যেসব পুথি পাওয়া গেছে সেগুলিতে কোথাও গ্রন্থরচনার সময়কাল নির্দেশ করা নেই। দ্বিতীয়ত, কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও এর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় এমন প্রাচীনত্ব (বৌদ্ধ ও নাথধর্মের প্রভাব) লক্ষিত হয় যে, যে-কারণে আশুতোষ ভট্টাচার্য ধারণা করেন 'এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল।' অবশ্য কাব্যের ভাষা বিচার করে একে কখনোই ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দেশ করা যায় না। বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য কত প্রাচীন? বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সাক্ষ্যে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে একে স্থাপন করা যায়। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যপূর্ববর্তীকালের নবদ্বীপের ধর্মচর্চার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'ধর্মকর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।' সময়টা পঞ্চদশ শতকের চতুর্থপাদ। অনুমান করা যায়, ঐ সময়েও সমাজে চণ্ডীমঙ্গল প্রচলিত ছিল, নইলে এর 'জাগরণ' পালার উল্লেখ এভাবে স্পষ্টতা পেতো না। মাণিক দত্ত এই সময়কালের কবি হতেও পারেন।

মাণিক দত্ত কোথাকার লোক ছিলেন তা নিয়েও পণ্ডিতগবেষকরা অনুমান করেছেন। কবির নিবাস মালদহের ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল বলে অধিকাংশ গবেষকের ধারণা। তাঁদের অনুমানের পিছনে কিছু বলিষ্ঠ যুক্তিও আছে। প্রথমত কবির যে দুটি পুথি মিলেছে তা মালদহ জেলা থেকেই। মালদহে এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই কাব্য পঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, কবি কাহিনীর সূত্রে যেসব গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির নাম করেছেন তার বেশির ভাগ মালদহ জেলাতেই মেলে যেমন—ঝাড়গ্রাম, বড়গাছা, কাঞ্চন নগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাত্যার বিল,কেন্দুয়ার নালা, গৌড়েশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পুথির ভাষায় মালদহের বাক্‌রীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কবির আত্মবিবরণী থেকে আর একুট তথ্য মেলে যে, কবি প্রথমজীবনে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। পরে দেবীর কৃপায় তিনি এর থেকে মুক্ত হন। দেবী চণ্ডী তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুথি লিখতে স্বপ্নাদেশ দেন। দেবীর প্রসাদে কবিত্ব লাভ করে কাব্য রচনায় কবি আত্মনিয়োগ করেন। এরপর বোধহয় কবি গানের দল বাঁধেন রঘু ও রাঘব এই দুইজন দোহারকে সঙ্গে নিয়ে। এদের নিয়ে কবি কলিঙ্গাদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কলিঙ্গরাজের কুনজরে পড়ে কারারুদ্ধ হন। পরে চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতির দুটি আখ্যানই আছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে এবং ধনপতির আখ্যানটি খণ্ডিত। সূচনায় রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। কবির যাবতীয় কৃতিত্ব কিন্তু ঐ প্রথম অংশেই। ধর্মমঙ্গল ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেছেন যে তাঁর রচনাটি প্রাচীন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরার গানে ঐ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি গতানুগতি দেববন্দনা পরিহার করে হস্ত-পদ-মস্তকহীন ধর্মগোঁসাইয়ের জন্মকথা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। ধর্ম গোলোকের ধ্যান করতে তাঁর মুণ্ড সংযোজিত হল। ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদির সৃষ্টি হল। এরপর উৎপত্তি হল জলের। জলে ভাসতে লাগলেন নিরঞ্জন। নিরঞ্জন থেকে আদ্যার উৎপত্তি। মাণিক দত্ত এই আদ্যাকেই চণ্ডীতে পরিণত করেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করলে ধর্মের আদেশে মহাদেব আদ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। এরপর কাহিনী মোড় নিয়েছে আদ্যা-চণ্ডীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্য প্রখ্যাপনের দিকে।

মাণিক দত্তের কালকেতু ও ধনপতি পালার কাহিনী কিংবা চরিত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিবনিন্দায় দক্ষপত্নী প্রসূতিও পঞ্চমুখ ছিলেন। ধনপতির গল্পে লহনা ও খুল্লনার সম্পর্ক বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের সতিনীকোন্দলের যথার্থ রূপটি

এখানে ধরা পড়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, আখেটিক খণ্ডের তুলনায় কবির বণিক খণ্ডটি সুপরিকল্পিত, 'কিন্তু পুথির রচনা সর্বত্রই অত্যন্ত শিথিলবন্ধ, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে সর্বত্রই দায়িত্বহীনতা দেখা যায়।' মাণিক দত্তের চরিত্রসমূহ কোন অভিনবত্বের দাবিদার নয়। কেবল ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি সামান্য পরিমাণে উজ্জ্বল। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কাব্যটি জনসাধারণের জন্য লেখা বলিয়া ছড়াবহুল'। মন্তব্যটি সঠিক। কবির বিভিন্ন বর্ণনায় ছড়াধর্ম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেমন জরতীবেশিনী চণ্ডী হেঁয়ালি করে বলেছে—

'আমারে বোল ডানরে বুড়িয়ে আমার বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বসে খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়শী॥...
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হৈনু ডান তোমা খাইবার॥'

সবশেষ কথা এই যে, মাণিক দত্তের কাব্যে সুষম ঐক্যের অভাব আছে, এর ভাষা ও ছন্দ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাব্যে দু'একটি স্থানে মুকুন্দের ভাষাভঙ্গির নকল থাকলেও তা পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে ধারণা করা সঙ্গত।।

৬.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যগুলি উদ্ভবের পিছনে কারণসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। মনসামঙ্গল কাব্যধারা বিষয়ে আপনার অভিমত দিন।

৩। পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্তের কবিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন।

৫। মনসামঙ্গলকার নারায়ণদেব সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৬। দেবী চণ্ডীর স্বরূপ নির্ধারণ করে চৈতন্য-পূর্ব যুগের চণ্ডীমঙ্গলকার মানিক দত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। 'মঙ্গল' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণগুলি উপস্থিত করুন।

৩। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। দেবী মনসার উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করুন।

৫। প্রথম মনসামঙ্গলকার কানা হরিদত্ত বিষয়ে আলোচনা করুন।

৬। চরিত্রসৃষ্টিতে কবি বিজয়গুপ্তের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৭। বিপ্রদাসের কাব্য বিজয়গুপ্তের তুলনায় কতটা স্বতন্ত্র সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৮। চণ্ডীর উৎস বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিন।

৯। মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা কোন্‌খানে আলোচনা করুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কোন্ বর্গের?

২। মনসা তথা সর্প-সংস্কৃতির সূচনা কোন্ দেশে?

৩। 'মন্‌চা আম্মা' কোন্ গোষ্ঠীর দেবী?

৪। কানা হরিদত্ত কোথাকার লোক?

৫। বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল কত?

৬। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের নাম কি?

৭। নারায়ণ দেব আসামে কি নামে পরিচিত?

৮। মাণিক দত্ত কোন্ অঞ্চলের কবি?

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীমন্তকুমার জানা, ১৯৯৪

৩. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন, ১৯৯১

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

করেছিলেন কানা হরিদত্তের নাম। বেশ কড়া সমালোচনার সুরে বলেছিলেন—

'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে ।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর ।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥'

কবির কাব্য সম্ভবন্ধে একথা বলার মতো জোরালো কিছু আমাদের হাতে নেই। তাঁর কাব্য আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি, এমনকি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পনের শতকের শেষভাগে তা লুপ্ত ছিল। অতএব যে-কাব্য সমালোচক নিজে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কটুকাটব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে পড়ে। পক্ষান্তরে এটা হতে পারে যে, বিজয় গুপ্ত নিজের কাব্যকে গৌরান্বিত করে তোলার জন্য এ হেন ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় মেতে ছিলেন। যাইহোক, বিজয় গুপ্তের কাছ থেকে একটা খাঁটি খবর পাওয়া গেছে যে, কানা হরিদত্তই মনসার প্রথম গীত রচয়িতা। নারায়ণ দেবের একটি পুথিতেও হরিদত্তকে এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হরিদত্ত সম্বন্ধে আর একটু তথ্য মেলে পুরুষোত্তম নামক গায়েনের উল্লেখ থেকে, যিনি হরিদত্ত রচিত লাচাড়ির ছন্দ গান করতেন। গায়েনের ভণিতাটি এইরকম—'কানা হরিদত্ত/হরির কিঙ্কর/মনসা হইক সহায়। তার অনুরুদ্ধ/লাচাড়ীর ছন্দ/লাচাড়ীর ছন্দ/শ্রীপুরুষোত্তম গায়।'

হরিদত্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। ময়মনসিংহের দিগ্‌পাইৎ গ্রাম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ পুথিতে কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামধেয় একটি শিকলি পাওয়া গিয়েছে। সেইসূত্রে গবেষক মহলে ধারণা যে, কবি ময়মনসিংহের মানুষ ছিলেন। এ কবির কাল নির্ধরণেরও চেষ্টা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন"র সেনের মতে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমত নানা কারণে মেনে নেওয়া যায় না। নানার প্রধানতম বাধা এর ভাষা। দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রাপ্ত পুথিটির যে-অংশ নকল করে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান তার মুদ্রিত রূপ দেখে পণ্ডিত মহলেই সংশয় জেগে ওঠে। কারণ সে ভাষায় আধুনিকতার ছাপ যথেষ্ট। আবার বিজয়গুপ্তও যে-ধরনের সমালোচনা করেন তা আদৌ সমর্থিত হয় না ঐ রচনায়। মুদ্রিত কাব্যাংশের কিয়দংশ এইরকম—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী ।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি ।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর ।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥'

বিজয় গুপ্তর কাব্যরচনাকালে (১৪৮৪ খ্রিঃ) যদি হরিদত্তের গীত সত্যসত্যই লুপ্ত হবার মুখে পড়ে তাহলে চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে এই কবি আবির্ভূত হতে পারেন বলে অনুমান করা যায়। আর এই সময়েই ব্রতকথার

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীয়মান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি দেবীমূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্রতারা' নামে যে দেবীর কল্পনা করেন, তিনিই হিন্দু রূপান্তরে চণ্ডী। বজ্রতারার নামে যে-ধ্যান পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্যই শুধু মেলে মঙ্গলচণ্ডীতে। সেটি হল, দুই দেবীই অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

এখন উপরোক্ত মতসমূহের মধ্য থেকে আমরা গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। তার আগে কয়েকটি সম্ভাব্য অনুমান—১. মূল দেবী চণ্ডী এবং তাঁর নামটি যে অনার্য উৎসজাত এমন অনুমানের বিরোধী তথ্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। ২. বেদে চণ্ডী নামটি অনুপস্থিত। ৩. কাব্যে দেখা যাচ্ছে, গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে প্রবেশ করেছেন চণ্ডী এবং গোধিকা কালকেতুর ভক্ষ্য এবং শেষ পর্যন্ত পূজ্য। টোটেমতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর অনার্য উৎস বেশি করে ধরা পড়ে। ৪. ইনি অরণ্য পশুদের রক্ষা করেন ও এঁকে তুষ্ট করলে শিকারীদের সাফল্য আসে—এ দুটি ঘটনাও দেবীর আরণ্যক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। ৫. চণ্ডী ধনদাত্রী বটে। ৬. ধনপতির কাহিনীতে দেবী আরণ্যক প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে যোষিতামিষ্ট দেবীতে পরিণত। ৭. মশান তেকে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় চামণ্ডারূপিনী দেবী শ্রীমন্তকে যেভাবে উদ্ধার করেন সে-রূপের মধ্যে চণ্ডীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। অতএব সিদ্ধান্ত, চণ্ডীর রূপ, ভাব এবং ঐশ্বর্য কল্পনায় আর্য-অনার্য হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেবপরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতহাসের বিভিন্ন ধাপে—বিভিন্ন সূত্রে। পৃথিবীর আদিম মাতৃকাদেবী শস্যশালিনীরূপে প্রথমে গৃহীতা হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তায়। অনার্য সংস্কৃতিতে ইনি অরণ্যজন্তুর রক্ষাকর্ত্রী ও সেইসূত্রে শিকার-সাফল্যেরও দেবী। ঋগ্বেদে এই বনদেবীই অরণ্যানী, যিনি অভয়া ও পশুমাতা। এরপর পৌরাণিক যুগে সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেন, পৃথক পৃথক দস্যুবিনাশের গল্প গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখ থেকে হিন্দু সমাজে চণ্ডীর অনুপ্রবেশের ক্রমটিকে অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থদুটিতে বলা হয়েছে—চণ্ডী 'কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা'। অর্থাৎ চণ্ডী নারী-সমাজেরই দেবতা। এই তথ্য আরো দুটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের। চণ্ডী 'অনার্য-মূল' দেবী বলেই কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে নারীদের প্রশ্রয়ে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়েছে তাঁকে? খুব সম্ভব তাই। তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবী হবেন তাহলে তাঁকে ঘিরে মঙ্গালকাব্য গড়ে উঠবে কেন? মনসা যেমন হয়ে ওঠেন শিবের কন্যা, চণ্ডী তেমনি রূপান্তরিত হন শিব-পত্নীতে। পরবর্তীকালে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিশে যান তিনি। চণ্ডীমঙ্গলে সেই সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

৬.৪.১ মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত। এই কবির নাম জানা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনা-সূত্রে। তিনি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েকটি স্থানে মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যারা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।' কিংবা 'আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস। মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।' মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে। তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ও অন্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার ওঝা 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গাল' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে কাব্যটি সম্বন্ধে সবিশেষে জানতে পারা যায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

পর্যায়-২

একক ৭ □ বাংলাসাহিত্য ঃ চৈতন্যযুগ

গঠন

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ বাংলাসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

৭.৩ মঙ্গলকাব্য

৭.৩.১ মনসামঙ্গল

৭.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল

৭.৩.৩ ধর্মমঙ্গল

৭.৩.৪ শিষায়ন

৭.৩.৫ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

৭.৪ বৈষ্ণবপদাবলি

৭.৫ চরিতকাব্য

৭.৫.১ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

৭.৫.২ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

৭.৫.৩ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

৭.৫.৪ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

৭.৫.৫ চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

৭.৫.৬ গোবিন্দদাসের কড়চা

৭.৬ অনুবাদকাব্য

৭.৬.১ অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ

৭.৬.২ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

৭.৬.৩ কাশীরাম দাসের মহাভারত

৭.৬.৪ রঘুনাথ আচার্যের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গনী

৭.৬.৫ মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

৭.৬.৬ দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল

৭.১ প্রস্তাবনা : মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ও যুগলক্ষণ (১৬শ শতক-মধ্য ১৭শ শতক)

মধ্যযুগের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংসকৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতির প্রসঙ্গ। সুলতানি আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। সুলতানদের সিংহাসন সবসময় অনিশ্চিত ছিল বলে দেশের অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অধিকৃত অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। সেনানায়কদের জায়গীরের নির্দেশ দিয়ে ভূ-স্বামীদের নিজেদের জায়গায় রাখাটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এর কারণ হল—নদী, খাল, বিল আর জঙ্গলে ঘেরা বাংলার দুর্গম ভৌগোলিক পরিবেশ। সেকালের রায়তদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে জানা যায় না। কিন্তু সুলতান তথা নবাবের অনুগৃহীত একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে গড়ে উঠেছিল। এঁদের নাম ছিল চৌধুরী বা ক্রোড়ী। সেকালে বাংলাদেশে সর্বত্রই প্রচুর কার্পাসের চাষ হত। নদীমাতৃক বাংলায় কার্পাস উৎপাদনের উপযুক্ত জমি ছিল। এছাড়া ধান আর আখ প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হত। সুলতানি আমলে বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা অত্যন্ত বিরল ছিল।

বাংলাদেশে ১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেনশাহ ও তাঁর বংশধরেরা রাজত্ব করে। তারপর বাংলা শাসিত হয় শেরশাহ ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা। আমাদের আলচ্য সময় শেরশাহের রাজত্ব থেকে শুরু হলেও পূর্ববর্তী কিছু প্রসঙ্গ এখানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আলোচনা করা হল—

শেরশাহের আগে বাংলার মুদ্রানীতিতে কিছু ত্রুটি ছিল। এর কারণ ধাতু দুষ্প্রাপ্যতা, মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা প্রচলন ও সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর অনুপাতের অনির্দিষ্টতা। শেরশাহ সম্রাট হয়ে কৃষি ও মুদ্রানীতি দুইয়েরই সংস্কার করলেন। স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা ছাড়াও তিনি নতুন এক ধরনের তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। সেকালে বাংলাদেশে বর্হিবাণিজ্যের প্রসঙ্গও পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে। ইটালীয় বার্থেমা ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে আসেন পর্তুগীজ পর্যটক বার্বোসা। এঁরা বাঙ্গেলা নামে বর্ধিষ্ণু বন্দরের কথা বলেছেন। আরবী, পারসিক, আবিসীনীয় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বণিকেরা এখানে এসে সমবেত হতেন। বাংলাদেশের সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বাইরে পাঠানো হত। শেরশাহ বাণিজ্যের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকটা অবাধ হয়েছিল। শেরশাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজ বণিকেরা অত্যন্ত বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতসমুদ্রে মুসলমান বাণিজ্যকে নষ্ট করার জন্য তাঁরা প্রায় হিংসাত্মক নীতিই নিয়েছিল। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে উঠেছিল পর্তুগীজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

এই সময় তাঁর বাংলার বয়নশিল্প, সুগন্ধি আতর তৈরি, জাহাজ তৈরি ও নুন তৈরি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

আকবরের শাসনকাল থেকে বাংলাদেশ একটি পৃথক রাজনৈতি সুস্থির পরিবেশের মধ্যে থাকল। এই সময় প্রত্যেক প্রদেশকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তার মধ্যে এক একজন ফৌজদারকে শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হল। এক-একজন কাজীকে বিচারের কাজে নিযুক্ত করা হল ও বড় শহরে এক-একজন কতুয়ালকে পুলিশের কাজে রাখা হল। সারাদেশে চাষবাস, কেনাবেচা, কারিগরদের শিল্পদ্রব্য তৈরি ও পড়াশোনার কাজ নির্বিঘ্নে চলল।

মধ্যযুগের এই সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোতে আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রমবিকাশও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ বণিকেরা এদেশে এই সময়ে ক্রমাগত তাঁদের বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। আকবর টোডরমলদের সাহায্যে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এই রাজস্ব দেওয়ার পরও বাংলার সুবাদাররা প্রজাদের শোষণ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতেন। শায়েস্তা খাঁ আঠারো বছর সুবেদারি করে ন-কোটি টাকা সঞ্চয়

করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসা ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ের বাংলার ফল ও ফসলের প্রাচুর্য্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

এই বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই গড়ে উঠেছে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। সমাজে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে কারুশিল্প, দারুশিল্প ও চারুশিল্পের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীগোষ্ঠী ছিল। কামার, কুমার, ছুতা, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, মোল্লা, পুরুত সবারই সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালিসমাজ।

মধ্যযুগে বাংলায় দাসশ্রেণীর ও নিম্নবর্ণ বৃত্তিজীবীর শিক্ষার অধিকার ছিল না। প্রথমদিকে হিন্দুদের শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। পরে নবদ্বীপই হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সংস্কৃতি চর্চা আর বিদ্যা অর্জনের কেন্দ্র। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় টোল চতুষ্পাটি ছিল। উচ্চবিত্ত মুসলিম অধ্যুষিত মাদ্রাসা ছিল। সেযুগ চাকরী পাবার জন্য বাংলা, ওড়িয়া, নাগরী ও ফার্সী এই চারটি ভাষা জানতে হত। ব্যতিক্রমী হলেও দু-চারজন মহিলাও মধ্যযুগে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

সেযুগে বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ডাল-মাছ-শাক-তরকারি ও ভাত। চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্য কয়েকটি কাব্যে রান্নার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এছাড়াও চালভাজা, মুড়ি, মোয়া, চিঁড়ে, বাতাসা প্রভৃতি খাবারেরও প্রচলন ছিল। নিরামিষভোজী বৈষ্ণবদের প্রভাবেই বিশেষভাবে নানা ধরনের মিষ্টান্ন মধ্যযুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির খাদ্য তালিকায় ছিল।

সেযুগের বাংলাসাহিত্য থেকেই জানা যায় মেয়েরা নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করত। হিন্দুসমাজে গৌরীদান প্রথা, আবার অন্যদিকে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন বহু নারীর জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

মধ্যযুগে টোলে আর মক্তব মাদ্রাসাতেও সাধারণত শাস্ত্র শিক্ষার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হত। আকবর ধর্মসংস্কারের সঙ্গে শিক্ষাসংস্কারেরও চেষ্টা করেন। এসম্পর্কে বলা হয়েছে—"His Majesty orders that every school-boy should first learn to write the letter of Alphabet and also to trace there several forms."

হিন্দুদের শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিখতে হত। সেকালে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়েই গঠিত ছিল সুবাহ বাঙলা। তাই চাকরি পাবার জন্য বাঙলা, উড়িষ্যা, নাগরী (হিন্দুস্থানী) ফরাসী-এ চার ভাষা জানতে হত। ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসুর (১৭১৪ খ্রীঃ) পিতামহী তাঁকে 'বাঙ্গালা, পারসী, উড়্যা, পড়াল্যা নাগরী।' অপর কবি প্রভুরাম (১৭৪২-৩৩ খ্রীঃ) বলেন ঃ

কাছেতে কায়স্থ কত করে লেখাপড়া
বাঙ্গালা সভার শোভে কাগজের গড়া।
বাঙ্গালা পড়ায়ে উড়্যা নাগরী সুন্দর
লেখায় উত্তম সব যার যে দপ্তর।

এই সময়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, তমলুক, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে বাণিজ্যতরি এসে ভিড় জমাত। ধানই ছিল প্রধান সম্পদ। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে তুলার চাষ হত, কাঠও পাওয়া যেত। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গুড়, চিনি, বস্ত্র ও লবণ। নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ করা হত।

সেযুগে সামন্তসমাজে গোমস্তা বেনেরাই ছিল মধ্যবিত্ত ও মধ্যশ্রেণীর মানুষ। আর বাকি সবাই ছিল প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর ও দাসশ্রেণীর লোক। এছাড়া কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, হাড়ি, ডোম, বাগদি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের সংখ্যাই সমাজে বেশি ছিল। এই বিভাজন ছিল বৃত্তিভিত্তিক। চৈতন্যপরবর্তী যুগে দেশজ মুসলিমসমাজের মধ্যে পেশাভিত্তিক প্রায়ই ছল, যেমন—জোলা, বেদে, বারুই, হাজাম, নিকেরি, কুমার প্রভৃতি।

মধ্যযুগের বাংলায় গ্রাম্যসমাজই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কারণ নগরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। গ্রামে গোষ্ঠীপতির নির্দেশে ও পরামর্শে এক-এক গোষ্ঠীর লোক পরিচালিত হত। গেড়াপাড়ায় বা একটি গ্রামেও একজন সর্দ্দার বা মাতব্বর থাকতেন। এঁরাই গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন। বিচার করে শাস্তিও এঁরাই দিতেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানও এঁদেরই কর্তৃত্বে আর নেতৃত্বে সম্পাদিত হত। বিদ্রোহী কিংবা অপরাধীকে নাপিত, ধোপা, আর মোল্লা, পরুত বন্ধ করে দিয়ে সমাজপতিত অর্থাৎ একঘরে করে রাখা হত। এটি ছিল মধ্যযুগের গ্রামসমাজে চূড়ান্ত অপমানজনক ও অসুবিধাজনক শাস্তি। পতিত বা একঘরে লোকের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করত না। তার পক্ষে কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাও হত অসম্ভব। নাপিত, ধোপা, বদ্যকার, কামার, স্বর্ণকার প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিমসমাজের যোগসূত্র স্বরূপ ছিল। এদের মধ্যে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু বিচিত্র। সে অনেক রোগের চিকিৎসক ও নানা খবরের ভাণ্ডারী ছিল। নাপিত, ধোপা এবং মোল্লা পুরুতকে বার্ষিক ধান্য দানের বিনিময়ে নিযুক্ত রাখা হত।

কিন্তু একথাও ঠিক যে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ বাস্তব সমাজচিত্র পাওয়া যায় না। অনেক সময়েই আদর্শায়িত বা অতিকথন দুষ্ট কল্পনাপুষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

৭.২ বাংলাসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

এসময়ের বাংলাসাহিত্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলি, চরিতকাব্য, অনুবাদকাব্য ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি। প্রথমে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

৭.৩ মঙ্গল কাব্য

৭.৩.১ মনসামঙ্গল

দেবী মনসার পূজার প্রচার মনসামঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য। এধরনের কাব্যগুলিতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য কীর্তিত।

লৌকিক দেবী মনসা অভিজাত সমাজে স্বীয় পূজা প্রচারের অভিলাষে বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের দ্বারস্থ হন। কিন্তু চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি মনসাকে দেবীর মর্যাদা দিতে নারাজ। ফলে চাঁদের সঙ্গে মনসার বিরোধ বাঁধে। মনসা নানাভাবে চাঁদের ক্ষতি করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত চাঁদ কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে না পেরে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাঁ হাতে মনসাকে পূজা দেন। উচ্চতর সমাজে মনসা স্বীকৃতি পান।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সুপরিচিত এই বিষয়বস্তু নিয়ে কবিরা মনসামঙ্গল কাব্য লিখে আসছেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যাঁরা মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেতকাদাস, মেঘানন্দ ও দ্বিজ বংশীদাস। তাঁদের কবিপ্রতিভার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এখন নির্দেশ করা যেতে পারে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ চৈতন্যপরবর্তী যুগের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে এঁর গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রচিত মনসামঙ্গলের প্রথম কবিও তিনি। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন "তাঁর বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" মনসামঙ্গল কাব্যকারদের মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষেমানন্দের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গেও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুঁথি প্রচলিত ছিল। তাঁর কাব্যে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকৃতিও লক্ষ করা যায়। ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তিনি তাঁর কাব্যে দেবীর কাছে প্রার্থনায় সমস্ত কায়স্থ জাতির মঙ্গল কামনা করেছেন—"কেতকার বাণী। রক্ষ ঠাকুরানী।

কায়স্থ যতেক আছে।" কবির বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে দেবী প্রথমে মুচিনীর বেশে ও পরে ভুজঙ্গভূষিতা ব্রাহ্মণীর বেশে দেখা দিয়ে কেতকাদাসকে কাব্যরচনার নির্দেশ দিয়েছেন। কবির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম। এরা হলেন বারা খাঁ ও ভারমল্ল রায়। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে বারা খাঁ মুকুন্দের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা জমি দানপত্র করেছিলেন। আর ভারমল্ল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং কেতকাদাস সপ্তদশ শতকের শেষপাদের কবি।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যকাহিনী বিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি তাঁর প্রতিভার তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর কাব্যের দেবখণ্ডে কবি খিলহরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। নৌযাত্রা পথের বর্ণনায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও তার চারপাশের অঞ্চলের গ্রাম ও নদনদীর নাম যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবাংলার গ্রামীণজীবনের ছবিও তাঁর কাব্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে জুঝাটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাঙ্গপুর, কেজ্যা, মণ্ডলগ্রাম, দেপুর, জেয়াদা, আদমপুর (বা আমদপুর), হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, পিড়তলী (বা পিরতলী), গহরপুর, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় সরলতা ও সহৃদয়তা বিশেষ মাধুর্যের সঞ্চার করেছে। যেমন ছদ্মবেশে পিতৃগৃহে বেহুলা পৌঁছলে যোগীর শিঙ্গাধ্বনি শুনে ভিক্ষা দিতে এসে যোগিনীর ছদ্মবেশে বেহুলাকে দেখে তার মায়ের মনে পড়ল হারানো কন্যার কথা—

"তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ
মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান।
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে।"

কেতকদাসের কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের বিলাপের বর্ণনায় তিনি প্রায় অবিকল মুকন্দের অনুকরণ করেছেন। তাঁর কাব্যে বেহুলার স্নিগ্ধ করুণ কোমলতা ও পাতিব্রত্যের দৃঢ়তা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ চরিত্রকে প্রথমে একটি সুদৃঢ় পৌরুষ হিসেবে গড়ে তুললেও কবি শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর চাঁদ শেষপর্যন্ত মনসার কাছে পরিপূর্ণভাবে নতি স্বীকার করেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রেরণাই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করেছে বলা যায়।

দ্বিজ বংশীদাস ঃ দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের বিশিষ্ট মহিলা কবি রামায়ণ রচয়িতা চন্দ্রাবতী, দ্বিজ বংশীদাসেরই কন্যা। বংশীদাস তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন—

"জলধীর মাঝেতে ভুবন মাঝে দ্বারা।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।"

এই শ্লোক থেকে ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীদাস এঁর কাব্যের অন্যপ্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এ সর্বপ্রথম এই কবির কিছুটা পরিচয় দেন। ময়মনসিংহ গীতিকার গ্রাহক চন্দ্রকুমার দে বংশীদাসের বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করেন।

বংশীদাসের পদ্মপুরাণের আয়তন বৃহৎ। তাঁর কাব্যের দেবখণ্ডে সৃষ্টি বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, সতীর তনুত্যাগ, মহাদেবের তপস্যা, মদনভস্ম, শিব ও উমার বিবাহ ইত্যাদি কুমারসম্ভব কাব্যের অনুরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তবে দেবখণ্ডের

পরবর্তী আখ্যানে তিনি বিশুদ্ধ পৌরাণিক প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছেন। এই অংশে পদ্মাবতী, নেত্রবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা লাভ, শিবের পদ্মাসহ গৃহে গমন, পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

মানবখণ্ডে কাজীর সঙ্গে মনসার বিরোধের পর ধন্বন্তরী বধের পালায় পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞেরও বর্ণনা আছে। পরবর্তী চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে কবি তাঁর কাব্যে চাঁদকে চণ্ডীর উপাসক রূপে দেখিয়েছেন।

৭.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমণ্ডল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সূত্রপাত। আলোচ্য কাল পর্বে এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন দ্বিজ মাধব, মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ রামদেব।

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল ঃ দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'সারদাচরিত'। এই কাব্যটি শুরু হয়েছে মঙ্গল দৈত্য বধ কাহিনীর পরে গণেশ বন্দনা দিয়ে। এতে মনে হয় যে মঙ্গল দৈত্য বধ কবির কাব্যে পরে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিজমাধব পূর্ববঙ্গের খুবই জনপ্রিয় কবি ছিলেন। ভোলা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর কাব্য পাওয়া গেছে। দেবী চণ্ডী মঙ্গল দৈত্যকে বধ করেছিলেন, এই প্রসঙ্গ মুকুন্দে নেই, কোন পরিচিত পুরাণে বা তন্ত্রেও এই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। সম্ভবত দ্বিজমাধব কালিকাপুরাণের নরকাসুরকে মঙ্গল দৈত্য বলেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে সৃষ্টি পত্তন বর্ণনা ধর্ম ঠাকুরের পুরাণ অনুযায়ী—

না আছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঘনষি
না আছিল সুমেরু মন্দার
না আছিল সুরাসুর রাক্ষস কিন্নর নর
কেবল আছিল শূন্যাকার।....

শিবের বরে ক্ষমতাবান মঙ্গলদৈত্যের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য দেবীর নাম হোলো মঙ্গলচণ্ডী। এরপর মর্ত্যে পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সখী পদ্মাবতীর উপদেশে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কলিঙ্গদেশে দেউল নির্মাণ করিয়ে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। এরপরই দ্বিজমাধবের কাব্যে কালকেতু প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে কালকেতুর প্রজাস্থাপন বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর কাব্যে পুরাণের সঙ্গে তন্ত্রের প্রসঙ্গও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। দ্বিজমাধব মুকুন্দের মতো চৈতন্য বন্দনা করেননি। তিনি তাঁর কাব্যকে ১৪টি পালায় বিভক্ত করেছেন।

কোনো কোনো সময় দ্বিজমাধব মুকুন্দের তুলনায় তাঁর কাব্যে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুর পরিণাম বর্ণনায় মুকুন্দর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাঁকে কাশীবাসী করিয়েছে। কিন্তু দ্বিজমাধব এখানে স্বাভাবিক সঙ্গত একটি পরিণামের কথা বলেছেন। তাঁর ধর্মকেতু শিকার করতে গিয়ে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। বার্ধক্যজীর্ণ ধর্মকেতুর খেদক্ত দ্বিজমাধবের কাব্যে তাই অপ্রধান চরিত্রটিকে একটি আলাদা মাত্রা দেয়—'দুখিত কলি হরি/তিনজন পুষিতে নারি/কেমনে পুষিব চারিজন।।/তুহ্মি জান ভালে ভাল/দুঃখে গেল সর্বকাল/আর দুঃখ না সয় শরীরে।

মুকুন্দের কাব্যে দেবী চণ্ডী মঙ্গলদায়িনী। অনুগৃহীত কালকেতুকে নিজেরই দেওয়া ঐশ্বর্য নিজেই তিনি বয়ে নিয়ে যান। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর কুটিরে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী রীতিমতো কলহকুশলা মধ্যযুগীয় নারী। ফুল্লরা দেবীকে কোনোমতেই বোঝাতে না পেরে তীব্র ক্রোধে বলে—দেবীর মাথার সে মাংরে পসরা তুলে দেবে, আর যত অলংকার তাঁর গায়ে আছে সমস্ত বিক্রি করে খাবার জোগাড় করবে। দেবীও সমান তেজে উত্তর দেন—"কি বোলিলা বোল আরবার।/কেশেতে ধরিয়া লাঘব করিমু তোমার।'

দ্বিজমাধবের ভাঁড়ুদত্ত মুকুন্দের ভাঁড়ুদত্তের মতো অভিজাত কুলীন নয়, ইদিলপুর থেকে আসা ষোলশ প্রজার একজন। এরা লোক ঠকিয়ে খায়, আর এদের 'জাতির উদ্দেশ' না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কুলীন বলে।

ভাঁড়ুর পরিচয় দিতে গিয়ে দ্বিজমাধব মধ্যযুগের সামাজিক গতিশীলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। শাস্ত্র থেকে সমাজে জাতিবর্ণ প্রথাকে যতটা স্থাণু বলে মনে হয়, মধ্যযুগীয় সমাজ আসলে তেমনটি ছিল না। গোষ্ঠীগত বৃত্তি পরিবর্তেনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি কাঠামোয় স্থান পরিবর্তন ঘটতো। নিম্নজাতির মানুষ উচ্চজাতির গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে পারতেন। এইভাবেই মৌলিকরা কুলীন গোষ্ঠীতে প্রবেশ করেন। এছাড়া ভূমিহীন কৃষকেরা অনাবাদী জমি চাষ করে জমিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছে। কিন্তু দ্বিজমাধবের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় এরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছ থেকে খুব একটা মর্যাদা পেতো না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্টতম কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। দেবীচণ্ডীর মহিমা নিয়ে রচিত তাঁর এই কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মঙ্গলচণ্ডীও অভয়া দুর্গা।

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে মুকুন্দই সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁক কাব্যে দেশ ও সমাজের চিত্র বিশদভাবেই পাওয়া যায়। আত্মপরিচয়ে কবি আসরের শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে স্বয়ং চণ্ডীর আদেশে তিনি এই কাব্য রচনা করেছেন। কবি ছিলেন সেলিমাবাজ (সেলিমাবাদ) গোপীনন্দীর তালুক দামিন্যা গ্রামের বাসিন্দা। কিন্তু প্রজার পাপের ফলে অধর্মী রাজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর গ্রামে। কর্তা হলো মামুদ সরিফ। খাজনার চাপে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালানোর উপক্রম করলো। মুকুন্দও দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রাম ছেড়ে তিনি প্রথমে পৌঁছোলেন ভালিঞা গ্রামে। সেখানে রূপ রায় তাঁর সমস্ত সম্বল কেড়ে নিল। মুকুন্দ আশ্রয় পেলেন যদু কুণ্ডু তেলের বাড়িতে। তারপর আবার পথযাত্রা। গোচড়িয়া গ্রামে পৌঁছোনোর সময় মুকুন্দ নিঃসম্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তি। সেখানে পুকুরপাড়ে কবি গৃহদেবতার পূজা করেন 'শালুক-নাড়া'র নৈবেদ্য দিয়ে। ক্ষুধার্ত শিশুপুত্রকেও সেই 'শালুক-নাড়া' খেতে দেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত শিশু ভাত খেতে চায়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল হয়ে ওঠে তার অন্য সমস্ত আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে এক ভাগ্যবিপর্যস্ত পিতার আর্ত অসহায়তার দলিল। সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পর সচ্ছল সামন্তের নিরাপত আশ্রয়ে লেখা তাঁর কাব্যে কবি উপহার দেন দেবমহিমার আড়ালে মানবজীবনের মরমী ইতিবৃত্ত। তার আগে ঐ পুকুর পাড়েই দেবী চণ্ডী স্বপ্নে মায়ের মূর্তি ধরে শিয়রে বসেন—

আশ্রম পুখুরি আনা নৈবেদ্য শালুক-নাড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মা কৈলা পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব

এরপর কবি শিলাই পেরিয়ে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আরড়া গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানে কবি রাজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পরে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কোনো কোনো চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দের কাব্যের রচনা কালজ্ঞাপক তথ্য আছে—

শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্কগণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

রস রস বেদ শশাঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দে (১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে)-র পর কবি মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দের কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) দেবখণ্ড, (২) আখেটিকখণ্ড, (৩) বণিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয় দুহিতা উমার পরিচিত পৌরাণিক গল্প।

দ্বিতীয় আখেটিক খণ্ডে দেখা যায়. দেবীচণ্ডী নিজের পূজা প্রচারের জন্য শিবভক্ত নীলাম্ভবরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পাঠালেন। নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু হয়ে জন্ম নিল। পরে কালকেতুর সঙ্গে বিবাহ হলো ফুল্লরার। কালকেতুর পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সে বারাণসী চলে গেল। একসময় দেবীচণ্ডীর কৃপায় কালকেতু রাজা হল। কালকেতু উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে দেবীচণ্ডী নিজের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে। অন্যদিকে বণিক খণ্ডেও স্বর্গভ্রম নর্তকী রত্নামালা ও তার পুত্র শ্রীমন্ত দেবীর পূজা প্রচারের মাধ্যম হলো। এই অংশে দেবী ব্রাহ্মণ্যসমাজ সংস্থায় অধিকার লাভ করেছেন। আর সেখানে প্রচলিত সমৃদ্ধ দেবতা শিবকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর গুজরাট নগরপত্তন উপলক্ষে কবি একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নগরে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ছবি উজ্জ্বল। গুজরাট নগরে মুসলমানরাও হিন্দুদের অন্যান্য বর্ণের মতো স্থান পেয়েছেন একটি স্বতন্ত্র পল্লীতে। নগরের পশ্চিমদিকে এই পাড়ার নাম হলো হাসনহাটি। কালকেতুর মুসলমান প্রজারা শান্ত ও ধর্মনিষ্ঠ। তারা "ফজর সময়ে উঠি/বিছায়্যা লোহিত পাটি/পাঁচ বেড়ি করয়ে নমাজ।/ছিলিমিলি মালা ধরে/জপে পীর পেগাম্বরে/পীরের মোকামে দেই সাঁজ।" এছাড়া এই প্রসঙ্গে সমাজে কোন্ কোন্ জাতি কি কি কর্মে নিযুক্ত থাকতো—তারও সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে মুদুন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় যেমন তাঁর কাব্যের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—তেমনি লোকব্যবহার, ছেলে ভুলানো, শিশুদের খেলা, মেয়েদের আচার-অনুষ্ঠান, গেরস্থালি, রান্নাবান্না ইত্যাদি সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও তিনি আশ্চর্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য মুকুন্দের রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। নারীর সামাজিক অবস্থানকেও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তিনি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন। সপত্নী-সমস্যা মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তাঁর কাব্যে সপত্নী ক্রান্ত চারটি পৃথক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এক, ফুল্লরার সপত্নী আশঙ্কা। দুই, গঙ্গা ও চণ্ডীর কলহ। তিন, লহনা ও ঘুল্লনার সপত্নী দ্বন্দ্ব. চার, শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহে ঘুল্লনার প্রতিবাদ। এই চারটি প্রসঙ্গেই কবি ফুল্লরা, ঘুল্লনা, দুর্বলা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। এছাড়াও তাঁর কাব্যে অপ্রধান চরিত্রগুলি, যেমন—ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল, মুরারি শীলের স্ত্রী, বুলান মণ্ডল, কালকেতুর অত্যাচারে বিপন্ন পশুকুল সবাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাঙালির এমন পরিপূর্ণ ছবি বাংলাসাহিত্যের আর কোথাও মেলে না। আরো উল্লেখ করার বিষয় তাঁর ধর্মসম্পর্কে উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী। ব্রাহ্মণ সন্তানত হয়েও তিনি নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন। মুকুন্দ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব ভাব ও বিশেষ রসের সঞ্চার করেছে। এই রস হলো স্নিগ্ধ কারুণ্য, আর ভালোবাসা। অনেক দুর্দশা ভোগ করে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে নিজের আবল্য সেবিত গৃহদেবতাকে ছেড়ে তিনি চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ছেড়ে আসা দেশ, আরগ গৃহদেবতার জন্য এক করুণ ভক্তি স্নিগ্ধ ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে—

দামুন্যা নগরে প্রভু রামচক্রাদিত্য
শিশুকাল হৈতে যার সেবা কৈল নিত্য।
সে প্রভু-চরণ মনে ভাবি অনুক্ষণ
চণ্ডিকামঙ্গল রচে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

আবার অন্য দিকে আড়রা নগরে তাঁর বাসস্থান সম্পর্কেও কবির যথেষ্ট, প্রীতি, মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে মুকুন্দ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি।

দ্বিজ রামদেবের 'সারদাচরিত' ঃ চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই কাব্য ধারার একটি কাব্য আবিষ্কার ও সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছিলেন ড. আশুতোষ দাস। কাব্যটির নাম 'সারদাচরিত', রচয়িতা দ্বিজ রামদেব। ত্রিপুরায় দ্বিজ রামদেবের ভণিতা যুক্ত দুটো পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কাব্যটির ভাষায় চট্টগ্রাম ঞ্চলের প্রচলিত শব্দ ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগ লক্ষা করা যায়। দ্বিজমাধবের কাব্যের সঙ্গে রামদেবের কাব্যের সাদৃশ্য আছে। বিষয় বিন্যাস উপাখ্যান অংশের পালাবিভাগ, শ্লোকে শ্লোকে শব্দ ও রচনা ভঙ্গিগত অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"মঙ্গলকাব্য রচনায় পুচ্ছগ্রাহিতা কিংবা পরানুবর্তনের যে নিদর্শনই পাওয়া যাক না কেন, এই প্রকার অনুকরণের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।"

দ্বিজ রামদেবের কাব্যের এক মুখ্য সম্পদ তাঁর বৈষ্ণব আবেগ। কাব্যটি প্রকাশের আগে পুঁথির অনুলিপি পড়ে ক্ষুদিরাম দাস লিখেছিলেন "রামদেবের গ্রন্থে শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত।" অধ্যাপক দাস তখন অন্যরকম অনুমান করলেও আসলে রামদেব দ্বিজ মাধবের দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ সূচনার পূর্বে একই ভাব প্রকাশক 'বিষ্ণুপদ' রচনার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। অনেক স্থানেই মূল কাব্য প্রসঙ্গের বদলে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কথা অধিকতর রস নিবিড়তা লাভ করেছে। কবির রচনায় মৌলিকতা খুবই কম, বেশিরভাগই মাধবের কাব্যের অন্ধ অনুকরণ। যেটুকু মৌলিকতা আছে, তাতেও রামদেব মৌলিক পরিকল্পনা শক্তির কোনো উৎকর্ষ গৌরব দাবি করতে পারেন না। এই তথ্যের এক নিশ্চিত নিদর্শন সুশীল উপাখ্যান—মুকুন্দ যাকে বলেছেন মুরারি শীল, দ্বিজ মাধবের কাব্যে সে বণিক সোমদত্ত।

গ্রন্থশেষে রচনার পুঞ্জিকা থেকে জানা যায় "ইন্দু বাণ রিসি বাণ বেদ মন জিত" অব্দে দ্বিজরামদেবের কাব্য রচিত হয়েছিল। এই পর্বে কোথাও লিপি প্রমাদ আছে। "ইন্দু বাণ রিসি বাণ" অংশে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেলে ১৫৭৫ পাওয়া যায়। একে শকাব্দ বলে ধরে নিলে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কবির কাব্য রচনার সমাপ্তিকাল নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কালনির্দেশক শ্লোকগুলিতে ডান দিক থেকে বাম দিকে গণনা করাই প্রচলিত রীতি। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত বলে কোনো অর্থযুক্ত অব্দের র্দেশ পাওয়া যায় না।

ভণিতায় কাব্যটিকে 'সারদাচরিত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর পিতার নাম কবীন্দ্র অথবা বিধু ছিল। চট্টগ্রাম অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে কবির নিবাস ছিল বলে মনে হয়।

৭.৩.৩ ধর্মমঙ্গল কাব্য

রামাই পণ্ডিত্যের 'শূন্যপুরাণ' ঃ ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে রামাই পণ্ডিত সংকলিত 'শূন্য-পুরাণ' নামে একটি বই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মপূজা উপলক্ষে যে গাজন হয়ে থাকে, তাতেও তার বিবিধ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই গাজন উপলক্ষে শিবের চাষবিষয়ক যে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি ঐ 'শূন্য-পুরাণে' সংকলিত হয়েছে। মনে হয়, এটাও প্রাচীন শিব-গীতিকার একটি অংশ—যখন আছেন গোসাঞি হয়া দিগম্বর/ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বলেন ঈশ্বর ॥/রজনী পরভাতে ভিক্ষ্‌খার লাগি যাই।/কুথাএ পাই কুথা এ না পাই।।/হর্তুকী বত্রড়া তাহে করি দিন পাত/কত হরস গোসাঞি ভিক্ষ্‌খাএ ভাত।।/আহ্মার বচনে গোসাঞি পুক্ষি চষ চাষ।/কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।/পুখরি কাদাএ লইস্ব ভূমখানি/আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি।।/আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথায় হাত দিয়া।/পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ।।/ঘরে অন্ন থাকিলেক পারভু

সুখে অন্ন খাব।/অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।/ কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।/কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়।।/তিলষ সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলিতব পাত্র।/কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাত্র।।/মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ।/তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামর্ত্তর আশ।।/সকল চাষ চস পরভু আর রুই ও কলা/সকল দব্ব পাই যেন ধর্মপূজার বেলা।।/এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল/মনপবস দুই হেলএ সিজন করিল।।/সুনার যে লাঙল কৈল রূপার যে ফাল।/আগে পিছু লাহলেতে এ তিন গোজাল।।/আগে জোতি পাশজোতি আভদর বড় চিন্তা।/দুদিকে দুসলিদিআ কুআলে কৈল বিন্ধা।।/সকলসাজ হইল পরভুর আর সাজ চাই।/গটাদশ কুআ দিয়া সাজাইল মই।।/তাকর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।/চাষ চষিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি।।/সাঠ মাসে গোঁসাই পিথিবি মইলিল।/যতগুলি ভূম পরভূ সকলি চষিল।।

এর সঙ্গে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত এই পদটির তুলনা করা যেতে পারে। এখান থেকে বুঝতে পারা যাবে শিব সম্পর্কিত এই বিশ্বাস মিথিলা থেকে উত্তরবঙ্গ পথে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচার লাভ করে ছিল। কিম্বা প্রাচীন বাংলাদেশ থেকেও তার মিথিলায় যাওয়া অসম্ভব নয়—

বেরি বেরি অরে শিব মোঞে তোকেঁ বোলঞে
কিরিষি করিয় মন লাই

খেলারামের ধর্মমঙ্গল ঃ খেলারাম ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি। খেলারামের কাব্য কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তা নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভভন।।
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।।

'ভুবন' অর্থে ১৪, আর বায়ু ঊনপঞ্চাশ সুতরাং ১৪৪৯ শক অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে খেলারাম তাঁর কাব্যরচনা শুরু করেন। কাব্যের একস্থানে তিনি লিখেছেন—

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অহী মঙ্গালময় দিব আত্মপরিচয়।।

কিন্তু তাঁর কাব্যের শেষভাগ অর্থাৎ অহীমঙ্গলা পাওয়া যায়নি।

রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল ঃ রূপরাম ধর্মমঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। মুকুন্দ রামের জন্মস্থানের কিছু দূরে বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রূপরামের আরো তিন ভাই ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর অবহেলা দেখে ভ্রাতা রত্নেশ্বর তিরস্কার করায় তিনি রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে ভর্তি হন। একদিন গুরুর সঙ্গে তর্ক হয়। তিনি পথে বেরিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছিলেন সেইসময় ধর্মঠাকুর পথের মধ্যে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। রূপরাম তাঁর কাব্যের আত্মবিবরণী ও গ্রন্থোৎপত্তি অংশে এসম্পর্কে লিখেছেন—

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল।।
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠাকুর।

আমি ধর্ম ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বারদিনের গীত গাও শুন রূপরাম।।
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি।।

এরপর গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে নানা জায়গায় ঘোরার পর কবি অবশেষে গোপ ভূমের রাজা গণেশের কাছে এসে উপস্থিত হন। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়ে গানের দল বেঁধে দেন। সেই থেকে রূপরাম ধর্মের আসরে গান গাইতে শুরু করেন।

রূপরাম নিজের কাব্যের সময় সম্পর্কে বলেছেন—

তিন বাণ চারি যুগে বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় হৈলে কত শাক হয়।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ।।

অর্থাৎ রূপারামের গ্রন্থরচনার কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ।

ভট্টাচার্যের টোলে লেখাপড়া শেষ না হলেও তিনি যে পণ্ডিত তাঁর রচনা থেকেই তা বোঝা যায়। জামতী পালায় কুলটা নয়ানীর রূপসজ্জার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কপালে সিন্দূর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকুলে বিজুরীর লতা।।

তাঁর বর্ণনা সরল, রচনা ও শ্রুতিমধুর। অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতিতে কাব্যের কাহিনী এগিয়ে গেছে। জীবনবোধ, রসানুভূতি ও কবিদৃষ্টি রূপরামের কাব্যকে উজ্জ্বলতা দান করেছে। আত্মবিবরণীর রচনার অংশে কবি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সে সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে কবির সুগভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপরামের কাব্যে অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের মতো পৌরাণিক প্রসঙ্গ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭.৩.৪ শিবায়ন

রামকৃষ্ণ রায় ঃ খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায় শিব বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক আর লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করে তাঁর সুবৃহৎ শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। 'শিবায়ন' রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত এই গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত। রামেশ্বরের শিবায়নকে শিব বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (encylopaedia) বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিব প্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাংলাসাহিত্যে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির

একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রামকৃষ্ম তাঁর কাব্যকে সর্বত্র 'শিবায়ন' অথবা 'শিবেরমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশে যে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছে তাও এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

'ভারতী দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুগ্রহ।'

কবি তাঁর কাব্যমধ্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, পিতামহ রায় যশশস্ত্র মহামতি/তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি।।/ পিতামহী বন্দি লাভ নাম নারায়নী।/সরস্বতী বন্দিলাভ তাঁহার সতিনী।।/মাতামহ বন্দিলাভ নাম সূর্য মিত্র।/তেয়জ কুলীন।তিঁতো পবিত্র চরিত্র।।/পিতা কৃষ্ম রায় বন্দা সর্বশাস্ত্রে বীর।/যাহার প্রসাদে এই মনুষ্য শরীর।।/মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবৎ/যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ।।/কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।/গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি।।/নিরাম বন্দিন্য বস্তু রসপুর দেশ।/এতদূরে বাইরে বন্দনা হইল শেষ।।/রামকৃষ্ম দাস গান শিবের মঙ্গল/ভক্তজনে প্রভু তুমি করিবে কুশল।।

রামকৃষ্মের 'নিবাস' রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার অধীন। আমতা থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। কবির বংশধর আজও সেই গ্রামে বসবাস করছেন। কবির পিতামহ যশশচন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান নবাব প্রদত্ত রায় পদবী লাভ করেন, তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই বংশের আভিজাত্যের ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। কবি রামকৃষ্ম তাঁর নিজের পিতাকে 'সর্বশাস্ত্রে বীর' বলে উল্লেখ করেছেন। শিবমঙ্গল কাব্য রচনায় রামকৃষ্ম যে বিস্তৃত শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফল বলে মনে করা যেতে পারে। বিষয় বৈভবের সঙ্গে সুভীগর শাস্ত্র জ্ঞানের যোগাযোগ সর্বত্র সুলভ নয়—পিতাপুত্র উভয়েই এই দুর্লভ গণের অধিকারী ছিলেন।

বিনু সমরে হর ভিখিত্র পত্র মাগিয়
গুণ গৌরব দূর নাই।।
নিরধন হয় বোলি সবে উপহাস এ
নাহি আদর অনুকম্পা।
তোঁহে শিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফল চাম্পা।
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিশুল ভাঁগয় কারু ফারে।
বসহা ধুরন্ধার ছর লএ জোতিঅ
পাত্রট স্যুর সরিধারে।।
ভগই বিদ্যাপতি সুনহ মহেশর
ই জানি কইলি তুতন সেবা।
এতএ জেবরু সে বরু হোঅও
ওতএ সরণ দেবো।।[১]

অর্থাৎ 'হে শিব, বার বার তোমাকে আমি বলি, কৃষি কাজ কর। হে হর, তুমি নির্লসু না হয়ে ভিক্ষা চাও, তাতে তোমার গুণ গৌরব দূর হয়। নির্ধন বলে সকলে উপহাস করে, সমাদর কিংবা অনুকম্পা প্রকাশ করে না; হে শিব, তুমি আকন্দ ও ধুতুরা ফুল পেলে, হরি চাঁপা ফুল তোল। হে হর, খটাঙ্গ কেটে লাঙ্গল বানাও, ত্রিশূল ভেঙে ফাল কর। হে হর, ভালো দেখে (ধুরন্ধর) বৃষ নিয়ে জুতে দাও। তোমার জটায় যে গঙ্গার ধারা আছে তা দিয়ে (ক্ষেতের) পাট কর। বিদ্যাপতির বলে, শোন মহেশ্বর, এই জেনে তোমার সেবা করলাম। ইহলোকে যা হবার তা হোক, পরলোকে শরণ দিও।

৭.৩.৫ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর নামেও পরিচিত। এতে কাঞ্চীর রাজকুমার কালী উপাসক সুন্দরের সঙ্গে বর্ধমান রাজকন্যা বিদ্যার প্রেম ও বিবাহের বর্ণনা আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতার মতো এই কাব্যে দেবী কালিকার প্রাধান্য নেই। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমই এর মূল বিষয়।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রেম নিয়ে সংস্কৃতেও অনেক কাব্য, উদ্ভট কবিতা আর শৃঙ্গার রসের শ্লোক রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কাশ্মীরের কবি বিল্‌হনের 'চৌরপঞ্চাশিশ' নামে পঞ্চশী শ্লোকে গ্রথিত সুন্দরের বিদ্যারূপবন্দনা ও তীব্র প্রেম তৃষ্ণার কাব্য রূপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন দ্বিজ শ্রীধর ও সা বিরিদ খাঁ।

দ্বিজ শ্রীধর

গবেষকদের মতে কবি দ্বিজ শ্রীধর ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ এঁর কালিকামঙ্গলের কয়েকখানি মাত্র পৃষ্ঠা আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তাঁর কাব্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে—তাতে কালিকার উল্লেখ নেই। কবি কাব্যের মধ্যে হুসেন শাহের পুত্র শসরৎশাহ্ এবং তাঁর পুত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের নাম করেছেন। ফিরুজ শাহের নির্দেশেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন দ্বিজ শ্রীধর। কাজটি ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কাব্যটি বোধহয় পুরোপুরি রোমান্টিক ধরনে রচিত হয়েছিল, এতে কালিকার বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ না থাকাই সম্ভব, কারণ, পাঠান সুলতানকে প্রীতির জন্য এই কাব্য রচিত হয়েছিল, সুতরাং তাতে বোধ হয় হিন্দুর দেবী মাহাত্ম্য ছিল না।

সা বিরিদ খাঁ

সা বিরিদ খাঁর তিনটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে—বিদ্যাসুন্দর, রসুল, বিজ., হাজিফা কয়রাপরী।

সা বিরিদ খাঁ-র বিদ্যাসন্দর কাহিনী সংক্ষেপে এরূপ—রত্নাবতীর রাজা গুণসার সুখে প্রজাপালন, পূজাকর্ম, দানধ্যান করেন। রানী কলাবতী ধর্মপ্রাণা ও পতিব্রতা নারী। তাঁদের দুঃখ, কোনো সন্তান সন্ততি নেই। "বিষবৎ ভবসুখ ভাবে নয়পতি/বিষাদে বিকল পুত্রকন্যা হেতু নিতি।" কলাবতী রাজাকে যাগযজ্ঞ ও ধর্মকর্ম করতে বললেন, রাজা তাই করলেন। দেবী পার্বতী কলাবতীকে পুত্র সন্তানের বর দিলেন। কলাবতী গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে পুত্র সন্তান লাভ করলেন। পুত্র সন্তানের নাম রাখা হল সুন্দর, ছেলেবেলা থেকে রাজা সুন্দরের উত্তম লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন, দেবীর আশীর্বাদে সুন্দর বারো বছর সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। নানা দেশের পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে সুন্দরই জয়পত্র লাভ করল। বিদ্যাজয়ী সুন্দরের নাম হল বিদ্যাপতি, এরপর সে "মহেশ অম্বিকা সেবা কর এ সতত।/মহাকাব্যে বিরচিল শ্লোক পঞ্চাশত।।"

কাঞ্চিপুরের রাজা বীর সিংহ ও রানী শীলার একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতী পাঁচ বছর বয়সে তার হাতে খড়ি হল এবং সে অল্পকালেই পাণ্ডিত্য অর্জন করল। রাজা কন্যার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যাচলল "প্রতিজ্ঞা মোহর হৃদে/ যে

জিনত্র শাস্ত্রবাদে/সেই যোগ্য পতিক ভজিমু।" রাজা কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনে দিকে দিকে ভাট পাঠালেন। মাধব ভাট রত্নাবতীতে এল সুন্দরকে বিদ্যার রূপ ও পাণ্ডিত্যের কথা বলল, সুন্দর বিদ্যাকে পাওয়ার জন্য "কক্ষে দুই পুথি/কান্ধে লই ছাতি/ধরিআ বৈদেহি বেশ। বিদ্যা অন্বেষণ/করিলা গমন/নগরে কৈলা পরবেশ।" এখানে এক মালিনীর গৃহে সে আশ্রয় নিল। মালিনী বিদ্যাকে মালা জোগায়। মালিনী প্রথমে তাকে রাজভয়ে আশ্রয় দিতে নারাজ হয়, কিন্তু সুন্দর তাকে অর্থে বশীভূত করে। মালিনীর কাছে সুন্দর বিদ্যার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে। মালিনী বলল, নানা শাস্ত্র, কাব্য ও অলংকার গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যা জ্ঞান অর্জন করেছে। (এরপর পুথি খণ্ডিত)

এখানে বিদ্যা কঞ্চীপুরের রাজকন্যা ভরতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্যাকে বর্ধমানের রাজকুমারী বলা হয়েছে। এরূপে কাশ্মীরী সংস্করণের মহিলাপত্তনের বীর সিংহ তনয়া বিদ্যা বররুচির কাব্যে উজ্জয়িনী, বারিদ খানের কাব্যে কাঞ্চীপুর ইত্যাদিময় ভারতচন্দ্রের জাতে বর্ধমানের রাজ দুহিতা হয়েছে।

কবি স্বয়ং বিদ্যাসন্দর কাব্যকে নাটগীতি বলেছেন। এ শ্রেণীর রচনায় অভিনয় ধর্ম থাকে। সংলাপ ও ক্রিয়া দ্বারা তা প্রকটিত হয়। শ্রীকৃষ্ম কীর্তণের অনেক পদে এই গুণ আছে। সা বারিদ খানের কাব্যে মঞ্চ নির্দেশ পর্যন্ত আছে। কবি প্রতিটি ঘটনার সূচনায় সংস্কৃত দৃশ্য সংকেত ও রূপ সজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যে উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। সুন্দর মাধব ভাট ও সুন্দর মালিনীর সংলাপ বেশ উজ্জ্বল। সুন্দর মালিনীর শতিদীর্ঘ সংহত সংলাপ নাটকোচিত হয়েছে। অবশ্য এতে নাট্যক্রিয়ার অভাব আছে। শ্রীকৃষ্ম কীর্তণের সংলাপে নাটকীয়তা পুরো মাত্রায় বর্তমান। সংলাপের সংগীত ধর্ম সম্পর্কে যা বারিদ খানের জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি স্থলে রাগ ও ছন্দের উল্লেখ করেছেন। মালিনী সুন্দরের আলাপের অংশটি 'দেশাগ' রাগে রচিত হয়েছে। 'সুন্দরের কাঞ্চিপুরে যাত্রা' অংশ পঞ্চালি' ছন্দে লেখা। নাট্যিক ও সংগীতিক সংলাপ থাকা সত্ত্বেও বিবৃতিধর্মঙ্গি আখ্যান কাব্যের স্বাদ নষ্ট হয়নি। কবি নাট্যকাব্য রচনা করেছেন নাটক রচনা করেননি। কাব্যের শুরুতে আখ্যানের মত সাধারণ বর্ণনা আছে। সংলাপের মধ্যে মধ্যে কবি নিজের কথা দিয়ে ঘটনা প্রসারিত করেছেন। মাধব ভাট ও সুন্দরের বাক্যালাপ শেষে কবি লেখেন—বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্ট ভেল ভাট।/বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হত্র বাট।।/সুন্দরের বাক্য লেশ অমৃত সমাজ।/শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ।" কবির এ বর্ণনা পদ্ধতি বিবৃতিধর্মী, নাটকে সংলাপ দ্বারাই কাহিনীর বিস্তার ও বিবর্তন ঘটে।

সাহ বারিদ খান ও দ্বিজ শ্রীধর একই উৎস থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করেন, উভয়ের রচনা পাশাপাশি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। সংস্কৃত ভাষার কোনো এক কাব্য তাঁদের রচনার উৎস চরিত্র ও ঘটনাজ্ঞাপক সংস্কৃত উদ্ধতি গুলোতে যথেষ্ট মিল আছে। সা বারিদ খাঁ-র ভাষা সংস্কৃতানুগ, বিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত স্থান বিশেষ ভাষার আবেগ আছে। কিন্তু গতি ও ব্যঞ্জনা তেমন নেই। খণ্ডিত পুথি দিয়ে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। প্রান্ত অংশের নিদর্শন বিচার করে বলা যায়, শাহ বারিদ খানের কবিত্বে কৃত্রিমতা ছিল না।

৭.৪ বৈষ্ণব পদাবলি

নরহরি সরকার

আলোচ্য কালপর্বে বেশ কয়েকজন পদকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে। একদিকে আছেন চৈতন্য-সমসাময়িক পদকর্তারা অন্যদিকে রয়েছেন চৈতন্য--পদকর্তারা। এঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

চৈতন্য-সমসাময়িক কবি নরহরি সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ হোলো—গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে/ভাবের আবেশে বাধা রাধা বলি ডাকে/সুরধনি হেরি গোরা যমুনা ভাণে/ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে,

নরহরি নিত্যানন্দের বর্ণনা করে পদ লিখেছেন। তাঁর এই নিত্যানন্দ চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদগুলি ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। নরহরি সরকার কবি লোচন দাসের গুরু ও গৌরনাগরী সাধনার এক বিশেষ ধারার প্রবর্তক।

নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পরিবকরদের মধ্যে নরহরি সরকার ছিলেন অন্যতম। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের চার-পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরনারায়ণ, মাতা গোয়ী দেবী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ। নরহরি সরকার নবদ্বীপে টোলে পড়ার সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। চৈতন্যের প্রিয় সহচর গদাধরও এঁর বন্ধু ছিলেন। নরহরি যে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—এ উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে। বৈষ্ণবদেব মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গোবিন্দমন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। চৈতন্যের নরভাববৈশিষ্ট্যও এঁদের সৃষ্টি। নরহরিও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনাতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে রাধা কৃষ্ণলীলা নিয়েও তিনি কিছু পদ রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরির একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। পদটি খণ্ডিতা নায়িকা রাধার উক্তি। যারা কৃষ্ণকে ভালোবাসে (শ্যামধন যার হিয়ায় জাগে) তাদের সাবধান করে দিয়ে রাধা বলেছেন—কেউ যদি প্রেম করতে চায়, তাহলে সুজন কুজন বুঝে যেন প্রেম করে। কারণ কৃষ্ণের প্রেম, বিষে ভরা সোনার কলস। অথচ তার মুখটি দুগ্ধ পূর্ণ। বিচার না করে যদি কেউ পান করে—তাহলে পরিণামে তাকে দুঃখ পেতে হবে। নরহরির আর একটি পদ, সাহিত্য পরিষদের ৯৬৮ সংখ্যক পুঁথিতে পাওয়া যায়। পদটি আক্ষেপানুরাগের। এখানে রাধার আক্ষেপ বিধাতার প্রতি উচ্চারিত। বিধাতার এমনই বিধান যে পৃথিবীতে কৃষ্ণকে নিয়ে রসার মত একটু নিভৃত স্থান, একটি নিভৃত রজনীও রাধার ভাগ্যে জোটে না। নরহরির রাধা শেষ পর্যন্ত বিধাতাকে বেরসিক বলে তিরস্কার করেছেন। কারণ—

বিধি যদি রসের রসিক হত্য।
এসব কখন করিতে দিত।।

পদকল্পতরুতে নরহরির ভণিতায় ৩৬টি পদ রয়েছে। তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছ'টি। পাঁচটি ঝুলনের ও একটি খণ্ডিতার সতীশচন্দ্র রায় এগুলিকে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে করেন। গৌরপদতরঙ্গিনীতে নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় ৩৮২টি পদ। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন কোনটিয়ে নরহরি সরকারের রচনা তা নিশ্চিতভাবে নিরূপিত নয়। কারণ পরবর্তী কালের কবি 'ভক্তি রত্নাকর' রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে সরকার ঠাকুরের রচিত পদ মিশে গেছে। আমাদের ধারণা, নরহরি সরকার কৃষ্ণকথা নিয়ে অতি অল্পই পদ লিখেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ মনে করে গৌরনাগরী ভাবের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। অতএব নিছক কৃষ্ণকতা নিয়ে তাঁর কাব্য রচনার তেমন প্রয়োজন নাও হতে পারে।

পদামৃতসমুদ্রের ২৭ পৃষ্ঠায় নরহরির একটি আক্ষেপানুরাগের পদ সংকলিত হয়েছে। এই পদে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা রাধা কাতরভাবে সখীকে বলেছেন—"নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নুলাগি ঝুরে।' রাধার মতে, প্রেমের এই রস যে জানে না—সে ভালোই আছে। কারণ রাধার হৃদয়ে কানুর প্রেম যেন শেলের মতো বিঁধে আছে। শ্যাম অনুরাগে রধার চিত্ত আর কোনমতে ধৈর্য মানছে না। কিন্তু এই পদটিতে যে নরহরির কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ পদামৃতসমুদ্র কিংবা সাহিত্যে পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুঁথিতে পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া গেলেও কীর্তনানন্দে পদটির ভণিতা চণ্ডীদাসের। আবার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদটিকে কোথাও দেখেছেন বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়, কোথাও চণ্ডীদাসের ভণিতায়, আবার কেথায় জ্ঞানদাস ঠাকুরের ভণিতায়।

পদকল্পতরুর ৮৩৩ সংখ্যক বামকসজ্জিকার পদটি নরহরি সরকারের। এই পদে কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষামানা বাসকসজ্জিকা রাধা নারীর যৌবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। কারণ তিনি প্রেম করেছেন শধ ব্যক্তির সঙ্গে। রাধা এই বলে

দুঃখ করেছেন, যার জন্য তাঁর প্রাণ সর্বদাই পীড়িত হয়—সে কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও তাকায় না। নিজেই নিজের প্রেম বাড়িয়ে তিনি পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয়কুলেরই কলঙ্ককলেপন করলেন।

নরহরির আর একটি পদ মাথুর পর্যায়ের। বিরহিনী রাধার করুণ অবস্থার কথা শুনে রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদগদভাবে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি নিজেই গৃহত্যাগ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চললেন। যেতে যেতে বার বা কৃষ্ণ তাঁর নাসা স্পর্শ করতে লাগলেন, দ্রুতবেগের খাওয়ার জন্য তাঁর নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি চরণের মণিনূপুরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর অলঙ্কার খুলে পড়তে লাগল, মাথার চূড়াও খুলে যেতে লাগল। গভীররাত্রে রাধার গৃহে চন্দনের গন্ধে দশদিক আমোদিত হল। এবং—

লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মিলন কুঞ্জে।।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রসাধন ও গৃহকর্ম অসমাপ্ত রেখে ভাগবতের গোপিনীরা পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যসমসাময়িক এই কবির পদে কৃষ্ণই বিপর্যস্ত ব্যাকুলতায় রাধার জন্য পথে নেমেছেন।

মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটি প্রথম চৈতন্য জীবনী, কিন্তু এছাড়াও তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বন্ধে অন্তত দুটি পদ রচনা করেছিলেন। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে মুরারি গুপ্তের একটি বিখ্যাত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়—সকি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে/জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া/বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে।। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি শ্রীচৈতন্যের বয়ো-জ্যেষ্ঠ ও সহপাঠী ছিলেন। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশ সম্ভূত মুরারি ধর্মমতে রাম উপাশক ছিলেন। এই কবির রচিত অল্পকিছু রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদও পাওয়া যায়। বিশেষত তাঁর আপেক্ষানুরাগের একটি পদ অবিস্মরণীয়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধা ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সখী এসেছেন তাঁকে ফেরাতে। কিন্তু রাধা তাঁকে বললেন তিনি আর ঘরে ফিরবেন না। তাঁকে বললেন তিনি আর ঘরে ফিরবেন না। তাঁকে ফিরে যাওয়ার যুক্তি দেওয়া বৃথা। প্রেম করে তিনি যে সব বিসর্জন দিয়েছে, এমনকি নিজের অহংবোধকে পরিত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের মোহন রূপ তাঁর নয়নের পুতুল, তাঁর হৃদয়ের মাঝখানে সযত্নে রাখা প্রাণ। আর রাধা তাঁর প্রেমের আগুনে জাতি, কুল, শীল এবং অভিমান সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। যারা মূঢ়, জীবনে যারা প্রেমের আস্বাদ পায়নি, তারা নানা কথা বলে, কিন্তু রাধা তাদের কথা কানেও তোলেন না। 'স্রোত বিথার' প্রেমের নদীতে রাধা তাঁর শরীর ভাসিয়েছেন, সুতরাং 'কি করিবে কুলের কুকুরে?' করি মুরারি গুপ্ত পদের শেষে এই অনন্য সাধারণ প্রেম সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন—'পিরিত এমতি হৈলে/তাঁর গুণ তিনলোকে গায়।' মুরারি গুপ্তের রাধা চণ্ডিদাসের রাধার মতোই 'জাতিকুল শীল অভিমান' বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে লোক গঞ্জনার দায় এড়ানোর জন্য মৃত্যুবরণ করতে চান, সেখানে মুরারি গুপ্তের রাধা কুলাচার ও লোকাচারকে দৃপ্তভাবে তুচ্ছ করেছেন। জীবনেই মৃত্যুকে আহ্বান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন এবং তাঁর প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাকে কালজয়ী করে তুলেছেন।

গোবিন্দ মাধব ও বাসু ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ—এই তিন ভ্রাতাই মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর কৃপাধন্য। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কীর্ত্তনিয়া ও কবি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু এঁদের কীর্ত্তন শুনে নৃত্য করতেন, তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষের কোন কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের গৌরাঙ্গ লীলার পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য প্রথমবার বিবাহের পর যখন পূর্ববঙ্গে যান, তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লিষ্ট গোবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন—গোরা গেল পূর্ব্বদেশ—নিজগান পাই ক্লেশ।/বিল পয়ে কত পরকার।/কান্দে দেবী লক্ষ্মী প্রিয়া শুনিতে হিয়া/দিবসে মানয়ে অন্ধকার/পুন সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ/এখন পরান যদি রহে।।

কবি শুধু শ্রী গৌরাঙ্গে সঙ্গেই নয় তাঁর জননী শচীদেবী ও শচীদেবীর সখী শ্রীবাস পত্নী মালিনী দেবী সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষের মোট সাতটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সন্ন্যাসের ঘটনা নিয়ে লেখা দুটি পদ। এই দুটি পদের একটি মর্মস্পর্শী অথচ গভীর আন্তরিকতায় যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে—হেদে রে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।/বাহু পাসরিয়া গোরা চাঁদের ফিরাও।/ তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে। কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।

মাধব ঘোষেরও সাতটি পদ পদকল্পতরুতে আছে। তার মধ্যে চারটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসজীবন নিয়ে আর তিনটি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে। এই তিনটির মধ্যে ত্রুটি হল শ্রীকৃষ্ণের স্নান যাত্রার পদ। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপও মাতা যশোমতীর আনন্দ বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ এখন তিনি মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাতে পারবেন। যশোমতীর জননী হৃদয়ের স্নেহ আর তারই সঙ্গে সম্পন্ন গোপগৃহের সন্তানের জন্য স্নানের আয়োজন যেন চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে মনে হয়। মাধব ঘোষের এই চিত্ররচনার কৃতিত্ব অন্য একটি পদেও প্রকাশিত হয়েছে। পদটি রাধাকৃষ্ণের মিলনান্তিক রসালসের। মাথুরের পদে দূতী মাধবের কাছে গিয়ে দশমী দশায় উপনীতা বিরহাতুরা রাধার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন। রাধা এত ক্ষীণ হয়ে গেছেন যে ওঠার চেষ্টা করে উঠতে না পেরে তিনি কাতর হয়ে সখীর মুখের দিকে তাকান। আবার কখনও কৃষ্ণের মুখ মনে করে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। কখনও মথুরাগামী পথিকের চরণ ধরে ক্রন্দন করতে থাকেন। এখন কোনোমতে রাধার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। তাই দূতী কৃষ্ণকে সকাতরে অনুরোধ করেছেন—

একবেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এদুহু পদ দরশাই।।

মাধভ ঘোষের এই স্বল্পসংখ্যক পদেরও মূল বৈশিষ্ট্য নিরাভরণ আন্তরিকতা।

বাসুদেব ঘোষ ছিলেন নবদ্বীপে নিমাই-এর মুখ্য কীর্তনিয়া বা প্রধান গায়েন। গৌরাঙ্গ বিষক পদ কর্তা হিসেবেও তিনি তিন ভ্রাতার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর পদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।।

বাসুঘোষ নিতান্ত দু-একটি কথায় শচীমাতার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার অপরিসীম দুঃখের যে বর্ণনা দিয়েছেন—তা নিঃসন্দেহে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন শুনে শচীদেবী—

আউদড় কেগশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।

অন্যদিকে তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়া একটি মাত্র কথায় তাঁর গভীর বেদনার কথা জানান—

শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

বাসু ঘোষ এরপর তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে।

নদীয়ার নারীরা মন্তব্য করেছেন—

আমরা পরের নারী পরান ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়েও কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। আক্ষেপানুরাগের একটি পদে তিনি রাধার প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। রাধা বলেছেন না জেনে শুনে কৃষ্ণের সাথে প্রেম বাড়িয়ে এখন আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মেঘ বর্ষনের মতো তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে। পাকানো পাটের দড়ি আগুনে পুড়ে গেলে তার বাইরের আকার ঠিক থাকে আর ছুঁয়ে দিলেই ঝরে যায়। আজ মনের আগুনে পুড়ে রাধাও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। এঁদো পুকুরে মাছ নিঃশ্বাস নিতে জায়গা পায় না—তেমনি করে কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনও রাধার জীবন ধারণের পক্ষে দুঃসহ। কৃষ্ণের প্রেম যেন ডাকাতের প্রেম। সবলে সমস্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে রাধাকে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলে গেছে। পদটি অনুভূতির আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। অনুভূতির অকৃত্রিম উত্তাপকে রূপ দিতে গ্রাম জীবনের কতগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলঙ্কার ও চিত্রকল্প নির্মিততে কাজে লাগিয়েছেন। পাকানো পাটের দড়ি, এঁদো পুকুরের মাছ ও ডাকাতিয়া পীরিতি কবির বাস্তব জীবনাভজ্ঞিতা সঞ্জাত রূপনির্মিতি।

বর্ষাভিসারিকা রাধার অনুভবে কৃষ্ণ মিলনের ঔৎসুক্য বর্ণিত হয়েছে এই কবির একটি পদে। আকাশে নবীন মেঘ দেখে রাধার চিত্ত আনন্দে নেচে উঠেছে। তিনি মেঘকে সম্বোধন করে বলেছেন—মেঘ যেন বর্ষন করে, তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। বৃষ্টি যেন অল্প অল্প অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় (বরিষ মন্দ ঝিমানি)। তাহলে রাধা সুখে রাত্রিযাপন করবেন। দাদুরি দুন্দুভি বাজারে আর ময়ূরীর সুর শোনা যাবে। এই পদটি যেন বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহের পদের পরিপূরক। সেখানে রাধা প্রকৃতির উতরোলমত্ত আনন্দের মাঝখানে নিজের বিরহ বেদনাকে স্থাপিত করেছেন, আর এখানে একই পরিবেশে রাধা ভাবী মিলনের আনন্দে অধীর। পদটির পরিবেশ বিদ্যাপতিরই। কিন্তু 'মন্দ ঝিমানি' বৃষ্টির জন্য রাধার বাসনা তাঁকে যেন বাংলাদেশেরই একটি মেয়ের গূঢ় আকঙ্ক্ষার গভীর ডুবিয়ে দিয়েছে।

দানলীলা নিয়েও বাসু ঘোষ পদ বা পালা রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করি। কিন্তু অখণ্ড পালাটি পাওয়া যায় নি। পদ কল্পতরুতে এর একটিমাত্র ছিন্ন পদ (পদ সংখ্যা ১৩৬৯) আমরা পাই। এই পদেও বাসু ঘোষ কৃষ্ণ কথাকার রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধা দাসীদের মাথায় চাপিয়ে মথুরার হাটে দধি, দুগ্ধ বিক্রয় করতে চলেছেন। শ্রীরূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর দানকেলি কৌমুদী ও দান কেলিচিন্তামণি নামের দুটি নাটকে এই ধরনের বর্ণনা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাসু ঘোষ যে সময়ে কাব্যরচনা করেছিলেন, তখনও বাংলাদেশে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর পুস্তকাদি এসে পৌঁছায় নি।

বাসু ঘোষের একটি পদে রাধা কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে এবং কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হয়েই পথ চলেছেন। আর তখনই সামনে কৃষ্ণকে দেখে অবাক হয়ে বলেন—কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।/তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে।। রাধার এই মুগ্ধতা জড়িত বিস্ময়টুকু পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পদগুলি ছাড়াও বাসুদেবের ভণিতায় একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে। পুঁথিটিতে পরপর কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনী সুবল সংবাদ। দ্বিতীয় কাহিনী ননীচুরির। তৃতীয় কাহিনী ভান পূজা। চতুর্থ কাহিনীটি মনের। পঞ্চম কাহিনীটি নৌকালীলার। অবশ্য পুঁথিতে লেখা রয়েছে 'দানখণ্ড'। নৌকালীলার কাহিনীটি গতানুগতিক, শেষ কাহিনীটি দূতী সংবাদ।

শিবানন্দ সেন

বৈদ্যকুলজাত শিবানন্দ একজন সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে শিবানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।/প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।/নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া।।

কবিকর্ণপুর শিবানন্দ সেনেরই কনিষ্ঠপুত্র। পদ কল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে 'শিবাই' নামের কবি আসলে পৃথক কেউ নন, শিবান্দের সংক্ষিপ্ত নাম শিবাই। শিবানন্দ সেনের তিনটি পদকল্পতরুতে তিনটি পদ পাওয়া যায়। দুটি গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ও একটি মাথুর বিরহের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীরাধার বংশী শিক্ষার একটি চমৎকার পদ আছে। রাধা কৃষ্ণেরই অনুকরণে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন। অনভিজ্ঞা রাধার হাতে বাঁশি কখনও বাজে, কখনও বাজে না। কৃষ্ণই রাধার অধরে বাঁশিটি ধরে রয়েছেন। কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে বংশী শিক্ষাদান রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই কৌতুক তরল একটি দিক। এছাড়াও এই কবি রচিত রাধার আক্ষেপানুরাগ এবং বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের পুন-মিলনের একটি পদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমের সমর্পিত রাধার লোকনিন্দার জন্য বেদনা এবং বন্দাবনে মিলনের ব্যাকুল আনন্দ এই পদদুটিতে ফুটে ফুটে উঠেছে। শিবানন্দের সঙ্গে শিবাইকে যদি অভিন্ন ধরা হয়, তাহলে আরও কিছু কৃষ্ণলীলার পদ এই কবির রচিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার তিনটি পদ এই কবির রচনা হিসেবে পাওয়া যায়। একটি পদে নন্দের জননীর উল্লেখ আছে—'নন্দের জননী নাচে বুঢ়িয়ারে' অন্য একটি পদে পৌর্নমাসীর প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামীরচিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। গোষ্ঠলীলার পদগুলি গতানুগতিক।

রামানন্দ বসু

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা মালাধর বসু পদাবলিকার রামানন্দের পিতামহে, মতান্তরে পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে থাকাকালীন রামানন্দ বসুর সহচর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'বসুদেবসুও কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' লিখে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন—এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ? /তোমার কা কথা তেমার গ্রামের কুক্কুর/সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।

রমানন্দ বসুর ভণিতায় পদকল্পতরুতে সাতটি পদ আছে। এর মধ্যে একটি নবদ্বীপ লীলায় গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ বিরহের, একটি সন্ন্যাস শ্রীচৈতন্যের ভাব বর্ণনা, একটি নিত্যানন্দের নৃত্য বর্ণনা আর চারটি পদ শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, কুঞ্জভঙ্গ ও যুগলমিলন বিষয়ক।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন রামান্দ বসু।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও সখ্যরসের পদরচনায় ও রামানন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রামানন্দ রচিত শ্রীধারার পূর্বরাগের একটি পদে রাধা স্বপ্নেশ্রীকৃষ্ণের দেখা পেয়েছেন। শ্রাবণ রজনীর বর্ষণসজল মোহময় অন্ধকারের পটভূমিতে বিস্রস্তবাসা শ্রীরাধার কাছে স্বপ্নে এসেছেন এক শ্যামল পুরুষ। রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়ার বাসনা এইভাবেই স্বপ্নে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদটিতে রাধার মধুর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে হতাশা জড়িত বেদনা বড় চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্যামল পুরুষ স্বপ্নে রাধাকে চুম্বন করে প্রেমধন ভিক্ষা করেন। জেগে উঠে রাধা কাঁপতে কাঁপতে দেখেন, তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্য নয়। তখন—আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর/কহিলে কে যায় পরতীতি।।

স্বপ্নের মধ্যেই রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে বিশেষত্ব রয়েছে—আপনা করেয় পণ সবে মাগে প্রেমধন/বলে কিন যাচিয়া বিকাই। রাধার স্বপ্নে দেখা এই শ্রীকৃষ্ণ রামানন্দের চোখে দেখ শ্রীচৈতন্য। যিনি প্রেমধন মেগে বেড়ান সবার কাছে, আর তার বিনিময়ে নিজেকে সেধে সেধে বেচে দেন।

স্বপ্নে নায়কের দেখা পাওয়ার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু পাওয়া যায়। কবি বসুকল্প রচিত একটি একটি শ্লোকে নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে দূতী বলেছে, স্বপ্নে তাঁকে দেখতে পেলে হরিণ নয়ন। নায়িকার শরীর ঘন রোমাঞ্চে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। আর প্রচুর ঘর্মজল যেন তাকে স্নান করিয়ে দেয়। (নায়ককে) জোরে টানতে গিয়ে স্খলিত বলয়ের ঝঙ্কারে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তারপর অনবরত চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে।

মান ও মাথুর পর্যায়ে রামানন্দের পদগুলি গতানুগতিক। তবুও সব মিলিয়ে বলা যায়, চৈতন্য সমসাময়িক ভক্ত কবি হিসেবে রামানন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তাঁর পদাবলিতে কৃষ্ণকথা গতানুগতিকতা মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

বংশীবদন

বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়া পাহাড় গ্রামে। ১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে কবির জন্ম হয়। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকারে উল্লেখ আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কিছুদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষকরূপে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদ ইনিই রচনা করেছেন। এঁর গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে কবি তাঁর পদগুলিতে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিতেও কখনও কখনও কবি মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন। এবং কথা অংশেও বৈচিত্র্য এনেছেন। সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই তিন প্রকারের পদই ইনি সমকৃতিত্বের সঙ্গে রচনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের পরিকর এই কবি গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করে যে পদ লিখেছেন তা তাঁর ভণিতা থেকেই বোঝা যায়। চৈতন্যজীবনীর উপাদান হিসেবেও তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ খুবই মূল্যবান—

নির্দ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
বাহির নদীয়া মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী বধুর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়।

বংশীবদন কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোষ্ঠলীলা পূর্ব অনুরূপ পর্যায়ের পদ রচনা করেন। তাঁর নৌকাবিলাসের কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। এছাড়া শ্রীরাধার আপেক্ষানুরাগ শ্রীরাধার অভিসার, রাধার মান ও মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকর্তৃক নারীবেশধারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পদ বংশীবদনের নামে পাওয়া যায়।

বলরাম দাস

বৈষ্ণব পদাবলিতে চৈতন্যপরবর্তী কবি হিসেবে বলরাম দাস তাঁর নিজস্বতায় দীপ্ত কবিসত্তা। কিন্তু এঁকে নিয়েও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সেই মহাকাব্যের যুগ থেকেই দেখা যায়, ব্যাস-বাল্মীকির

ছত্রছায়ায় বহু অজ্ঞাতনামা স্রষ্টা তাঁদের সাহিত্য কীর্ত্তির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করে গেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করা যায় কালিকাদের ক্ষেত্রেও। আর বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস, কাশীরামের রামায়ণ মহাভারতের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং আমাদের আলোচ্য বলরাম দাসের ক্ষেত্রেও অনরূপ ব্যাপার ঘটেছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক বলরাম ও বলরামদাসের নাম পাওয়া যায় কিন্তু এরা সবাই আলাদা লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, একজন বলরাম দাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস/নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস।। নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন—বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী/নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদী।

কাটোয়া এবং খেতুরির উৎসবে সম্মানিত অতিথিদের তালিকায় একজন বলরাম দাসের উল্লেখ আছে। মনে হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। এই বলরাম দাস নিত্যানন্দের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বাসস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ দোগাছিয়া গ্রামে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য-এই নিয়েও সংশয় আছে। এঁর বংশধর শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার দোগাছিয়া গ্রাম থেকে বলরামের দু একটি উৎকৃষ্ট বাৎসল্য রসের পদ আষ্কার করেছিলেন। এই পদগুলো সর্ব প্রথম পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশ চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। বলরাম দাসের গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে মনে হয়, তিনি বাৎসল্য রসের মাধ্যমেই কৃষ্ণ উপাসনা করতেন, বাৎসল্য রসই তাঁর পদাবলিরও মুখ্য উপজীব্য ছিল। এছাড়া আরও কয়েকজন বলরাম দাসেরও নাম পাওয়া যায়।

ড. সুকুমার সেনের মতে পদাবলিকার হিসেবে দুজন বলরামের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। একজন বলরামদাস বাংলায় পদ লিখেছেন এবং তিনি প্রাচীনতর। আর একজন ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন, তিনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী। আমাদের আলোচ্যকবি প্রাচীনতর বলরামদাস। বলরাম দাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি ও সহজ সরল ও আন্তরিক। জননী শচীর বেদনাকে তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী রূপ দিয়েছেন তাঁর পদে—এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি/ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি।/জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়/করে বোলে হইলা বৈরাগি।।/গোরা চান্দের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে/আর তাহে শচীর করুণা/কহে বলরাম দাস গোরা চান্দের সন্ন্যাস/জগভরি রহিল ঘোষণা।

কিন্তু বলরাম দাসের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বাৎসল্য রসের পদ রচনায়। শ্রীরূপ তাঁর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে' শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কৌমার, দশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। বলরাম দাস কৃষ্ণের কৌমার বয়স থেকে কৈশোর বয়সের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা করেছেন। এই কৃষ্ণলীলার অবলম্বন সখ্য ও বাৎসল্য রস। সখ্য রসের বর্ণনায় শ্রীরূপ বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেও পদাবলি সাহিত্যে এর প্রভাব খুব একটা পড়ে নি। তার কারণ শ্রীরূপ নিজে এর উদ্ভাবয়িতা হলেও মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন এই কারণেই গোড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তারাও সখ্যরসকে গৌন করে ফেলেছেন। তবুও যে, সখ্যরস নিয়ে কিছু রসোত্তীর্ণ পদ রচিত হয়েছে, তার মূলে নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ নদীয়ায় অনেক সময়ইে গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর শিষ্য পদকর্তারা সখ্য রসের পদরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পুরুষোত্তম, সুন্দর দাস ও বলরাম দাস এর দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণের জন্ম সময় অর্থাৎ কৌমার কাল থেকেই বলরাম দাস বাল্যলীলার পদ রচনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী কবিরা এটিকে অনুসরণ করে নন্দোৎসব বর্ণনা করেছেন। বলরাম দাসও তাই করেছেন।

নিজ গ্রামে বালগোপাল মুর্তি প্রতিষ্ঠাতা গোপাল পূজারী বলরাম দাস, তাঁর পদাবলি চর্চায়ও বাৎসল্যের নিপুণ রূপকার। বালক কৃষশ্ণ ও জননী যশোদার স্নেহে, আবেগে, অভিমানে, কৃষ্ণের বাল্যকালীন নানা মধুর চাপল্যে তাঁর

পদগুলি অমৃতরস সিঞ্চিত। বলরামের বাৎসল্যের পদগুলিতে কৃষ্ণ অথবা যশোদার মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বিন্দুমাত্র নেই। বন্দাবনের নয়, যেন বাংলা দেশেরই পারিবারিক পরিবেশের আবেষ্টনীতে মাতা ও সন্তানের চিরকালীন মমত্ব বিজড়িত সম্পর্কে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কবির কাব্যপটে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ তুলিতে আঁকা।

বালক কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা যান গৃহকাজে। ঘুম ভাঙার পর ক্ষুধাতুর কৃষ্ণ মায়ের কাছে আহার প্রার্থনা করে। আর একটু দেরি হলেই মন্থন দণ্ড ভেঙে ফেলবে বলে। দুরন্ত দামাল ক্ষুৎকাতর শিশু এবং সেই সঙ্গে এক গৃহকর্মবিব্রতা জননীর ছবিই এখানে ফুটে উঠেছে। 'দধি মন্থন ধ্বনি/শুনইতে নীলমণি/আওল সঙ্গে বলরাম' শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় দধি-মন্থনের ধ্বনি শুনেই বালক কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মায়ের কাছে চলে আসে। মা যশোদা শিশুকে বলেন, তিনি গোপালকে ক্ষীর ননী দেবেন, কিন্তু আগে তাকে মায়ের সামনে নাচতে হবে। মায়ের কথা শুনে— নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি/কর পারি নবনীতে মাগে।।

এই শিশু কৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐশ্বর্যভাব আরোপের কোন চেষ্টাই কবি করেননি। রানী পুত্রের দু-হাতে নবনী ভরে দিলেন, সে খেয়ে নাচতে লাগল। সেই নৃত্য দর্শনে মায়ের মনেও আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মন্থন দণ্ড ছেড়ে সঘনে করতালি দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, রোহিনীকে ডেকে তাঁর পুত্রের নাচ দেখাতে লাগলেন। এমন অকৃত্রিম বাৎসল্যের চিত্র সমগ্র পদাবলি সাহিত্যেই দুর্লভ।

আবার কখনও ননী চুরি করে খাওয়ার জন্য জননী গোপালকে শাস্তি দিলে, অভিমানী বালক নন্দরাজার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে—না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে/মা হইয়া বলে ননীচোরা।। গোপাল এই দুঃখের মধ্যেও নিজের দোষ স্খলনে তৎপর। বলরামই ননী খেয়েছে। অথচ মা তার নামে দোষ দিচ্ছেন। রানী ভালোমন্দ কিছুই বিচার করলেন না। অন্য মায়ের ছেলেরাও কত ননী খায়, কিন্তু অন্য কোনো মা-ই ছেলেকে এভাবে বেঁধে রাখে না। বালক কৃষ্ণের আত্মসম্মান বোধও বড় তীব্র। রানী তাঁকে ছাঁদন দড়িতে বেঁধে রেখেছেন। তাই দেখে—"আহীরা রমনী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে" এই দুঃখ কৃষ্ণ সহ্য করতে পারবেন না, তিতিন তাই তাঁর অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে নিতে বলেছেন। এই দুঃখে তিনি যমুনা নদী পার হয়ে চলে যাবেন। মা যশোদা পরের সন্তান পেয়েই তাঁর ওপর এত অত্যাচার করছেন। বালক কৃষ্ণের এই অশ্রুসজল অভিমানস্ফুরিত বাক্য বড় মধুর ও চিত্তাকর্ষক। শিশু মানসের এমন বাস্তব রূপায়ণ বলরামের গভীর অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের সত্যতাই প্রমাণ করে। কিন্তু 'পরের ছাওয়াল পাইয়া" কথাটিতে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যেন শিশু কৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানেন। এটুকু না থাকলে পদটির কাব্যসৌন্দর্য আরও গভীর হতো।

বলরামের গোষ্ঠলীলার পদেও বালক কৃষ্ণ ও জননী-যশোদার পারস্পরিক মাধুর্যময় মমতার ছবি। কৃষ্ণ গোপ বালক, বংশানুক্রমিক বৃত্তির প্রয়োজনেই তাঁকে অন্যান্য গোপ বালকদের সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে হবে। কিন্তু পুত্রকে গোষ্ঠে পাঠাতে জননী যশোদার মন চায় না। নাা বিপদের আঙ্কা করে পুত্রের ভাবী বিরহ দুই-ই জননীর মনকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই একজনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে মায়ের মন নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। বলরাম কৃষ্ণের মতোই শিশু। তবু সেই বালকের হাতেই কৃষ্ণের ভার দিয়ে জননী যশোদা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চান। কৃষ্ণকে নিয়ে মায়ের আশঙ্কার শেষ নেই। তাই মা বলেন—'কত জন্মভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী/পাইলাম এ দুখ পাসরা/কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে/বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা।।' বলরাম দাসের বাৎসল্য রসের পদে প্রধান চরিত্র দুটি—স্নেহ বিমুগ্ধা জননী যশোদা আর মাতৃস্নেহ সিঞ্চিত বালক কৃষ্ণ। পটভূমিতে বলরাম জননী রোহিনী, বলরাম শ্রীদাস সুদাম প্রভৃতি চরিত্র। বলরাম দাসের পদগুলিতে গভীরতা সব সময় প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু আমাদের মনকে এক স্নিগ্ধ অনুভূতিতে ভরে দেয়। মা আর সন্তানের যে সম্পর্ক শাক্ত পদাবলিতে চিত্রিত, তার বিপরীতে আছে নিষ্ঠুর সমাজের বিধিবিধান; সমাজ তার বিধি বিধানে জননী হৃদয় থেকে সেখানে রক্ত ঝরায়। তাই শাক্ত পদাবলির মাতৃহৃদয়ের বেদনা একটা জায়গায় আর পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। দেশকাল নির্বিশেষে নানা বিচিত্র বিধিবিধানের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত

অসংখ্য মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যায়। আর অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলির জননীর বাৎসল্য দেশকাল নির্বিশেষে হলেও বিশেষ করে বাঙালি পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক প্রাত্যহিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর মাধুর্য, এর স্নিগ্ধতাকে আমরা দেখেও দেখি না। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলি কারগণ অভ্যাসের তুচ্ছতায় আকীর্ণ এই বাৎসল্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। মমতার স্নিগ্ধ তুলি বুলিয়ে যেমন করে বহু পরবর্তীকালের বিভূতিভূষণ আর জীবনানন্দ রূপসী বাংলার অবহেলিত অজস্র রূপসম্পদকে এক স্নিগ্ধ সুষমায় অভিষিক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলরাম দাসের পদে এই বাৎসল্য বর্ণনায় যেন অনায়াস মাধুর্য নির্গলিত। সেই মাধুর্যের প্রকাশ জননী যশোদার উদ্বেগে, চঞ্চল বালকের অজস্র অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও তার প্রতি সশঙ্ক স্নেহে। কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরে এলে মা যশোদা প্রথমেই অনুযোগ করে বলেন—

নন্দদুলার বাছা যশোদা দুলাল।/এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল।।

সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে সারাদিন যে তীব্র উদ্বেগে মায়ের কেটেছে, সেই উদ্বেগ আর উদ্বেগমুক্তির আনন্দ— দুটিই যেন এই অনুযোগে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে জননী যশোদার াহত মাতৃত্বের অভিমানও পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে। যে ছেলে মায়ের 'বসন ধরিয়া হাতে' মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সেই ছেলে এতক্ষণ মাঠে কাটিয়ে এল কি করে? যশোদার এই অনতিস্ফুট অভিমান এক মর্তমানবীর স্নেহগৌরব সচেতনতাকেই প্রকাশ করেছে।

বাঙালী কবি বলরাম দাসের আঁকা এই জননী যশোমতী একান্তভাবেই এক বাঙালী মা। স্বামী-সন্তান, স্বজন পরিজনে ঘেরা তাঁর একান্ত মমতায় গড়া সংসারের সীমাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিন যাপন।। তিনি সীমা স্বর্গের ইন্দ্রানী। এর বাইরে কোন বড় আদর্শ, কোনো মহৎ ভাব, সন্তানের কোন মহৎ কীর্তির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাকে স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান। অথচ মহাকাব্যকার বাল্মীকির আঁকা জননী সুমিত্রা। সপত্নী পুত্র রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে ইচ্ছুক একমাত্র পুত্র লক্ষণকে বাধা তো দেনই নি, বরং বলেছিলেন—

এষ লোক সতাং ধর্মো সজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ। এখানে শেষ নয়, তারপরও—'সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তাম।" সুমিত্রা বারবার লক্ষ্মণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে যেতে বললেন। অন্যদিকে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও আমরা অলর্ক জননী মদালসাকে দেখেছি, যিনি পুত্রকে ধর্মমার্গ গ্রহণ করে সংসার ত্যাগী যোগী হওয়ার উপদেশ দেন। মহাকাব্যের এই মহীয়সী জননীরা তাঁদের চরিত্রের মহান আদর্সে উজ্জ্বল কিন্তু আমাদের দূরবর্তিনী। অন্যদিকে জননী যশোদা আমাদের পরিচিত গৃহাঙ্গনের একান্ত আপন এক মাতৃমূর্তি।

বাৎসল্য রসের মত সখ্যরসের পদরচনায় ও বলরাম দাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'নটবর নব কিশোর রায়' পদটিতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ছন্দেও অভিনবত্ব আছে। বলরাম দাসের বাল্যলীলা বর্ণনায় একটি কালিয়া দমনের পদও আছে। পদটিতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ কালীয় দমনের জন্য জলে ডুব দিয়েছেন। তাই ব্রজবাসী সমস্ত মানুষ ও পশুপাখী কৃষ্ণের মৃত্যু আশঙ্কা করে হাহাকার করছে। কবি বলরাম, ভণিতায় সবাইকে প্রবোধ দিয়ে স্থির থাকতে বললেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলি সাহিত্যে, বাৎসল্যলীলার পদ যেমন ছিল না, তেমনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশক এই সমস্ত লীলার আভাস থাকলেও এগুলিকে নিয়ে পদ রচিত হয় নি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে ঐশ্বর্যে মাধুর্যে বিমিশ্র কিছু কিছু পদ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বলরামদাস যে পদগুলি রচনা করেছেন, তাতে পরিকল্পনার মৌলিকতা খুব একটা নেই। কিন্তু নিতান্ত সহজ ভাষায়, নিরাভরণ ভঙ্গীতে তিনি তাঁর পদগুলির মধ্যে মাধুর্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন। সারল্যস্নিগ্ধ এই পদগুলিতে কবির হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয়ে এগুলিকে আধুনিক পাঠকেরও মনোধর্মের নিকটবর্তী করে তুলেছে।

জ্ঞানদাস

চৈতন্য পরিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পদকর্তা জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৫৩০ খিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস যেভাবে নিতানন্দের লীলা বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় কবি নিত্যানন্দ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কিন্তু এঁকে নিত্যানন্দের গণ বলে মনে করা হলেও ইনি আসলে ছিলেন জাহ্নবী দেবীর অনুচর। নিত্যানন্দের দেহত্যাগের বেশ কিছু সময় পর জাহ্নবী দেবী ব্রজধামে গেলে, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন জ্ঞান দাস। জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা বহু। কিন্তু একাধিক জ্ঞানদাসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানদাসের নামে যত পদ পাওয়া গেছে সব একজনের বলেই মেনে নিতে হয়। জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দলীলা এবং রাধাকৃষ্মলীলা উভয় বিষয়ক পদই তিনি রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানদাসের সমস্ত পদগুলি পড়লে বোঝা যায়, প্রথম দিকে তাঁর কবি, প্রতিভা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের অনুকরণে নিজের যথার্থ প্রবণতার সন্ধান করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবি জ্ঞানদাস বিদ্যাপতির পদের আলঙ্কারিক রীতি বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকারের সহজ সরল রীতিকেই গ্রহণীয় মনে করেছেন। চণ্ডীদাসের মধ্যে শরীর অতিক্রমী অনুভূতিরই প্রাবল্য। অন্যদিকে জ্ঞানদাস কিন্তু শরীরকে অস্বীকার করেন নি, শরীরের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সংযোগ তা জ্ঞানদাসের পদগুলি ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলা বিষয়ক পদগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই পর্যায়ের পদগুলি পড়ে মনে হয়, তিনি নিত্যানন্দলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন—

দেখরে ভাই; প্রবল মল্লরূপ-ধারী
নাম নিতাই বায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই না পারি।
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগ বিদিগ নাহি জান।
মত্ত সিংহ যেন গরজে ঘনে ঘন
জগ মাহ কাহু না মান।।

জ্ঞানদাস কৃষ্মের শৈশব ও কৈশোর নিয়ে পদ রচনা করলেও তাঁর অনন্যতা শ্রীরাধার শৈশব, কৈশোর বর্ণনা বিষয়ক পদে। এই বিরল পর্যায়ে জ্ঞান পদরচনা মৌলিকতারই পরিচায়ক। শিশু কন্যাটিকে দেখে প্রতিবেশিনী, রাধার জননীকে বলেন—

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি।
হেন মনে লয় এ হেন রূপক
পদুকা করিয়া রাখি।

আর একটি পদে রাধার কন্যাবৎসলা জননী-মাতৃ হৃদয়ের আশঙ্কা ও মমত্ব বড় চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সকাল থেকে বালিকা রাধা খেলা করতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজে ন পেয়ে মা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই কন্যা গৃহে ফিরে এলে তিনি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন—প্রাণনন্দিনী, রাধা বিনোদিনী/কোথা গিয়াছিলা তুমি/এ গোপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে/খুজিয়া ব্যাকুল আমি।।

মা তাঁর বালিকা কন্যাকে প্রশ্ন করেন, তাঁর আঁচলে তে খাবার কে বেঁধে দিল? অগুরুচন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, মাথায় বিনোদ বেণী আর নব মল্লিকার মালা দিয়েই বা কে রাধাকে সাজাল? উত্তরে সরলা বালিকা বলে, খেলতে যাওয়ার সময় পথ থেকে এক গোয়ালিনী তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার পুত্রের রূপের ছটায় বালিকা প্রাণ মোহিত। গোয়ালিনী রাধাকে সেই পুত্রের বামে বসিয়ে দুজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন এবং রাধার গৌরবর্ণ শরীরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। মেয়ের কথা শুনে রাধার মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। পদ দুটিতে রাধার জননীর অকৃত্রিম বাৎসল্যে সঙ্গে সঙ্গে মধুর রসেরও সূক্ষ্ম কোমল প্রলেব পড়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্যে বলরাম দাস বাৎসল্যের ও সখ্যরসের সুনিপুণ রূপকার। জননী যশোদার স্নেহ শঙ্কাতুর মাতৃ হৃদয়ের উদ্বেগ,কৃষ্ণের প্রতি সখাদের সনির্ভরতাময় গভীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কনে বলরামের লেখনী অজস্র রসবর্ষণ করেছে। কিন্তু এই পর্যায়ের পদরচনায় জ্ঞাদাসের কৃতিত্বও কম নয়। সখ্যরসের পদবর্ণনায় কবিত্ব ছাড়াও কথা অংশে জ্ঞানদাস কিছু কিছু অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বারো জন প্রিয় সখার নাম করেছেন। এঁরা হলেন শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুন্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। প্রিয়নর্মসখা শ্রীরূপের বর্ণনায় পাঁচজনঃসবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল। এই সতের জনের মধ্যে জ্ঞানদাসের বর্ণনায় শ্রীদাম, সুদাম বসুদাস, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, সুবল, অর্জুনও উজ্জ্বল—এই নয়জনের মাত্র নাম রয়েছে। তবে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে নেই—এমন জ্ঞাত জনের নাম জ্ঞানদাসের পদে পাওয়া যায়। এই নামগুলি হল—দেবদত্ত, সুনন্দ, নন্দক, বিষয়া, সুবাহু, বরূথপ এবং বিশালা। শেষের দুজন সখার নাম অবশ্য ভাগবতে পাওয়া যায়।[৮৭] এক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের কল্পনা শ্রীরূপকে অতিক্রম করে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সখ্য ও বাৎসল্যরসযুক্ত গোষ্ঠলীলার পত্র বর্ণনায় কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে যেন গোষ্ঠীলীলায় অংশ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ নিজেকে তিনি এক গোপবালকরূপে কল্পনা করেছেন। গোষ্ঠলীলার প্রতি কবিরএই আকর্ষণের কারণ হিসেবে বলা যায়, সম্ভভবত নদীয়ায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কারণ জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলা বিষয়ক পদগুলি কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বলে মনে হয়। সম্ভভবত বলরাম দাস, পুরুষোত্তমদাস প্রভৃতি মত নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিধিভুক্ত হয়ে জ্ঞানদাস গোষ্ঠলীলার পদ রচনা করেছিলেন।

কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদগারের পদে। এছাড়াও আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদেও জ্ঞানদাস তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। স্নিগ্ধ মাধুর্যের অবিরল উৎসারণ জ্ঞানদাস রচিত পদের বৈশিষ্ট্য। এই মাধুর্যস্নিগ্ধতা শুধু পূর্বরাগ, অনুরাগে নয়, খণ্ডিতা কলহান্তরিতা ও প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়েও উৎসারিত। প্রথম দিকে অবশ্য জ্ঞানদাস-বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস উভয়কেই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত পদের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব দেখা যায়। এমনকি ঘটনাক্রমও বিদ্যাপতির অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে যেখানে শুধুমাত্র রাধার রূপের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে, জ্ঞানদাস সেখানে সুকৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের চিত্রটিকেও মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে উপস্থিত করেছেন—

পরখে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।

রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও রসোদগার পর্যায়ে কৃষ্ণ রূপমুগ্ধা রাধার উচ্ছলিত আনন্দ ও গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশে, সেই নিবিড় গভীর অথচ কোমল মধুর প্রেমের অলঙ্কার বিরল ভারতন্ময় বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা যেন মত্ত ময়ূরের মত শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাসে কলাপ বিকাশ করেছে। বিদ্যাপতির অলঙ্কারবৈচিত্র্য ও চণ্ডীদাসের ভাবোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে ভাবের সংহত রূপকে ভাষায় আয়ত্ত করার বৈশিষ্ট্য এখন জ্ঞানদাসের পদে প্রকাশ পেয়েছে।

এই পর্যায়ের পদগুলি জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিদ্যাপতি নায়কের রূপানুরাগ নিয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদে নায়িকার রূপানুরাগই বেশি। এর কারণ বিদ্যাপতির প্রেমে কাম ও লালসা মিশ্রিত। তাই পুরুষের কামনা দিয়ে দেখা নারীরূপ বর্ণনাই তাঁর পদে বেশি, আর অন্যদিকে চণ্ডীদাস অনুভূতিসর্বস্ব। দেহ এবং মন, উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক রূপলাভ করেছে জ্ঞানদাসের পদে। রূপ এবং গুণ উভয়ই জ্ঞানদাসের রাধার অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। দেহমনের এই নিবিড় গভীর সম্পর্কে প্রেমের যে পূর্ণাবয়ব সুচারু রূপ জ্ঞানদাসের কাব্যে গড়ে উঠেছে, তা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির মধ্যে দেখা যায় না। কৃষ্ণরূপের অতল বিস্তারে সমুদ্রে রাধার চোখ ডুবে যায়। রূপ দেখার আর প্রশ্ন থাকে না। কৃষ্ণের যৌবন যেন শ্যামল অরণ্য, সেখানে রাধার মন হারিয়ে যায়। যমুনার ঘাট থেকে ঘরে যাওয়ার পথটুকু আর শেষ হয় না (১৫৮)। কখনও কৃষ্ণকে দেখার অপরিমিত উল্লাসে ব্যাকুলা রাধা সখীকে বলেন—'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে'। দেহের সীমানা ছাড়িয়ে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে রাধার এই উল্লাস তখন স্পর্শ করে রূপাতীত অনুভূতিকে। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধার মুগ্ধতার অভিব্যক্তিতে সেই রূপ বর্ণনাও মাধুর্য রস নিষ্মাত হয়ে ওঠে—

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরণে না যায় মোর হিয়া
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া।।

অনুরাগ ও আপেক্ষানুরাগ পর্যায়ের পদেও জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। কিন্তু অভিসার পর্যায়ের পদে এই কবি ব্যর্থ। অন্যদিকে আবার দানলীলা ও নৌকাবিলাসের পদগুলি জ্ঞানদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর নৌকাবিলাসের পদে আবার শ্রীরূপ গেস্বামীর 'দানকেলীকৌমুদী' নাটকের প্রভাব আছে। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্য গোস্বামী প্রভাবের এটি এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বংশীশিক্ষা পদগুলিতে ও জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। এছাড়া রাধা-কৃষ্ণের বসন্তবিহার ও দললীলার বর্ণনায় জ্ঞানদাস বসন্তকালে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, তরুলতা ও পশুপাখির উন্মাদনার মাঝখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে স্থাপিত করেছেন।

মান পর্যায়ের পদ নিয়ে জ্ঞানদাস খুব বেশি পদ রচনা করেননি। কিন্তু এখানেও গোস্বামীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানিনী রাধার ক্রোধ দূর হওয়ার পর তিনি সখীদের বলেন যমুনার জল এনে কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে দিতে ও কৃষ্ণের সখা বিদূষক ভোজনপ্রিয় মধু মঙ্গলকে দধি ও ওদন ভোজন করাতে। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে কবি জ্ঞানদাস রাধার হৃদয় বেদনা ও বিরহ যন্ত্রণা বর্ণনায় একদিকে আলঙ্কারিক রীতি ও অন্যদিকে চণ্ডীদাসের সহজ সরল অন্তরিক রীতির মিলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি জ্ঞানদাস সম্পর্কে বলা যায়—তিনি মধ্যযুগের বাংলা পদাবলি সাহিত্যে শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেরই এক বিশিষ্ট কবি।

অনন্ত দাস

এই কবি অদ্বৈত শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। এঁর রচিত দুটি গোষ্ঠলীলার পদ রয়েছে। একটিতে গোষ্ঠবেশে সজ্জিত কৃষ্ণের জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। অন্যটিতে কৃষ্ণ এবং তার সখাগণের নানাবিধ ক্রীড়ার যে বর্ণনা রয়েছে তা ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবির দক্ষতা অনস্বীকার্য। শ্রীরাধা অপরিতি কৃষ্ণকে প্রথম দিন দেখেই বলেন—

কি হেরুলুঁ কদম্বতলাতে
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে

শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় কবিকল্পনা বৈচিত্র্য লাভ করেছে। যখন রাধা বলেছেন—'হাসির হিল্লোলে মোর পরাণপুতলী দোলে।' কৃষ্ণের মধুর হাসি যেন তরল হয়ে রাধার অস্তিত্বের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আর সেই হাসির তরঙ্গ দোলায় নব অনুরাগিনী রাধার হৃদয় দুলে দুলে ওঠে। কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় প্রথাসিদ্ধতার মাঝখানেই কবি একসময় বলে ওঠেন—

নীরে নিরখি রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর।।

তখন নিজ রূপের মাধুর্যে বিভোর এই কৃষ্ণের সাথ ললিত মাধব নাটকের কৃষ্ণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই কবির রাধারূপ বর্ণনা এত জীবন্ত নয়। এর কারণ হয়ত রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের প্রতি কবি অধিকতর আকর্ষণ।

এই কবির অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়ে অনরাগিনী প্রেমবর্তী নায়িকার আর্তি ও ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে নি। কবি রাধার রূপ ও চলনভঙ্গিমার বর্ণনাতেই ব্যপ্ত হয়ে পড়েছেন। অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে, বহু কষ্ট স্বীকার করে রাধা যখন দেখেন কৃষ্ণ নেই, তখন বিপ্রলব্ধা নায়িকার বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তিনি সমগ্র পুরুষ জাতিকেই নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করেন। এরপর কৃষ্ণ এসে রাধার কাছে মিনতি করলে খণ্ডিতা রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। এখানে রাধার মান সহেতু। প্রিয়জনের গাত্রে রতি চিহ্ন দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় কবি শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণিকে অনুসরণ করেছেন। কবি মহারাস, রাসান্তে জলবিহার ও বসন্তরাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বসন্তরাসে জয়দেবের প্রভাব পড়েনি। কবি একটি পদে মিলনান্তে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভাবোন্মত্ত সপার্ষদ গৌরাঙ্গের কীর্তনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কবির শীতকালীন মাথুরে রাধার বিরহবেদনা তুহিন পবনের সাথে মিশে রাধার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলেছে। ভাবোল্লাসের পদে রাধার ভাবী মিলনের চিত্রকল্পনা বড় করুণ। তারপর সখী যখন আবার রাধাকে মিলনানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাধার আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্ভরতাময় ঐকান্তিক ভালবাসা প্রকাশিত হয় প্রকৃতি জগৎ থেকে সংগ্রহ করা একটি উপমায়—

দারুণ শিশিরে পদুমিনী জনু
জীবনে মরিয়াছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকশিতভেল।।

যদুনন্দন (দাস)

যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতকের অনুবাদাশ্রয়ী কবিদের মধ্যে প্রধান। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মালিহাটির বৈদ্য পরিবারে এর জন্ম হয়। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কাছে দীক্ষা নিলেও শ্রীনিবাসকেই ইনি গুরু বলে মনে করতেন। যদুনন্দন রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের, 'দানকেলি কৌমুদী' নামক ভাণিকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্যের এবং বিশ্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের অনুবাদ করেন। এগুলির নাম তাঁর অনুবাদে যথাক্রমে রসকদম্ব, দানলীলা চন্দ্রামৃত, গোবিন্দবিলাস ও কৃষ্ণকর্ণামৃত' এছাড়াও তিনি 'কর্ণামৃত' নামে একটি বিখ্যাত জীবনীজাতীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলিতে সঙ্কলিত পদসমূহকেই আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি।

যদুনন্দন রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে ললিতা রাধার বিষণ্ণমুখ, ম্লান শরীর ও অন্যমনস্কতা দেখে জিজ্ঞাসা করেন—

এমন হইলা কি লাগিয়া।
ন কহিলে ফাটি যায় হিয়া।

বৈষ্ণবসাহিত্যে সখীদের যে ভূমিকা, এখানে তারই প্রকাশ ঘটেছে। সখীরা নিছক সাহায্যকারিনী নয়। রাধার প্রতি সখীর ভালবাসাও সুগভীর ও আন্তরিক। ললিতার প্রশ্নের উত্তরে রাধা কাদ্মববন থেকে আসা মধুর শব্দের কথা বললে, ললিতা বললেন যে এটি মোহন বাঁশীর শব্দ। এতে এত বিমোহিত হওয়ার কারণ কি? উত্তরে রাধা বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়ার যে বর্ণনা দেন, তা কবির গভীরতম অনুভূতি ও উচ্চতর কাব্যপ্রতিভার পরিচায়ক—

রাই কহে কেবা হন মুরলী বাজায় সেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া।।
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ম অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর।।'

বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্বরাগ একটি পুরাতন বিষয়। এটিকে অবলম্বন করে বহু শক্তিশালী কবি পদ রচনা করেছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে রাধার মানসিক অনুভূতির সমত্ব ও রাধার বিভ্রান্ত ব্যাকুলতার বর্ণনায় কবি মৌলিক। এইভাবে বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই প্রথানুগত পকরণের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়েও কৃষ্মকথায় নানাভাবে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন।

এছাড়াও যদুনন্দন কৃষ্মের নাম শ্রবণে ও চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথা বর্ণনা করেছেন। কৃষ্মের রূপ বর্ণনার একটি পদে রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদাবলির একটি শ্লোকের ভাব বিস্তৃত হয়েছে।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদে সখি কৃষ্মের কাছে গিয়ে রাধার অবস্থা বর্ণনা করেন। কৃষ্মনুরাগিনী রাধা কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন। আবার কখনও কৃষ্মের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কখনও সহচরীকে জড়িয়ে ধরে 'হরি, হরি' বলেন। রাধার এই অবস্থা কিছুটা গীতগোবিন্দের ষষ্ঠ সর্গের বিরহিনী রাধার অনুরূপ। বিশেষত 'দিশি দিশি হেরই তোয়'; পশ্যতি দিশি দিশি রহমি ভবন্তম্'—এরই অনুবাদ।

এই কবির পদে রাধা যেমন কৃষ্মের নামটুকুই শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ম ও রাধার নাম শুনেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত। প্রেমের আর এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ম তাঁর সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সারা পৃথিবীতে এমনকি আকাশেও সর্বত্রই কেবল রাধামুখ প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষ্মের রাধাপ্রেম চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কিন্তু কৃষ্মের এই সর্বত্র রাধাকে দেখতে পাওয়া যদুনন্দনের মৌলিক সৃষ্টি। যদুনন্দনের পদে রাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রবলীর উল্লেখ আছে। উৎকণ্ঠিতা, মলিনমুখী রাধা বসে বসে কৃষ্ম বিরহে চোখের জল ফেলছেন। সেখানে গিয়ে দূতী বললেন, যার নাম রাধা সহ্য করতে পারেন না, সেই চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ম বিহার

করছেন। শ্রীরাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁর মানভঞ্জন এই কবির পদে গতানুগতিক। গোষ্ঠলীলার একটি পদে কবির যমুনা বর্ণনা বড়ো মনোরম ও গতানুগতিকতামুক্ত—

ভাগ্যবতী যমুনা মাঈ।
যার এ কুলে ও কূলে ধাওয়া ধাই।।
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই।।

যদুনন্দন দানকেলিকৌমুদির কিছু বিষয় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীসৃষ্ট পৌর্ণমাসী চরিত্রকে নিয়ে যদুনন্দন একটি পদ রচনা করেছেন। পদটিতে বর্ষীয়সী স্নেহময়ী দেব পৌর্ণমাসীর চরিত্রটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বড়াই-র ছায়ানুসরণে চরিত্রটি সৃষ্ট হলেও, স্বরূপত কতখানি পৃথক তা যদুনন্দনের পদ থেকে বোঝা যায়।

এই কবির অন্য একটি পদে দেখা যায়, জটিলার গৃহে পূজা হবে, জটিলা পুরোহিত আনতে বললেন। কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা সুভদ্রের স্ত্রী কুন্দলতা ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে পুরোহিত সাজিয়ে আনলেন। কৃষ্ণ পূজা করার পর জটিলা দক্ষিণা দিতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ—

তেঁহো কহে কার্য্য নাই
তোমা সভার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল।।

এই কাহিনীতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। এটিও রূপ গোস্বামীর নাটকে ও গোবিন্দ লীলামৃতে রয়েছে। যদুনন্দনের একটি পদে রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা বর্ণিত। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা নিয়েও কবি পদ রচনা করেছেন। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তবে একটি পদে রয়েছে, কৃষ্ণ প্রিয়তম দাম, শ্রীদাম আর হলধরের সঙ্গে মথুরা যাবেন। সম্ভবত রূপ গোস্বামীর নাটক ও গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদ করার জন্য তাঁর পদাবলিতেও এগুলির প্রভাব বেশি পরিমাণে পড়েছে।

মাধব আচার্য্য (দাস)

কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতাকে কেউ শ্রীচৈতন্যের শ্যালক, কেউবা খুড়তুতো শালা বলেছেন। কিন্তু মাধব আচার্য্য স্বয়ং লিখেছেন—"সব অবতার শেষ করিল পরবেশ।/শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ।/প্রেমভক্তিরস করেন প্রকাশ।/কহে দ্বিজ মাধব তাহার দাসের দাস।।"

দাসের দাস বলতে শ্রীচৈতন্যের কোন পরিকরের শিষ্য বোঝায়। দেবকীনন্দন তাঁর বৈষ্ণবন্দনায় এঁর উল্লেখ করে লিখেছেন—"মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।/যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।।"

বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মধ্যে রঘুনাথ ভগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ও পরমানন্দ নামক এক কবির রচনা ঢুকে গেছে। মাধব আচার্য্যের কয়েকটি গীত খুব সুন্দর।

৭.৫ চরিতকাব্য

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চরিতকাব্যগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একদিকে জীবনীমূল্য, অন্যদিকে কাব্যমূল্য। এগুলি নিছক Biography নয়, Hagiography, অর্থাৎ সন্ত জীবনী শ্রেণীর। রক্তমাংসের সাধু নিমাই পণ্ডিতের পাশাপাশি

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ ভাবব্যাকুল শ্রীচৈতন্যকেও এসমস্ত গ্রন্থে পাওয়া গেল। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ। সমাজ-ইতিহাসের বহু উপাদানে এগুলি পরিপূর্ণ। এধরনের চরিতকাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, চূড়ামণি দাস প্রমুখকবি। গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

৭.৫.১ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণ্য জীবনী লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস। এঁর কাব্যের নাম প্রথমে ছিল চৈতন্যমঙ্গল। পরে সে নাম পরিবর্তন করে রাখা চৈতন্যভাগবত। এ সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' নামক বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক কাব্যে বলা হয়েছে—

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।/বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল।। নতুন নামটিই কাব্যভাবের সঙ্গে সু-প্রযুক্ত। কারণ বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলার কাহিনী বিন্যাসে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা বর্ণনার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাব্যের মধ্যে তিনি তাঁর জননী এবং গুরুর নামোল্লেখ করেছেন। এর থেকে জানা যায়, নারায়ণী ছিলেন তাঁর মাতা, আর কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শেষজীবনের শিষ্য। নারায়ণী চৈতন্য পার্ষদ শ্রীবাদ পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। সম্ভভবত ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে পারেননি। তাই তিনি সখেদে বলেছেন—হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।/হইয়াও বঞ্চিত সে লীলা দরশনে।

তহলেও বৃন্দাবনের রচনায় মহাপ্রভুর গৌড়লীলার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়, কারণ অন্তরঙ্গতম প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য আহরণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কবি জানিয়েছেন—নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি চৈতন্য জীবন বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, জননী নারায়ণী এবং শ্রীবাস প্রভৃতির কাছ থেকে বৃন্দাবন দাস তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে গৌড়লীলা বর্ণনা যেমন প্রামাণ্য হয়েছে, তেমনি হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ। তাছাড়া গৌর জীবন কেন্দ্রেই চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃন্দাবনের প্রতিভার মধ্যে ঐতিহাসিকোচিত পরিবেশ সচেতনতা ছিল গভীর। ফলে চৈতন্যলীলার পটভূমি স্বরূপ নবদ্বীপের অবস্থান, এবং সেখানকার সামাজিক ও নৈতিক আচার অনুষ্ঠানেরও খুঁটিনাটি পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপ বর্ণন বিশেষ মূল্যবান। তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের একটি অখণ্ড প্রতিরূপ যেন চুম্বক আকারে চিহ্নিত হয়েছে এখানে—নবদ্বীপ সম্পাত্তিকে বর্ণিবারে পারে।/এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ থেকে লোক স্নান করে।/কৃষ্ণ নামভক্তিশূন্য সকল সংসার।/প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার।।/ধমকর্ম লোকসভে এই মাত্র জানে।/মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।/দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনজন।/পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহুধন।।/ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।/এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের মোহানায়, বিশেষ করে হোসেন শাহার রাজত্বকালের প্রথম বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদান এখানে অনেকটাই পাওয়া যায়। নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসের ঘরে অথবা নিজের ঘরে ভক্তদের নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত্য নামকীর্ত্তন করেন। তাতে পাড়ার লোকের অনেকের বিরক্তি জন্মেছিল। বৃন্দাবন দাস তাঁর বর্ণনাও দিয়েছেন। নবদ্বীপের লোকেরা এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিল। তাদের রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাতের জন্য বিরক্ত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মুসলমান রাজার অত্যাচারের ভয়েও সন্ত্রস্ত হয়েছিল। মুসলমান শাসকদের

হিন্দু বিদ্বেষও এই গ্রন্থে প্রকাশিত। চৈতন্যের ভক্ত হরিদাসের প্রতি মুলুক পতির উক্তি—কত ভাগ্যে তুমি দেখ ইয়াছ যবন/তবে কেন হিন্দুর দেহ মন।/আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত/তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।।

বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যটি আবৃত্তি ও গান করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। এই কবির সংস্কৃত জ্ঞান ছিল এবং তিনি ভাগবত খুব ভালো করেই পড়েছিলেন। ভাগবত ও অন্যান্য দু-একটি পুরাণ থেকেও তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দকে বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণ বলরামের অবতার রূপে দেখেছিলেন। এবং সেভাবেই এঁদের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। নিত্যানন্দের সমালোচকদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। নিত্যানন্দ অনেক অব্রাহ্মণকে নিজের অনুচর করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও জাতিবিচার করতেন না বলে অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন না। এঁদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে/তবে লাথি মারো তাঁর শিবের উপরে।

চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার বর্ণনায় কবির সহজ সরল বাস্তবস্পর্শী বর্ণনা ভঙ্গী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সভায় প্রত্যেকদিন গীতা ভাগবত পড়তে যেতেন। বিশ্বরূপের আসতে দেরি হলে শচী শিশু চৈতন্যকে পাঠাতেন ভাত খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে। এই ধরনের একটি দিনের শিশু বিশ্বম্ভরের ছবি বৃন্দাবনের তুলিকায় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত—রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে/তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে।/মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়/প্রভু আইসেন জৈষ্ঠ নিবার ছলায়।/দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর/হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর।/ভোজনে আইসহ ভাই ডাকয়ে জননী।/অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি।

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস খুব সংক্ষেপেই দিয়েছেন। কিন্তু সেই বর্ণনাও মানুষ চৈতন্যের পরিচয় দীপ্ত। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ, শচীদেবী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ—এই কজনের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে খোলাবেচা শ্রীধর তাঁকে একটি লাউ উপহার দিয়েছিল, সেই লাউ তিনি শচীমাতাকে রন্ধন করতে বলেন। গৃহত্যাগের আগে অশ্রুমুখী জননীকে তিনি বলেন—দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার/আমি কোটি কল্পেও নারির শোধিবার। কিন্তু মা শচীদেবী প্রবোধ মানেন না—যত কিছু বোলে প্রভু সব শচী শুনে/উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে।

এইভাবে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে মায়ের মর্মান্তিক বেদনা বৃন্দাবন দাসের কাব্যে নিবিড় আন্তরিকতায় চিত্রিত।

অবশ্য অবতার শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক কিছু কিছু ব্যাপারও তাঁর কাব্যে ভক্তির অনিবার্য আবেগেই এসে গেছে। যেমন—নিমাইর বরাহ অবতার ধারণ প্রসঙ্গ। চৈতন্য ভাগবতের সমাপ্তিতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার বর্ণনা নেই। পরবর্তী চৈতন্যজীবনী রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজই বিস্তৃতভাবে অন্ত্যলীলা বর্ণনা করেছেন।

৭.৫.২ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

লোচনদাসের চৈনত্যমঙ্গল কাব্যটি সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।/বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোরম নিবাস।/মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।/যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।।/কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।

১৫৫০-৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে চারটি খণ্ড আছে—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড। এটি এগার হাজার ছত্রে রচিত। অল্পশিক্ষিত সমাজে গান করার জন্যই কবি এটি রচনা করেছেন। এর রাগরাগিনীর ব্যবহার আছে কিন্তু সর্গবিভাগ নেই। এটির রচনা ধারা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের মত। সূত্র খণ্ডটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের মতো। এতে স্বর্গের কাহিনীও চৈতন্যাবতারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে মঙ্গলকাব্যের মতো গণেশ,

হরপার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবী বন্দনা ও গুরু নরহরি দাসের বন্দনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের স্বয়ং চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ ও অন্যান্য অনুচরদের বর্ণনাও এখানে আছে। চৈতন্য অবতারের পটভূমি প্রমাণ হিসেবে কবি ভাগবত ব্রহ্ম সংহিতা, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র মহাভাগবত প্রভৃতি অনুসরণ করেছেন। লোচনদাসের গুরু নরহরি দাস নদীয়া নাগর ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। লোচনের কাব্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া নাগর ভাবের বর্ণনা রয়েছে।

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের নদীয়ালীলা ও উৎকললীলা বর্ণিত। নবদ্বীপে মহিমাপ্রকাশ, ভক্তদের আগমন ও চৈতন্যের সঙ্গে মিলন বর্ণিত। এখানে চৈতন্যদেব ভাগবতের কৃষ্ণের মতো লীলা করেছেন। এই সমস্ত বর্ণনায় লোচনদাস ইতিহাসকে অস্বীকারই করেছেন বলা যায়।

শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভ্রমণ এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তন, পরে একবার গৌড় ঘুরে আবার নীলাচলে অবস্থান এবং অবশেষে চৈতন্যের অলৌকিক তিরোধান বর্ণিত।

গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্যজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা এই অংশে আছে। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে কবি বলেছেন যে ইনি জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে যান। চৈতন্যজীবনী ছাড়াও লোচনদাস দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, বস্তুতত্ত্বসার প্রভৃতি পুস্তিকায় সহজিয়া ধরনের রাগানুগা পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে উড়িয়া কবি মাধবের চৈতন্যবিলাস অবলম্বনে লোচনদাস চৈতন্যের সন্ন্যাস সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৭.৫.৩ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম এই গ্রন্থের পরিচয় দেন। ১৩১২ সনে কালিদাস নাথের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। কাব্যের সন্ন্যাসখণ্ডে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী। তাঁর জন্ম বর্ধমানের কাছাকাছি আমাইপুরা গ্রামে। সম্ভবত ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কবি তাঁর কাব্যরচনা করেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবসমাজে এই গ্রন্থ নানা কারণে জনপ্রিয় হয়নি। এই কাব্য নয়টি পালাগানে বিভক্ত। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সব রকমের গণশ্রোতার উদ্দেশ্যে রচিত ও গেয়। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য নিয়মে গণেশবন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু। জয়ানন্দ চৈতন্যলীলা বর্ণনায় পূর্বসুরী হিসেবে 'চৈতন্যসহস্র নাম' স্তোত্র প্রণেতা সার্বভৌম ভট্টাচার্য, চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস। চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা, গোপাল বসু (অপ্রাপ্ত) এবং 'গোবিন্দ দাস বিজয়গীত' রচয়িতা (অপ্রাপ্ত) পরমানন্দ গুপ্তর উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্যমঙ্গল শোনা কথা ও বানানো গল্পের আকর। সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক অবাস্তব কথা বলা হয়েছে। আদি খণ্ডে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র—

বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস-মাংসে প্রিয়. হৈল বিধবা যুবতী।।
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
দুই তিন চারি বর্ণে হইল একাকার।।

নদীয়া খণ্ডে চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের বর্ণনা, নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে বাস্তুনির্মাণ, নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমান সুলতানের কিছু অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বৈরাগ্য খণ্ড। এর মূল ঘটনা চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়াস। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ধ্রুবের আখ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা অনেকটা অংশ অধিকার করে আছে। এই অংশেই বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীমাতার বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা বর্ণনায় কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। 'সন্ন্যাসখণ্ডে' কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে গৌরাঙ্গের

সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা এবং কাটোয়া থেকে শান্তিপুর যাত্রার কথা এবং 'উৎকলখণ্ডে' নীলাচলে মহাপ্রভুর উপস্থিতির কথা বর্ণিত হয়েছে। 'প্রকাশখণ্ড' ও 'তীর্থখণ্ডে' জগন্নাথের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কন্যা সত্যবতীর বিবাহের আখ্যানের বিস্তৃত পরিচয় আছে। 'বিজয়খণ্ডে' পতিব্রতা পত্নীতুলসী এবং বিষ্ণু কর্তৃক তুলসীকে ছলনার গল্পটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, অজামিল, মহাপ্রভুর নদীয়ায় আগমন এবং পুনরায় উৎকলে প্রত্যাবর্তন—পরে নিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণিত।

জয়ানন্দ কিছু কিছু নতুন তথ্যও তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। (১) চৈতন্যের জন্ম সন্ধ্যায় চাঁদের পূর্ণগ্রহণ ছিল। (২) চৈতন্য তিরোভাব ঘটেছিল 'আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা'তে। (৩) যবন হরিদাসের নিবাস ছিল বুঢ়ণ পরগণার ভাটকলাগাছি গাঁয়ে পিতার নাম মনোহর, মাতার নাম উজ্জ্বলা। (৪) যবন হরিদাসের মৃত্যু হয় ১৪৫৫ শকের 'ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশীর উদয় লগ্নে (৯ই মার্চ, ১৫৩৩)। (৫) চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য নিয়েছিলেন ১৪৩৭ শকের জৈষ্ঠমাসে। (৬) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে সব স্থান জয়ানন্দ পর্যটন করেছিলেন, তাদের সঠিক বিবরণ মেলে এই কাব্যে। (৭) চৈতন্য জন্মের অব্যবহিত আগে গৌড় নবদ্বীপে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। (৮) উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র শত্রুতা ছিল। প্রতাপরুদ্রকে গৌড় সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। (৯) এছাড়া জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর লৌকিক কারণ বর্ণনা করেছেন—আষাঢ় পঞ্চমী রথবিজয় নাচিতে/ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে।/...চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে/ সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।/পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল জয়ানন্দই বিচ্ছেদ কাতরা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে 'বারমাস্যা' বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে শচীর বিলাপ ও স্ত্রীর বারমাস্যা কারুণ্য নির্ভর।

চৈতন্যের আবির্ভাব মুহূর্তে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাও জয়ানন্দের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লএ তারে জাতিনাশ করে।।
****
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার সুটে তার লৌহ পাশে বান্ধে।।

৭.৫.৪ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যচরিতামৃত কেবল চৈতন্যলীলার বর্ণনা গ্রন্থ হিসেবে নয়, বৈষ্ণব তত্ত্ব গ্রন্থ হিসেবেও সমাদৃত। তত্ত্বশাস্ত্রের আকররূপে একটি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব আর মর্যাদা পেয়েছে। এই গ্রন্থে অবতার চৈতন্যের মর্তলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব উচ্চ দার্শনিক সূক্ষ্মতায় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। চৈতন্যদেবের বস্তুগত তথ্যবহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সংকলন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তাঁর আগে চৈতন্যদেবের অন্তত তিনটি বাংলা জীবনীকাব্য এবং তিনখানি সংস্কৃত জীবনী (কাব্য ও নাটক) রচিত হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থেই নিজের পরিচয় কিছুটা দিয়েছিলেন, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নৈহাটি গ্রামের কাছে ঝামটপুরে কবির বাস ছিল। কবি তাঁর বাড়ীতে নাম সংকীর্তন করতেন। কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়ের প্রতিই ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছোটভাই নিত্যানন্দ বিরোধী ছিলেন। চিরকুমার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

আদি ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সে অনুমান করেছেন ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। কিন্তু এই সাল তারিখ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের সব ঘটনা প্রামাণ্য নয়। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্ভবনে চৈতন্য জীবনীকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যে চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্যজীবনাদর্শ বর্ণনায় ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষিত হয়নি। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর এই মহাগ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ রচনারকাল নিয়েও আবার নানা বিতর্ক আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের ছাপা সংস্করণের শেষ গ্রন্থ—সমাপ্তিসূচক একটি সংস্কৃত শ্লোক—

শক সিন্ধ্যাগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্যসিত পঞ্চম্যাং ্রন্থোহয়ৎ পূর্ণতাংগত।।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই শ্লোক থেকে স্থির করেছেন যে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের অর্থাৎ ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে পঞ্চমী কৃষ্ণাতিথিতে রবিবার বইটি শেষ হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। বৃন্দাবনের গ্রন্থ থেকে ভক্ত বৈষ্ণবদের চৈতন্যজীবনী সম্পর্কে কৌতুহল চরিতার্থ হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়নি। কৃষ্ণদাস সেই অন্ত্যলীলাকেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃত দিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস বলেছেন যে, বৃন্দাবন দাসের "নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে হৈল আবেশ" আর সেই কারণেই "চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ"। এই অন্ত্যলীলা শোনার জন্যেই বৃন্দাবনের ভক্তরা কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করলে তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হন।

এই মহাগ্রন্থ রচনায় স্বরূপ দামোদর ও মুরারিগুপ্তের গ্রন্থের বহু উপাদান কৃষ্ণদাস ব্যবহার করেছেন। বৃন্দাবন দাস যে সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন কবি সেগুলিকে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণদাস বিবৃতিমূলক জীবনী রচনা করতে চাননি। চৈতন্যজীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্ব। চৈতন্য শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সমার্কেই তিনি বেশি আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের নয়, ভক্ত দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনটি খণ্ড আছে। আদিলীলা মোট সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কৈশোরকাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত।

মধ্যলীলায় মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে নিজের মতে আনা, দক্ষিণ-ভারতে যাত্রা, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর আবার নীলাচালে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন ধামকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা, এই লীলায় বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বর্ণনা প্রায় নেই বলা যায়, আর বৃন্দাবন পরিক্রমাও খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের এই ঘাটতিগুলো পূরণ করেছেন।

মধ্য পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার ও তাঁকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনা, অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আলোচনা, এছাড়াও বিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্বতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ঘটনাগুলি সেভাবে ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বাসুদেব সার্বভৌমের ঘটনা সম্পর্কে বলা যায় যে বাসুদেব তর্কে পরাস্ত হয়েই চৈতন্যের মত গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। চৈতন্যদেবের শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করাই এই অংশটি রচনার উদ্দেশ্য। এই খণ্ডের কুড়িটি অধ্যায়ের মধ্যে শেষে সাতটি অধ্যায়ে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তদের মনে চৈতন্যের শেষ জীবনের আপার্থির লীলাকাহিনী শোনার যে বাসনা ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে বাসনা পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করেছেন। চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, ভাববিকার আর কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত সত্তার বিলুপ্তি বর্ণনার জন্য প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার প্রয়োজন। কৃষ্ণদাসের মধ্যে সেই প্রতিভা ছিল।

চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাসের একমাত্র গ্রন্থ নয়। এর আগে তিনি আরও দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি ছিল রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা সংক্রান্ত কাব্য গোবিন্দলীলামৃত এবং আর একটি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা'। চৈতন্যচরিতামৃত কবির একেবারেই বৃদ্ধ বয়সের রচনা। এর মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ আছে, বিশেষ করে আবেগ-ব্যাকুল ত্রিপদীগুলির কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। কবির অলঙ্কার ব্যবহার ও স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ভক্তিরসে স্নাত—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে নালুকায় অন্য দাগে—
শুল্ক বস্ত্র যৈছে মসীবিন্দু।।

এছাড়াও গদ্যভাষার সাহায্য না নিয়ে ছন্দে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা কৃষ্ণদাসের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। দুরূহ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যার সময় তিনি যথাসম্ভব পরিমিত, স্বল্পাক্ষর, গাঢ় বাক্ বন্ধ ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় বাঙালির মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এমন বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগেও দুর্লভ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বৈষ্ণব বিনয়ের বহু পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরধর্মের অপকর্মও তিনি দেখিয়েছেন। ইসলামের, বৌদ্ধধর্মের এবং শংকর, মাধব প্রভৃতির মতবাদের নিন্দায় তিনি মুখর। চৈতন্যবতারে অবিশ্বাসী পামর-পাষণ্ডের তিনি দৈত্য ও অসুর বলেও গাল দিয়েছেন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে মনে হয় ভক্ষ্যদ্রব্য বর্ণনা করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আহার্য বিষয় থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন, অদ্বৈত গৃহে, জগন্নাথের প্রসাদরূপে এবং সার্বভৌমগৃহে চৈতন্যের ভোজ্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মত কৃষ্ণদাস কবিরাজও মুসলিম শাসকদের হিন্দুপীড়নের কথা অথবা হিন্দুর ধর্মের প্রতি তাদের অবজ্ঞার কথা বলেছেন। কিন্তু মনে হয় সাধারণ মুসলমানসমাজ ও হিন্দুসমাজের সম্পর্ক এমন ছিল বলে মনে হয় না।

৭.৫.৫ চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুরো পুঁথিটি পাওয়া যায় নি। এটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। এই গ্রন্থের লেখক চূড়ামণিদাস ৯টি বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য চৈতন্যজীবনীর মতো এটিতেও চৈতন্যের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা আছে। কবি বলেছেন—

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব
গৌরাঙ্গবিজয় তিনখণ্ডে পূর্ণ হৈব।

এতে ভক্তির আবেশ ও আতিশয্য প্রায় নেই বললেই চলে। তাই হয়তো সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে এটি সমাদৃত হয়নি এবং এর প্রচারও ঘটেনি।

চূড়ামণি দাস ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্যরচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁর গুরু ছিলেন। নিত্যনন্দের যে বারোজন ভক্ত দ্বাদশ গোপাল নামে বিখ্যাত ছিলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁদের অন্যতম। চূড়ামণি দাস তাঁর গুরুর কাছ থেকেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনীবিষয়ক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

কাব্যের সামান্য অংশ থেকে অল্প কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—মাধবেন্দ্র চৈতন্যের উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু এগুলি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

চৈতন্য জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধরা আনন্দিত হয়েছিল বলে চূড়ামণি দাস উল্লেখ করেছেন। সেজন্য কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তখন বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। আসলে যক্ষ, বাশুলী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবতার পূজারীদের, আর সেইসঙ্গে যোগী তান্ত্রিকদেরই তিনি বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন বলে মনে হয়।

৭.৫.৬ গোবিন্দদাসের কড়চা

জয়গোপাল গোস্বামী নামে অদ্বৈত আচার্যের বংশধর একজন শিক্ষক ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক একটি চৈতন্যজীবনী প্রকাশ করেন। কিন্তু এরপর দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শস্ত্রী, মতিলাল ঘোষ, জগদ্বন্ধু ভদ্র, নলিনীকান্ত ঘোষ, বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি 'গোবিন্দদাসের কড়চা'-কে অকৃত্রিম চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ বলে মানতে চাননি। কারও কারও মতে এটি জাল গ্রন্থ।

জীবনীগ্রন্থে আছে গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের খড়ী খড়ম বাহক অনুচর ছিলেন।

৭.৬ অনুবাদকাব্য

আলোচ্য কালপর্বের অনুবাদকাব্যের শাখাটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ত্রয়ী কাব্যের অনুবাদকর্মেই অনুবাদকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের অনুবাদ করেছেন অদ্ভুত আচার্য ও চন্দ্রাবতী। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাসের আবির্ভাব ঘটেছে। তুলনায় ভাগবত অনুবাদকদেরই সংখ্যাধিক্য।

৭.৬.১ অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ

কবি কৃত্তিবাসের পর চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট কবি অদ্ভুতাচার্য। আদ্যকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কবি জানিয়েছেন তিনি রামচন্দ্রের নির্দেশে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—

"প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।/অদ্ভুত নাম হইল সে কারণ।।" নানা সূত্র থেকে পাওয়া পুঁথির পাঠ মিলিয়ে জানা যায়—আত্রেয়ীর উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিমে সোনাবাজু পরগণার বড়বাড়ি বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবির জন্ম হয়েছিল। স্থানটি বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলায় অবস্থিত। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য), মাতা মেনকাদেবী। কথিত আছে সাত বছর বয়সে কবি রামচন্দ্রের কাছ

থেকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ পান, এবং হস্তস্থিত শরাগ্রে তাঁর জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। কবি অল্প বয়সে রচনা সমাপ্ত করেন, এই অদ্ভুত কৃতিত্বের জন্য তাঁর নতুন খ্যাতি হয় অদ্ভুতাচার্য।

নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্যের আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ইনি আকবরের সমসাময়িক ষোড়শ শতব্দীর কবি। সুকুমার সেনের মতে, "সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য! সুতরাং কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ।" অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেছেন, কবির ভ্রাতা, বেদানন্দের প্রপৌত্রী শর্বানীর স্বামী ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণ। আবার ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শর্বানী অন্ধ হয়ে পড়ায় রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এবিষয়ে দলিলগত প্রমাণ মণীন্দ্রমোহন বসু দিয়েছেন। তিনপুরুষে এক শতাব্দী হিসেব করে তিনি অনুমান করেছেন। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি। ১৩২০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে কবির রামায়ণের আদ্যকাণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন কাণ্ডের বিচ্ছিন্ন পুঁথি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী একসময়ে অদ্ভুতচার্যের কাব্যমূল্য নির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তুলনার চেষ্টাও করেছিলেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে কৃত্তিবাসের অনুবাদ বাল্মীকি অনুসারী, অপরপক্ষে অদ্ভুতাচার্য বৈচিত্র্য রসপিয়াসী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'বশিষ্ঠ রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া বাঙালি জীবন বাসনার অনুকূল বিচিত্র গল্পও তিতিন রচনা করেছিলেন। আজ কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার মূলে আছে ঐ বৈচিত্র্য এবং জীবনানুগত্য। ড. ভট্টশালী সিদ্ধান্ত করেছিলেন কৃত্তিবাসের জনচিত্তহারী সংবেদনার একমুখ্য অংশ অদ্ভুতাচার্যের দান।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রাপ্ত অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য উপাদান অদ্ভুতাচার্যের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। হতে পারে, অদ্ভুতাচার্যের পুঁথিতে বাঙালি জীবনরস ও বিচিত্র সংস্কৃত কাব্যকথার যে সমন্বয় দেখা যায়, তার অনেকখানিই পূর্ব ঐতিহ্য রূপে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু তার পুঁথিগত নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অদ্ভুতাচার্য বাংলা রামায়ণের সেই অবিস্মরণীয় কবি, যাঁর কাব্যপুঁথিতে বাঙালির চিরপ্রিয় বাংলা 'রামায়ণে'র রস-উপাদান প্রামাণিক আকারে সঞ্চিত আছে। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। কৃত্তিবাস সুমিত্রা বিবাহের বর্ণনা করেছেন সংস্কৃত 'রামায়ণ' কাব্যের অনুসরণে। পূর্ববিবাহিতা শ্রেষ্ঠা দুই মহিষী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর কাছে মৃগয়ার ছল করে রাজা দশরথ সুমিত্রা বিবাহে যাত্রা করেন। পরে যখন বিবাহের যথার্থ সংবাদ পাওয়া গেল, কৃত্তিবাসের কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তখন—"নিরবধি পূজে দোঁহে পার্বতী-শঙ্কর।/সুমিত্রা দুর্ভগা হৌক মাগে এই বর।।" কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর এই আচরণ সপত্নী জনোমচিত স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত। ঠিক এই ধরনের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বশেই কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে চরুর ভাগ দেবার সময়ে আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, চারু ভাগ থেকে সুমিত্রার যে দুই সন্তান জন্মাবে, তারা যথাক্রমে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর পুত্রদের দাসত্ব করবে।

অদ্ভুতাচার্য কিন্তু কৌশল্যাকে অন্যরকমভাবে চিত্রিত করছেন। বাঙালির ভাবপ্রবণ স্বভাবের গভীরে অতিলৌকিক যে মাতৃমহিমাবোধ সদা অনুস্যূত হয়েছে তার সঙ্গে কবি কল্পনায় হয়ত মা যশোদার ভাবদর্শের প্রভাবও যুক্ত হয়েছিল। তাই এ যুগের রামচন্দ্র যেমন কানু বল্পনা দ্বারা প্রভাবিত রাম-জননী কৌশল্যাও তেমনি কানু জননী যশোদার ঢল ঢল স্নেহ সুধা সম্মুক্ত হয়েছিলেন, কৌশল্যাকে অদ্ভুতাচার্য জননী মূর্তিতেই অঙ্কন করেছিলেন। সদ্যোবিবাহিতা নববধূ-দুর্ভাগা সুমিত্রা দেহ-মনে শরীত্বের শ্রেষ্ঠ লজ্জা বহন করে কৌতুহলী জনতার উপেক্ষিত দৃষ্টির সম্মুখে যখন আড়ষ্ট

হয়েছিলেন, তখন জননী-কৌশল্যাই বাঙালি মায়ের অসহায় মোহক্ষণ স্নেহষ্টির দ্বারা অভিবিক্ত করে তাঁকে বরণ করে আনলেন লোক-লজ্জার অতীত বাৎসল্য-মধুর অন্তঃপুরে। স্বামী কর্তৃক সুমিত্রার নিগ্রহে ব্যথিতা কৌশল্যা প্রতিজ্ঞা করলেন

"যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রা সদন।
তবে যে দেখিব আমি স্বামীর বদন।
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহ জন্মে স্বামী সঙ্গে শৈব দাশন।।"

সতী শরীর এই আত্মত্যাগের মহিমা অনির্বচনীয়। নিরুপায়ের প্রতি বাৎসল্য-বশেই কৌশল্যা অত বড় স্বার্থ ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করতে পেরেছিলেন। অবশ্য নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পেরেছিলেন। দশরথের সঙ্গে সুমিত্রামিলনের সেই পরম-মুহূর্তে কৌশল্যাকে অদ্ভুতাচার্য-নবরূপ দান করেছেন। সুমিত্রাকে নিজের হাতে সাজিয়ে স্বামিসম্মিলনে পাঠিয়েই কৌশল্যা ক্ষান্ত হননি। বাঙালি শরীর কৌতুক ও কৌতুহল বসে সপত্নীর বাসর ঘরে উঁকি দিতেও গিয়েছিলেন। বাঙালি চেতনার সার্বিক আদর্শ-মহিমাঙ্কনে, বাঙালি জীবনের চাপল্য তরল মহিমাঙ্কণে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছন। 'রামায়ণ' কাহিনীর আর একটি রূপান্তর "শতস্কন্ধ রাবণবধ" নামক পুথি অদ্ভুতাচার্যের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে।

৭.৬.২ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষ, অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। চন্দ্রবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। ময়মনসিংহ গীতিকার 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার উল্লেখ আছে—"শিব পূজা কর আর লেখ রামায়ণে"। বাল্যের খেলার সাথী জয়ানন্দের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহও স্থির ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জয়ানন্দ মুসলমান কন্যা আসমানীর প্রণয়াসক্ত হন, ব্যর্থ-প্রণয়ের পরিমাণে চন্দ্রাবতী কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করেন। জয়ানন্দ পরবর্তীতে অনুতপ্ত চিত্তে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু চন্দ্রবতীর চিত্তের কঠিন বহিরাবরণে প্রতিহত হয় জয়ানন্দের প্রয়াস। জয়ানন্দ নদীর জলে প্রাণ সমর্পণ করেন। চন্দ্রাবতী শিবের আরাধনায় দেহ ত্যাগ করেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের লিখিত কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। চন্দ্রনাথ দে ময়মনসিংহের মহিলা কণ্ঠ থেকে চন্দ্রাবতীর নামে প্রচলিত গান সংগ্রহ করেন। ময়মনসিংহে যখন বর বাসর ঘরে কনের সঙ্গে পাশা খেলে, তখন চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গাওয়া হয়। আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন যবদ্বীপের রামায়ণের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এই রামায়ণের সীতার জন্ম কাহিনী অদ্ভুত রামায়ণের অনুরূপ। বিষপান করে মন্দোদরী ডিম্ব প্রসব করলে তা থেকে সীতার জন্ম হয়।

"এই ডিম্বের কন্যা এক গো লভিবে জনম।
তাহা হইতে রাক্ষস বংশ, হইবে নির্ধন।।

রামের জন্ম কাহিনীও আলাদা। অপুত্রক রাজা দশরথ এক মুনির কাছে থেকে একটি ফল পেয়েছিলেন। সেই ফল রানীরা ভক্ষণ করলে তাদের সন্তান জন্মায়। রামের হরধনু ভঙ্গ থেকে রাবণ বধ-পর্যন্ত কাহিনীর সীতার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সীতা নির্বাসনের কাহিনীটিও অভিনব। কৈকেয়ীর কন্যা কুকুয়াকে

রাবণের পরিচয় দেওয়ার সময় সীতা মাটিতে রাবণের চিত্র অঙ্কন করেন। চিত্রের পাশে শান্তি বশত সীতা ঘুমিয়ে পড়লে কুকুয়া রামচন্দ্রকে বলে

"শুন শুন দাদা ওগো কহি যে তোমারে।
বলিতে পাপের কথা গো, বাক্য নাহি সরে।।
বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো, রাবণ বুকে লইয়া।।"

এই বলে সীতার বনবাসের কারণ। কুকুয়ার কাহিনীর পর আর কোনো অংশ পাওয়া যায় না।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। রামকাহিনীর সুষ্ঠু বিবরণ দেওয়া চন্দ্রাবতীর রামায়ণের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। অনুমিত হয়, বিভিন্ন মেয়েলী অনুষ্ঠানে গান করে শোনানোর জন্য রামায়ণটি রচিত হয়েছে। 'চন্দ্রাবতী' পালা অনুসারে আমরা জানতে পারি প্রণয় জনিত শোকের ভার কমানোর জন্য মানসিক শান্তিলাভের আশায় চন্দ্রাবতী রামায়ণ লিখেছিলেন। তাঁর ট্র্যাজিক জীবন এবং অকালমৃত্যুও রামায়ণটি অসম্পূর্ণ থাকবার অন্যতম কারণ হতে পারে।

সীতার জন্ম কাহিনীর অদ্ভুত রামায়ণের অনুকরণে বিবৃত হলেও কবির মৌলিকতার ছাপ আছে। যেমন— মন্দোদরী গর্ভ থেকে ডিম্ব জন্ম, রাবণ কর্তৃক ডিম্ব সাগরে নিক্ষেপ, জালিয়া পত্নী 'সতা' নামের সাদৃশ্যে সীতা নামকরণ ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে অলৌকিক ও যুক্তি বিহীন ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

কাব্যটির ভাষা আধুনিক। বিষয়বস্তুতে অর্বাচীনতার ছাপ আছে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের ছায়াও কাব্যটিতে সমালোচকরা দেখতে পান। রামায়ণটি 'চন্দ্রাবতী'র রচনা কিনা, সে বিষয়েও সমালোচক প্রসাদ কুমার মাইতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৭.৬.৩ কাশীরাম দাসের মহাভারত

মহাভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। যদিও তিনি আঠারো পর্ব বিশিষ্ট মহাভারতের মাত্র সাড়ে তিনটি পর্বে স্বাধীন অনুবাদ করেছিলেন। তবু কথক, গায়েন ও লিপিকরের আনুকূল্যে তিনি লোকপ্রিয় গোটা মহাভারতের রচয়িতা হিসেবেই গত চারশো বছর ধরে বাঙালি সাধারণের কাছে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কাশীরাম দাসের কাব্য হিসেবেই প্রথম বাংলা মহাভারত মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের পরবর্তী কবি হলেও তাঁর কাল ও পরিচয় নিয়ে কৃত্তিবাসের মতই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কবি মহাভারতের দু এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন, তাঁর অগ্রজ-অনুজেরাও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কাব্য থেকেও কাশীরাম দাস সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবিরা তিনভাই ছিলেন—কৃষ্ণরাম, কাশীরাম ও গদাধর। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কেউ কেউ আবার এই গ্রামকে সিদ্ধি গ্রাম বলেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্রের নাম নন্দরাম দাস। কাশীরামের দু-একটি পুথিতে সাল তারিখ জ্ঞাপক পয়ারের নির্দেশ আছে। তা থেকে যোগেশচন্দ্র"র রাম বিদ্যানিধি ১৬০৪ ও ১৬০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দের ইঙ্গিত পেয়েছেন। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ করা মহাভারতের পুথিও পাওয়া গেছে। সুতরাং মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই কাশীরাম তাঁর মহাভারত রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু কাশীরাম যখনই কাব্যানুবাদ শুরু করুন না কেন, তিনি সম্ভবত গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নি। কারণ কাশীরামের কোন কোন পুথিতে আছে—

আদি, সভা, বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা-স্বর্গপুর।।

সেখানে আরও বলা হয়েছে— কাশীরাম তাঁর কাব্য সম্পূর্ম করার ভাব নিয়ে যান ভ্রাতুস্পুত্র নন্দরামের হাতে। কাশীরাম যে অংশটুকু রচনা করেছেন তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকলেও পরের দিকে অন্যেরা লিখেছেন বলে অনুবাদের মধ্যে নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাহলেও কাশীরামের মহাভারত কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই খ্যাতি লাভ করেছে।

কারও কারও মতে কাশীরামের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল না, সেজন্য তিনি মূল মহাভারত পড়েন নি, কথকদের মুখ থেকে মহাভারতের গল্প শুনে তাই-ই পয়ার ত্রিপদী ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ একান্তই অসঙ্গত বলে মনে হয়। কবির অনুবাদের সঙ্গে মূল মহাভারত মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় কবি সংস্কৃত ভালই জানতেন। এছাড়া মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক যেভাবে তিনি বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে রূপায়িত করেছেন, তাতে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী বলেই মনে হয়। তবে বড় বেশি সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে বলে তাঁর কাব্য কখনও কখনও অত্যন্ত কৃত্রিম ছাপ পড়েছে।

কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে প্রথম চার পর্বে খুব সংক্ষেপে কাহিনী অনুসরণ করেছেন। কখনও কখনও নিজেও দুচারিটি গল্প বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন শ্রীবৎসচিন্তার গল্প মধ্যযুগের অন্যান্য অনুবাদকদের মত কাশীরামের মহাভারত মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বলা চলতে পারে। কবি প্রসন্ন ভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নভাবে কাহিনীটির বিবৃত করেছেন। তবে তাঁর ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃত রীতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর এই অনুবাদকের মহাভারত অনুবাদেও মধ্যযুগের সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যপ্রভাব অনুভব করা যায়। কায়স্থ "দেব" বংশে জন্ম নিয়েও কাশীরাম নিজেকে 'দাস' —কৃষ্ণভক্ত দাসানুদাস রূপে পরিচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সবিনয়ে আত্মনিবেদনে, সমগ্র কাব্যে কবিপ্রাণের এই প্রেমানুরক্তির স্পর্শ বিকীর্ণ হয়েছে,—ফলে মহাভারতের বীর্যগাথা সবারুণ মূর্ছনায় নবীন মধুর রূপ লাভ করেছে। কাশীরামের রচনা চৈতন্যোত্তর বাংলা প্রেম ভক্তি-রসে সমাকুল বলেই, বাঙালির আনন্দের হাসি এবং বেদনার অশ্রুকে তা একসূত্রে গেঁথে তুলেছে। কাশীরামের তাঁর ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থন নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংনীয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে অর্জুনের রূপবর্ণনা উল্লেখ করা যায়—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
সিংহগ্রীর বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।।

এছাড়াও তাঁর কাব্যের দু একটি জায়গায় বাঙালির ঘরের কথা যেন দু একটি রেখার টানে ফুটে উঠেছে। সভাপর্বে দ্রৌপদী, আর হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হয়েছ, তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দু সতীনের কলহের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

৭.৬.৪ রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ম প্রেমতরঙ্গিণী

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে মালাধর বসু একমাত্র ভাগবত অনুবাদক। আর চৈতন্যের কালে ভাগবত অনুবাদকের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ম প্রেমতরঙ্গিণী' রচয়িতা রঘুনাথ ভগবতাচার্য্য অগ্রগণ্য।

গ্রন্থের মধ্যে রঘুনাথ আত্মপরিচয় বিশেষভাবে কোথাও দেননি। ভণিতায় বেশির ভাগ সময়েই ব্যবহার করেছেন ভাগবতাচার্য উপাধি। মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় নিজের রঘুপণ্ডিত নামটি ব্যবহার করেছেন।

চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেব গৌড় থেকে পুরীধামে ফেরার সময় বরাহনগরে রঘুনাথ নামে এক বৈষ্ণব বিপ্রের ঘরে কিছু সময় ছিলেন। তাঁর মুখের ভাগবত পাঠ শুনে মহাপ্রভু নিজেই তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন। রঘুনাথ গদাধরের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত চৈতন্যের দেখা পাওয়ার পরই তিনি ভাগবত অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী সম্পর্কে বৈষ্ণব মহাজনদের সশ্রদ্ধ উক্তি রয়েছে। কবি কর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলেছেন—

'নির্মিত পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যে গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ।

যদুনন্দন দাসের 'শাখনির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে রয়েছে—

বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ প্রিয় পাত্রকম্।
যেনাকারি মহা-গ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী অন্যান্য ভাগবত অনুবাদের মতই পয়ার ত্রিপদীতে লেখা কাব্য। বিষয়সূচি বিন্যাসে ও অনুবাদ কর্মের পরিপাট্টে এই গ্রন্থে কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বারোটি স্কন্ধে তিনশো বত্রিশটা অধ্যায়ে আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ ভাগবতের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা যে বেশ কঠিন হবে, তা বুঝেই রঘুনাথ ভাগবতকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধকে সংক্ষেপিত করে তিনি শুধু মর্মানুবাদই করেছেন।

ভগবাতের এই কাহিনী অনুবাদের বিশ্বসততার মাঝখানেই শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন দেখি ষষ্ঠস্কন্ধের অজামিল-উপাখ্যানের উপক্রমণিকারূপে মঙ্গলাচরণে কবি পদ্যাবলির নাম মাহাত্ম্যমূলক ২০ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এটি চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মেরই নিদর্শন। এছাড়া চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভাগবতের দশম স্কন্ধের অসামান্য গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কবি এই স্কন্ধের প্রারম্ভে নতুনভাবে মঙ্গলাচরণ করেছেন।

এবার ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার অনুবাদক হিসেবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃতিত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ জন্ম প্রসঙ্গই ধরা যাক। ভাগবতের কবি কৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধতার সঞ্চার করেছেন— 'নদ্যঃ প্রস্রন সলিনী হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ/ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ/অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।"

রঘুনাথের অনুবাদ—নদনদী সরোবর বিমলিত জল/বিকশিত উতপল কুমুদ কমল।/খগভৃঙ্গ নিনাদিত স্তবাকিত বল।/সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন/শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।।

মূলানুগত্য সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভাষাকে কবি নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। যেমন প্রসন্নসলিলা তাঁর অনুবাদ 'বিমলিত জল' হয়ে বাংলা ভাষার প্রবহমানতাকে রক্ষা করেছে। আবার 'জল রুহশ্রিয়ঃ' শব্দকে বিস্তৃত করে তিনি করেছেন 'বিকসিত উতপল কুমুদ কমল।'

আবার কখনও কখনও ভাগবতের কাব্য সৌন্দর্য সুরভিত পদ থেকে কবি কেবলমাত্র ভক্তিরস কাহিনীটুকু ছেঁকে নিয়ে অনুবাদের যথার্থ্যকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ভাগবতের দশম স্কন্ধে পড়ে ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীযুগল গীতের একাংশের তুলনা করা যেতে পারে।

মূলের কাব্য সৌন্দর্য্য ও ধ্বনিমাধুর্য তাঁর তাঁর অনুবাদে কিছুই সঞ্চারিত হয়নি। কিন্তু কথা অংশ অবিকৃতভাবে

পরিবেশিত হয়েছে। আবার কখনও কখনও তাঁর অনুবাদ কাহিনীকে অবিকৃত রেখেও মূল কাব্যের সৌন্দর্যের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে।

দেখা যাচ্ছে ভাগবতের কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুবাদক হয়েও ভাগবতাচার্য এই কাব্যে তাঁর মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয়ও রেখেছেন। রঘুনাথের সময়ে পৌরাণিক কৃষ্ণকথার সঙ্গে লোকায়ত কৃষ্ণ কথার মিশ্রণ বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব দানলীলা, নৌকালীলার গভীর অন্তরঙ্গ জীবনরসকে আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করে গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণ কর্তৃক এর অভিনয়। কিন্তু এরই মাঝখানে রঘুনাথ চেষ্টা করেছেন বিশুদ্ধ ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচারের এবং তারও উদ্দেশ্য লোক সাধারণের 'অশেষ দূরিত' হরণ। অর্থাৎ এর থেকে আমরা স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, লৌকিক কৃষ্ণকথার মধ্যে অনাবৃত গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার যে প্রবণতা, তাকে সব বৈষ্ণব মনে প্রাণে সে দিনও গ্রহণ করতে পারেন নি।

৭.৬.৫ মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যটির স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিভিন্ন বৈষ্ণব মনিষীর শ্রদ্ধা নিবেদনে। শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক কবি দেবকীনন্দন মাধবাচার্যের বন্দনা করে বলেছেন—'মাধব আচার্য্য বন্দা কবিত্ব শীতল।/যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।।/'

চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

তবে তা বন্দনা কৈল মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণ গুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য।
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হইল সকল জগতে।।

কিছু কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্যে এই মাধবাচার্যকে বিষ্ণপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা বলা হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অন্য গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মধবাচার্যকে পৃথক ব্যক্তি বলে ধরে নিতে হয়। আবার এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজমাধব ও চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধব একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তাঁর মতে দ্বিজ মাধবের নামে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল একই ব্যক্তির লেখা। আমার দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুঁথিতে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়—পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার/মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭৭ সংখ্যক পুঁথিতেও এই দুটি ছত্র রয়েছে। সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুঁথিতেও (পুথি সংখ্যা ১৯৫৯, লিপিকাল ১২০৪) পরাশরের প্রসঙ্গ আছে—পরাশর নামেতে আছিল দ্বিজবর/নানা গুণে পরিপূর্ণ তার কলেবর/কবিবল্লভ বলি ক্ষাতী হইল তাহার/তাঁর দুই চরণে হইলুঁ নমস্কার। আর চণ্ডীমঙ্গলের সমস্ত পুথির উপক্রমে পাওয়া যায়—পরাশর স্যূত হয় মাধব তার নাম/কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম।। গঙ্গামঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতার মিল খুব বেশি। গঙ্গামঙ্গলের আছে—চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল/দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল। সুতরাং এই গুলি থেকেই অনুমিত হয় তিনটি কাব্য একই ব্যক্তির লেখা। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনা কাল দিয়েছেন ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত/দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত। অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খিষ্টাব্দ। অন্যদিকে দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে। দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য। তাই তাঁর বৈষ্ণববন্দনার রচনাকাল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। সুতরাং দ্বিজ মাধব অনেক আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন ধরে নিতে হয়। তাহলে উপরোক্ত তারিখটির সঙ্গে আর বিরোধ থাকে না। অতএব এই তারিখটিকেই আমরা মাধবচার্যের কাল বলে গ্রহণ করেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দই কবির প্রধান অবলম্ভবন। কিন্তু তা হলেও ভাগবতের অন্যান্য স্কন্দ থেকে এবং ভাগবত ছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু পুরাণ থেকে যে কবি উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর নিজেরাই স্বীকৃতি থেকে জানা যায়

(১) রাজ রাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে/ বিস্তারি কহির তাহা হরিবংশ মতে। (২) পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে/ বিস্তারি কহিব বিষ্মু পুরাণের মতে। এছাড়াও আলোচনার মুখে দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের মত বিষয় বস্তুও আমরা এর মধ্যে দেখতে পাব। দ্বিজমাধবের কাব্য কেবল পয়ার ত্রিপতীতে রচিত একটি কাব্য নয়, রঘুনাথের মত এঁর কাব্যেও মাঝে মাঝে পদ রয়েছে। কবি সেই পদগুলিতে রাগরাগিনীর উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ম মঙ্গলের প্রথম অংশের গণেশ বন্দনায় কবি গণেশকে পরম বৈষ্মব বলে অভিহিত করেছেন এবং চৈতন্য দেবের বন্দনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী কৃষ্মমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট প্রবণতাই এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্যও সর্বসাধারণের মধ্যে ভাগবতের প্রচার ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে/ লোকভাষা রূপেতে কহিব পরমাণে। মঙ্গলাচরণে কবি দ্বাবিংশতি অবতারের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ অবতার।

কংসের অত্যাচারে পীড়িতা পৃথিবীর দেব সন্নিধানে কাতর আবেদন থেকে অর্থাৎ দশম স্কন্ধের একেবারে গোড়া থেকে কাহিনীর শুরু। ভাগবতের মধ্যে শিশু কৃষ্ম বলরামের চাপল্যময় বাল্যলীলার নানা বর্ণনার সঙ্গে কখনও কখনও মাধবাচার্য বাঙালি মায়ের বাৎসল্য সঞ্চার করতে পেরেছেন এগুলি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। যেমন মাতা যশোদার কৃষ্ম বলরামকে স্নান করানো, ঘুমপাড়ানোর দৃশ্যটি এবং পরিচিত ও জীবন্ত যে, একেবারে আমাদের চোখের সামনেই ভেসে ওঠে মনে হয়।

দ্বিজমাধবের অনুবাদ যেখানে সম্পূর্ণ মূলানুগ, সেখানেও কাহিনীর যথার্থ বজায় রেখে তা স্বচ্ছন্দ ও স্পষ্টার্থক। ভাগবতের কবি ঐশ্বর্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্মের বিপুল বিভূতি প্রদর্শন করেছেন, আরকবি দ্বিজ মাধব সেই ঐশ্বর্যময় কৃষ্মকথাকে বাঙালি সাধারণের ভক্তিভাবুকতা জাগানোর জন্য তুলে ধরতে গিয়ে বাংলার সজল মৃত্তিকার রং তাঁর উপর বুলিয়েছেন। এইভাবে ভাগবতের মত বিশুদ্ধ ধর্মীয় পুরাণ বর্ণিত কৃষ্মকথা ধীরে ধীরে বাঙালির প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে। তবে এই কবি তাঁর কাব্যে প্রথমে রাধাকৃষ্মের বন্দনা করলেও কালীয় দমন লীলায় শোকার্ত গোপীগণের মধ্যে রাধার নাম করেননি, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্মকীর্তনে এই প্রসঙ্গে রাধার নাম রয়েছে। ভাগবতের বস্ত্রহরণ লীলা প্রসঙ্গেও কবি রাধার নাম করেননি। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে, বস্ত্রহরণলীলার পর কবি সুকৌশলে তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের মত দানলীলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের দান খণ্ডের সঙ্গে এই কাহিনীর হুবহু মিল নেই। শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের বড়াই রাধার শাশুড়ীকে বলেছেন রাধাকে দিয়ে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করানোর কথা। কিন্তু এখানে গোপিনীরা নিজেরাই শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছে, এবং এদের মধ্যে রাধাও রয়েছেন। এছাড়াও কবি তাঁর কাব্যে রাধাকে প্রধানা গোপিনী বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্মকীর্তনে চন্দ্রাবলী রাধারই আর এক নাম। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে চন্দ্রাবলী রাধার একজন সখী। এখানেও বড়াই চরিত্রটি উপস্থিত। তবে শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের মত তাঁর ভূমিকা এখানে সক্রিয় নয়। বরং যেটুকু ভূমিক রয়েছে তাও শ্রীকৃষ্মকীর্তনের বিপরীত। কৃষ্মের সঙ্গে রাধা ও গোপীদের মিলনের সময় বড়াই বাধা দিয়েছে। কোন প্রকার সহায়তা করেনি। দানলীলার সঙ্গে নৌকালীলার ও এই কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। নৌকালীলার কাহিনীতে এখানে একটু নতুনত্ব আছে। ঝড়ের সময় গোপিনীরা নৌকার ভার হাল্কা করার জন্য কৃষ্মের পরামর্শে বস্ত্র অঙ্কার জলে ফেলে দিলেন। কিন্তু তারপর গোপিনীরা কৃষ্মের কাছে বস্ত্র অলঙ্কার ফেরত চাইলে তিনি যমুনাকে সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। কৃষ্মের আদেশে যমুনা সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্মকীর্তনের নৌকাখণ্ডে এই প্রসঙ্গ নেই। নৌকালীলা বর্ণনার পর কবি আবার ফিরে গেছেন ভাগবতীয় কৃষ্মলীলা বর্ণনায়।

ভাগবতকার রাসলীলার তীব্র আদিরসকে সমুচ্চ আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করেছেন এবং এর মধ্যে শ্রীকৃষ্মের ঐশ্বর্যেরও চরম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে নিজেই বিবৃতিকার। তাই রাসলীলা যে লৌলিক দৃষ্টিতে বিচার করা চলবে না তা তিনি নিজেই বলেছেন। শুকদেবের মুখ দিয়ে বিবৃত করেননি।

কৃষ্মের কাছে রুক্মিনীর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ ও কৃষ্মের রুক্মিনী হরণের বিবরণে দ্বিজমাধব বিশ্বাস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভাগবতের দশম স্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ের শেষ দিকে কৃষ্ম রুক্মিনী বিবাহ প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ দ্বিজমাধবের কাব্যে এর সুবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বাঙালি হিন্দু-বিবাহের একটি চমৎকার

পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই উপলক্ষে কবি দিয়ে ফেলেছেন। ভাগবতানুসারী কৃষ্ণ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তারই মাঝখানে বাঙালি পরিবারের একটি অপরিহার্য বিষয়কে অবলম্বন করে গার্হাহ্যরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উপাদান।

বাৎসল্য রস সৃষ্টিতে বিশেষ করে পুত্রহারা জননীর বেদনা বর্ণনায় কবি বিশেষভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য অংশেও যেমন হরিবংশের বজ্রনাভ প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই কবির ভণিতায় চৈতন্যদেবের উল্লেখ বহুবার রয়েছে। যেমন-

(১) কলিযুগে শ্রীচৈতন্য প্রেমরসে ধন্য,/দ্বিজ মাধব কহে সার।।

(২) চৈতন্য চরণ ধন শিরে করি আভরকণ,/ভূদেব মাধব ভাসে।।

(৩) চৈতন্য চরণে মাধব গান

(৪) অবতার শেষ চৈতন্যপ্রকাশ,/মাধব কহে সঙ্গীতি।।

(৫) শেষ অবতার শ্রীচৈতন্য শ্রীপাদে/অনন্ত মূরতি গোসাঞি হয় যুগভেদে।। যাহার প্রাসাদে নৃত্য কীর্তন প্রচার/কহে দ্বিজ মাধব সেই জগতনিস্তার।

(৬) কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার/দ্বিজমাধব কহে বিষ্কর তাহার।।

এর আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে ভাগবতের অবিকল বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু দ্বিজ মাধবের ভাগবত অনুসরণে বিশুদ্ধিরক্ষার সেই প্রয়াস নেই। আরও পাঁচটা পুরাণ থেকে এক্ষেত্রে তনি যেমন কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। তেমনি লৌকিক উপাদান থেকেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কবি কৃষ্ণকথাকে সর্বতোভাবে লোক সাধারণের উপযোগী করে তোমার সচেতন চেষ্টা করেছেন।

৭.৬.৬ দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ মঙ্গল

দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ মঙ্গল কাব্যটিও ভাবতেরই অনুবাদ। মাধবাচার্যের মত ইনিও প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধকে অবলম্ভবন করেছেন এবং প্রথম দুটি স্কন্ধ ও শেষের স্কন্ধ থেওে দরকার মত কথাবস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মাধবাচার্য যেমন স্বল্প হলেও তাঁর কাব্যে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কথা অংশ গ্রহণ করেছেন, তেমনি দুঃখী শ্যামাদাসও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ থেকে কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করে তাঁর কাব্যের কৃষ্ণকথায় বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন।

কবি শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগনার হরিপুর গ্রামে। কবি শ্যামদাসের মত তিনি দে উপাধিধারী কায়স্থ বংশীয় অবশ্য কাব্যের মধ্যে তিনি সব জায়গাতেই দাস উপাধি ব্যবহার করেছেন। সম্পাদক ঈশান চন্দ্র বসু ভূমিকায় বলেছন, ঊনবিংশ শতব্দীর শেষ দিকেও কবির বাস্তুতে তাঁর একাদশ অধস্তন পুরুষ সীতানাথ অধিকারী বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবে প্রতি তিনি পুরুষে একশ বছর ধরা হলে, কবির আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে, কবির পিতা শ্রীসুখ, কাশীরাম দাসের খুলল-পিতামহ। তিনি পুরুষে একশো বছরের হিসাব ধরে ড. সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কবি শ্যামদাস ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

কাব্যের প্রতম দিকে কবি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে পরীক্ষিতের কাহিনী রচনা করেছেন। পরে ভাগবতের মতো শুকদেবের মুখ দিয়ে কৃষ্ণকথা বলানো হয়েছে পরীক্ষিতের শোনার জন্য। এখানে দ্বিজমাধবের সঙ্গে দুঃখী শ্যামদাসের পার্থক্য। দ্বিজমাধব তাঁর বক্তব্য শুকদেবের মুখ দিয়ে বর্ণনা না করে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কৃষ্ণকথাই যে তাঁর একমাত্র উদ্দিষ্ঠ তা এভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতের আবহটিকেই তাঁর কাব্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তবে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে যে সব অংশ তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেগুলির আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেননি। নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী সংক্ষেপিত,

বিস্তৃত অথবা পরিবর্তিত করেছেন। যেমন কলি ও ধর্মের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ও কলি দমন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত। ভাগবতে আছে, কলির হাতে নিগৃহীত একপদধারী বৃষরূপী ধর্মকে পরীক্ষত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় না দিয়ে রাজাকে বুঝে নিতে বলেছেন। কিন্তু দুঃকী শ্যামদাসের কাব্যে ধর্ম নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম নিরঞ্জন
কলিভয়ে পাইল তাড়না।

পুতনা বধ প্রসঙ্গে কবি ভাগবতকে হুবহু অনুকরণ করেননি। নিজস্ব কল্পনা প্রয়োগ করে কাহিনীটিকে বাস্তব করে তুলেছেন। ভাগবতে আছে, পুতনাকে দেখে জননী যশোদা ও রোহিনী এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, সে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলে তাঁরা নিবারণ করতে পারলেন না। কিন্তু শ্যামদাসের কাহিনীতে আছে, পুতনা—'যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়া।।" আমার দুঃখের কথা না যায় কথন/পুত্রশোকে তেয়াগিনু আপন ভবন।।.....

শুন গো সুন্দরী তব আছয়ে কুমার/স্তনপান দিয়া থাকি যদি দেহ ভার।।"

পুতনার এই কথা শুনে যশোদা রোহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—'যাদুয়ার ধাত্রী কবি রাখিব ইহারে।"

এই কাহিনী অনেক বেশি মানবিক ও বাস্তব সমত। নিঃসন্দেহে এই কবিরও বৈশিষ্ট্য বাঙালি প্রবণতারই পরিচায়ক। ভাগবতের অনুসারী কৃষ্ণমঙ্গলগুলির অবলম্ভিবত কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে কেমন বাঙালির নিজস্ব প্রবণতায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে, উদাহরণটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে কবি রাধার প্রতি বালক কৃষ্ণের আদিরসাত্মকআচরণের ভাগবত বহির্ভূত চিত্র অঙ্কন করেছেন—"কবরী খসায় কৃষ্ণ পাইপ কৌতুকে।/কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে।।/রাধার বলে না জানিয়া কোলে কৈনু কেনে।/শিশু মূর্তি দেখিতে এমন কেরা জানে।।"

বরুনাল থেকে নন্দের উদ্ধার প্রসঙ্গের পর কবি রাধাকৃষ্ণ মিলন প্রসঙ্গ এনেছেন। রাধা এবং কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের চিত্রটি মনোরম—"রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন।/মুখে মৃদু হাসি রাধা ঝাঁপিল বসন।।"

কবির এই কাব্যে বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইর মত রাধা কৃষ্ণের প্রেমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তার বর্ণনাও প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এখানেও বড়াই কৃষ্ণের দূতী হয়ে রাধার কাছে গমন করেছে। রাধা বড়াইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মত অপমান করে তাড়িয়ে দেননি, এবং অবশেষে বড়াইর প্ররোচনাতেই তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে রাজি হয়েছেন।

কবি রাধাকৃষ্ণলীলা কথার এই লোকরঞ্জক অংশকে সুকৌশলে যেন ভাগবতের মধ্যেও টেনে এনেছেন। তাঁর কাব্যের এই অংশটিরও শ্রোতা পরীক্ষিত এবং বক্তা শুকদেব।

দুঃখী শ্যামদাস তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের মামী ও ভাগিনের সম্পর্কটি বজায় রেখেছেন। তবে এই রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মত সাগর গোপাল কন্যা নন, ইনি "বৃষভানু রাজার নন্দিনী"।

নৌকালীলার বর্ণনাও কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসারি তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে গোপিনীরা কৃষ্ণানুরক্তা ছিলেন না। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ রাধা সহ জলে ডুবে গেলে, গোপনীরা এই বলে আক্ষেপ করেছেন—"কামনা করিপ পূর্বে গোপিকা হয়েছি এবে/সাধ আছে ভক্তির মুরারি।/আমা সবা ভাগ্যে নাই সৌভাগ্যে সুন্দরী রাই/সেই সে নিদানে পাইল হরি।"

রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পদ্মপুরাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। কবি যে যোগপীঠরে বর্ণনা দিয়েছেন তা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অনুকরণে

দ্বিজমাধবের ভণিতায় বারবার চৈতন্যপ্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাসের পদে তা না থাকলেও আখ্যান বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পদরচনা বৈশিষ্ট্যই চৈতন্য পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে আমাদের নিঃসংশয় করে। ভাগবতের কৃষ্ণকথা আপামর বাঙালি জনসাধারণকে পরিবেশন করতে গিয়ে এঁরা ভাগবতের সরল বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মিশিয়েছেন লোকসমাজ প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী, আর তারই সাথে যুক্ত করেছেন পদাবলি গীতরস ও ভাবগভীরতা। এইভাবে কেবলমাত্র বিবৃতিধর্মিতা পরিহার করে কৃষ্ণকথা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের আস্বাদনীয়।।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৮ □ বাংলাসাহিত্য ঃ চৈতন্যোত্তর পর্ব

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ বৈষ্ণবপদাবলি
৮.৩ বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন
৮.৪ চরিতকাব্য
৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য
৮.৬ ধর্মমঙ্গল
৮.৭ অন্নদামঙ্গল
৮.৮ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
৮.৯ শিবায়ন
৮.১০ অনুবাদকাব্য
৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ
৮.১০.২ রামানন্দ ঘোষের রামায়ন
৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত
৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত
৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত
৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগবত
৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত
৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথের ভাগবত
৮.১১ শাক্তপদাবলি
৮.১২ নাথসাহিত্য
৮.১৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা
৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়বাক্য
৮.১৫ অনুশীলনী
৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে এপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি, চরিতকাব্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি পুরানো ধারাগুলি যেমন এ পর্বে বজায় রয়েছে, তেমনি নতুন কয়েকটি ধারারও আবির্ভাব ঘটলো। যেমন শাক্ত পদাবলি, নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা এবং চট্টগ্রাম-রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারা।

৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। "পদামৃতসমুদ্র" তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিনী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

"মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।"

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

"তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।" এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্ভেবাধন করে বলেন—

"ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।"

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। "চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।" বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভেভাগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—"একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।" শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। "নূপূর কলরব

শুনইতে মাধব/কুঞ্জকে হোই বাহার।/চলইতে খলই বলই সব আভরণ/অম্বর হত সম্ভার।।" প্রকৃতপক্ষে রাধামোহন রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলি নিয়ে সাত্ত্বিকভাবেই পদ রচনা করে গেছেন। কথাবস্তু বা ভাববস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে লক্ষ করা যায় না। গ্রীষ্মকালে রাধাকৃষ্ণের সরোবর মন্দিরে মিলনের প্রসঙ্গও কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে, কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যাচ্ছেন, তখন রাধা তার রথের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেইসময় রাধার অবস্থা বর্ণনা করে বৃন্দা বলেছেন, শ্রীরাধা কখনও বা বিলাপ করতে করতে রথের সামনে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও বা সজল চোখে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনও বা দন্তে তৃণধারণ করে বলরামের সামনে আছড়ে পড়ছেন। হায়, এ দেখে কার না অত্যন্ত দুঃখ হয়।

রাধামোহন এই প্রসঙ্গ নিয়েই রাধার ভবন বিরহের পদ রচনা করেছেন—"খেনে খেনে কান্তি লুঠই রাই রথ আগে/খেনে খেনে হরি মুক চাহ।/খেনে খেণে মনহি করত জানি ঐছন/কানু সঞে জীবন যাহ। ***** খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক আগুসরি/আছড়ি পড়ল নজ অঙ্গে।" পদের প্রথম চরণে কবি মূলকে অনুসরণ করে, পরের চরণেই বলেছেন, রাধা ক্ষণে ক্ষণে এমন মনে করেছেন যে, কৃষ্ণ চলে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণও বুঝি চলে যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের বিরহে রাধা মৃত্যু মুখে উপনীত হয়েছেন। এই অংশ পদকর্তার নিজের মৌলিক সংযোজন, এটি খুব সঙ্গতভাবেই পদের মধ্যে এসেছে। রাধা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন, আবার বিরহের তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছেন। সমস্তই কবির নিজস্ব কল্পনা, পদের শেষে কৃষ্ণের মথুরা গমনের সময় শ্রীরাধার অচৈতন্য হয়ে পড়া এবং অক্রুরের রথ নিয়ে প্রস্থান রামমোহনের নিজস্ব কল্পনা। শুধু তাই নয়, কবির কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে অপর একটি পদে রাধার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছে।

শ্রীরূপের "হংসদূত" কাব্যের প্রভাবেও রাধামোহন ঠাকুর কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের কাব্যে ললিতা হংসকে সহৃদয় বলে সম্বোধন করে নিজের বিরহদুঃখের বিষয় জানিয়েছেন। এই কবির পদে সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে—'সজনি অদভূত প্রেমক রীত/তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত/কহতাহি কত বিপরীত।।/তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল/পরম-হংস দয়াশীল।" কিন্তু শুধু নিজেদের দুঃখের কথা নয়, মথুরায় গিয়ে হংসকে তো আগে কৃষ্ণকে চিনতে হবে। তাই শ্রীরূপের 'হংসদূত'-এ ললিতা হংসের কাছে কৃষ্ণের পরিচয়ও বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন। রাধামোহনও এইভাবের একটি পদ রচনা করেছেন—"যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ/যো অবধারবি যদুকুল চন্দ।।/শুন তভূ কহি কিছু নিরুপম রূপ।/জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ।/লাবণি-লহরি ললিত সব অঙ্গ।/ভ্রু বধূ-নটন মদন ধনু-ভঙ্গ॥"

এখানে কবি শ্রীরূপের পদের অনুসরণেই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'হংসদূত' বর্ণিত ঘটনার পরেও রাধামোহন নিজের কল্পনায় পরবর্তী ঘটনা ভেবে নিয়ে তাকে বিষয় বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। অবশ্য এটি তাঁর মৌলিক কল্পনা নয়, এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী গোবিন্দ দাসের দ্বারা প্রভাবিত। রাধামোহনের পদে রয়েছে, ললিতার কথা শুনে হংস উড়ে চলে গেলে, যেখানে রাধা কিশলয় সজ্জায় শয়ন করে আছন, ললিতা সেখানেই ফিরে গেলেন, চতুর্দিকে সখিরা সবাই রাধাকে ঘিরে ধরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন—"হেরি ললিতা সবুহুঁ পরবোধই/কহতাহিঁ মৃদু মৃদু ভাষ॥/এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ/মধুপুব কানুক পাশ/এত শুনি বিরহিনি চেতন পাওল/হোয়ল জিবনক আশ।" এখানে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সখীদের তুলনায় ললিতা অনেক বেশি পরিমাণে চিত্তস্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, শ্রীরূপের বর্ণনায় ললিতার চরিত্রের এই দিকটির উল্লেখ নেই। এটিও কবি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এটি অত্যন্ত সঙ্গত কল্পনা। কারণ, সখীদের মধ্যে একমাত্র ললিতাই তাঁর দুঃখের কথা হংসের কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। ফলে তার বেদনার ভারও অনেকখানি কম হয়েছে। সেই কারণেই তিনি স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। রাধামোহন সখীর মুখ দিয়ে শ্রীরাধার বারো মাসের বিরহ বেদনা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলিকারেরা কল্পনা করেছেন যে, বিরহিনী রাধাকে দেখার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এসেছিলেন। রাধামোহন সেই ঘটনাকে গ্রহণ করে একটি পদে কৃষ্ণের মথুরা থেকে ব্রজে আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা নিয়েও কবি কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধবের কোন কোন শ্লোক অনুসরণেও রাধামোহন পদ রচনা করেছেন।

এই কবি দানলীলার ঘটনাকে অবলম্বন করেও পদ রচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করেছেন শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী নামক ভণিকাটিকে। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের কথা বলেছেন। এর অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর শুধু এই ভাবের দ্বারাই নয়, 'কিলকিঞ্চিত' শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন—"গরবরি সুন্দরী চললহ আনত/শগর পন্থ আগোর/কহতহিঁ বাত দান তেহ মঝু হাত/আন ছলে কাঁচলি তোড়।।/অপরূপ প্রেমতরঙ্গ/দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব/বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ।।/অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল/তহিঁ জলবাণ পরকাশ।/ধুশইত ভুরু ধনু পুলকে নুরল তনু/অলিখিত আনন্দ-হাস।।" শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাস-বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহের দশ দশার কথা বলেছেন, যা পূর্বরাগের দশ দশার অনুরূপ, অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাজব বা কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। রাধামোহন বিরহের বেশ কিছু পর্যায় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। তাই বলা যায়, এই কবির কৃষ্ণকথায়ও গোস্বামীদের অনুসরণ ও শব্দবিলাস ছাড়া আর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই।

● চন্দ্রশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা হলেন চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর। অনেকের মতে চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর হলেন দুভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাঁদড় গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র। এরা 'নায়িকা রত্নমালা' নাম দিয়ে নায়িকার ৬৪ রকমের বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সংকলন করেন। চন্দ্রশেখর বিভিন্ন রসপর্যায় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। যেমন—অভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনায় কবি শ্রীরাধার দিবাভিসার, কুজ্ঝটি-অভিসার, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসারের পদে অভিনবত্ব রয়েছে। এছাড়া বাসকসজ্জিকা রাধার বর্ণনায় কবি কিছুটা শ্রীরূপের অনুসারী। বাসকসজ্জিকা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ চিত্তকর্ষক। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ কাছে এলে রাধা যেন কপট নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকেন। তাহলে—হম সব বোলব রাই ঘুমায়ল/আজি অনত যাহ চলিয়া। কিন্তু তাহলেও কৃষ্ণ যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ণ যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ণ তাঁর পদসেবা করবেন। সখীদের এই কথা শুনে বাসকসজ্জিকা রাধা—'বিহসি মুখ ঝাঁপল/অন্তরে উপজল লাজ' উৎকণ্ঠিতা রাধার বর্ণনায় কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর গীতাবলীর পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিপ্রলব্ধা রাধার উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও অপমানবোধের জ্বারা ফুটে উঠেছে। রাধার বলার ভঙ্গীও এই কবির পদে অভিনব—'কুসুমিত শেজহিঁ ভেজহ আগুনি/অরু কিয়ে দেখহ চাই। মালতি-মাল সুবাসিত তাম্বুল/এদুঁহু দেহ জালাই।।' এর আগে কবিদের পদে বিপ্রলবব্ধা রাধার ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশ পেলেও রাধা ফুলের বিছানায় আগুন লাগিয়ে দিতে বলেননি। কোকিলের রবে কৃষ্ণ সংকেত করলে রাধা তাঁর গৃহের অর্গল খুলে বাইরে আসতে চাইলেন, কিন্তু বলয়ের ঝঙ্কারে জরতী জেগে উঠে বলল—কো উহনিকসই/কহু কিয়ে বাহির ভেলি। তখন রাধা বাধ্য হয়ে হুঁ হুঁ করে নিজের মন্দিরে আবার প্রবেশ করলেন। রাধার বাড়ীর প্রাঙ্গণের কোনে একটি বদরী তরু অবস্থিত। কবি বলেছেন রাধার পরিবর্তে—রজনি পোহায়ল/হরি কোরে করি সোই গছে।

এখানে কবির স্মিত কৌতুক চমৎকারভাবে রূপ লাভ করেছে। এটি রবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি পরিচিত পদের অনুবাদ। শ্লোকটির ভাব নিয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বহু কবি পদ রচনা করেছেন। এই কবির পদে খণ্ডিতা রাধার কৃষ্ণের প্রতি তীব্র ব্যাঙ্গোক্তিও কবির শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। রাধা বলেন—বন্দে বরজ-রাজ-কুল-নন্দন/বিজয় বারহ হরিজী। বন্দনা করার কারণ স্বরূপ রাধা বলেন—

কবুহুঁ নীলাম্বর কবহুঁ পিতাম্বর/কবহুঁ চন্দন চাঁদ ভালে। কবহুঁ সিন্দর সমূহ বিরাজই অজ্ঞান/অঞ্জন পুঞ্জ মিশালে॥

অপর একটি পদে অন্য নায়িকার কাছে থেকে প্রত্যাগত কৃষ্ণকে দেখে ক্রোধে রাধার স্বাভাবিক বাক্যস্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে। খণ্ডিতা রাধার ক্রোধ প্রকাশের এই পদ্ধতি কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অতঃপর কলহান্তরিতা রাধাকে সান্তনা দিয়ে রাধার সখী কৃষ্ণের অন্বেষণে গোবর্ধন, যমুনাকানন প্রভৃতি খুঁজেও দেখতে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন কৃষ্ণ নির্জন প্রান্তরের মাঝখানে পড়ে আছেন। এবং একটি স্বনবর্ণ পদ্ম হাতে নিয়ে—রাই রাই করি শিরে কর হানই/ধুলি ধূসর সব গায়। মানিনী রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের এই চিত্রটিও কবির মৌলিকতার নিদর্শন। এর আগে বিরহী কৃষ্ণের নানা মূর্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও শূন্য প্রান্তরে রাধার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হেম পদ্ম হাতে হা-হুতাশারত কৃষ্ণকে আমরা এই প্রথম দেখলাম।

অপর একটি পদে কলহান্তরিতা রাধার সখী কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যান। কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে করুণা করে তাঁর দিকে চাইতে বলেন। কিন্তু চতুরা সখী বলে, 'মাধব তুমি কি বলবে বল, আমি অন্য কাজে যাব, তোমার সঙ্গে কথা বললে সখীরা আমার দোষ দেবে।' কৃষ্ণ বলেন 'রাধা আমায় পরিত্যাগ করেছে, তুমিও যদি ত্যাগ কর, তবে আমি বিষ পান করব।' এর উত্তরে সখী তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে বলেন—আহিরিনি কুরুপিনি গুনহিনী ভাগি হিনি/তাহে লাগি কাহে বিষ পিয়বি/চন্দ্রাবলি -মুখ চন্দ্র-সুধা-রস/পিবি পিবি যুগ যুগ জিয়বি।

প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও এখানে উপস্থাপনায় নাটকীয়ত্ব, বাক্যবিন্যাসে তির্যকতা ও তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে পুরাতন কৃষ্ণকথাকে নব রূপ দান করেছে। কৃষ্ণেরগ কাতরতা দেখে সখী ফিরে এসে রাধার কাছে কৃষ্ণের হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। ললিতা বলেছেন—আঁবর পাতি হম তুয় পাশে মাগিয়ে/মান-রতন দেহদান।।

মাথুরের পদগুলি গতানুগতিক। রঘুনাথের মক্তাচরিত্রে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীরাধার অভিষেক পরবর্তীকালের বহু কবিকে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। চন্দ্রশেখরও রাইরাজার প্রসঙ্গ নিয়ে পদরচনা করেছেন। চন্দ্রশেখরের পদাবলির উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় কবি সূক্ষ্ম সামান্য কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

● শশিশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শশিশেখরও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। এঁর গোষ্ঠবিহারের পদগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠবিহারের পদে কবি সুবল, অর্জুন, অংশুমান, দাম, বসুদাম প্রভৃতি ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ সখাদের নাম করেছেন। এই পর্যায়ে মত্ত বলরামের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, তা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হলেও পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা থেকেই গৃহীত।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কবি ব্রজবুলির সঙ্গে সংস্কৃতেরও আভাস দিয়েছেন। পদটি সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ সঞ্চারের পদ। রাধা নীপমূলে কৃষ্ণকে দেখে এসে সখীকে বলেছেন—নবহুঁ রুচি মেহ সখি নীপহুঁ মূলে পেখলুঁ/নয়ন মন ভলল মঝু ভরমং/তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে/লখিতে নারিনু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং।। জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তিমিরাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনা করেও কবি পদরচনা করেছেন। এর মধ্যে তিমিরাভিসারের পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আজি অদভূত তিমরি রঙ্গ/আপনি না চিনি আপনঅঙ্গ/নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ/অংকুনা নাহি মানরি।

সমস্ত পদটিতে চিত্র রচনা, ধ্বনি ঝঙ্কার ও ছন্দ-হিল্লোল, অভিসারিকা রাধার আসন্ন মিলনের আনন্দ ও অভিসারের আবেগকে যেন উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। পদটির শিল্প সৌকর্য অতুলনীয়।

খণ্ডিতা রাধার কাছে অন্য নায়িকা উপভোগকারী কৃষ্ণের মিথ্যা কৈফিয়ৎও জয়দেবের সময় থেকেই চলে আসছে। এই কবির পদে, উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার এই অংশ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাধা-কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন—নীল উৎপলের মত সুন্দর তাঁর মুখ ম্লান হল কি করে? কৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, রাধার বিরহে রাত্রিজাগরণ করতে গিয়ে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেছে। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের কপালে সিঁদুরের দাগ এল কি করে? কৃষ্ণ বললেন গোবর্ধনে গৌরিক গেবি/সিন্দুর তখি লেল।। এইভাবে কৃষ্ণ বক্ষে নখ ক্ষতের ব্যাখ্যা দিলেন, রাধাকে খুঁজতে

গিয়ে কণ্টকে তাঁর বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাধা প্রশ্ন করলেন—নীলাম্বর কাহে পহিরিল/পিতাম্বর ছোড়ি। কৃষ্ণ বললেন বলরামের সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তিত হয়েছে। রাধা যখন প্রশ্ন করলেন—অঞ্জন কাহে খন্ত-স্থলে/খণ্ডন কাহে অধরে। তখন কিন্তু কৃষ্ণ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অপর একটি পদও খণ্ডিতা মানিনী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রচিত। এখানে কৃষ্ণের উক্তি সংস্কৃতে এবং রাধার উত্তর বাংলায়। কথাবস্তু ও ভাববস্তুতে নতুনত্বের সঞ্চার করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা কেমন করে ভঙ্গি সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছিলেন, পদটি তারই প্রবল উদাহরণ। কৃষ্ণের বাজীকর ছদ্মবেশে কলহান্তরিত। রাধার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি পদরচনা করেছেন। এছাড়া অহেতুক মান, মুরলী শিক্ষা ও মাথুর বিরহকে বিষয়বস্তু করেও কবি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন।

৮.৩ বৈষ্ণবপদ সংকলন

আলোচ্য কালপর্বে প্রস্তুত বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবপদ সংকলন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির গুরুত্ব কম নয়। এ সমস্ত পদ সংকলনের সুবাদেই প্রাচীন বহু পদ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পদ সংকলনগুলিতে সংলকদের মর্জিত মেজাজের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। এখন পদ সংকলনগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

● ক্ষণদাগীত চিন্তামণি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্তত সাতখানি পদ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হচ্ছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে চক্রবর্তী মহোদয় ৪৫ জন কবির লিখিত ৩০৯টি মাত্র পদ এই গ্রন্থে স্থান দেন। তার মধ্যে ৫১টি পদ তাঁর নিজের রচনা। তিনি আরও পদ হয়তো সংকলন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কেননা প্রত্যেক ক্ষণদার নীচে "শ্রীগীত চিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে" লেখা দেখে মনে হয় যে তিনি গ্রন্থের একটি উত্তর বিভাগও সংকলন করবার সংকল্প করে ছিলেন। কিন্তু হয়তো দেহান্ত হওয়ার জন্য আর তা পারেননি। তিনি ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবতের টীকা শেষ করেন। সম্ভবত এর কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষণদাগীত চিন্তামণি সংকলিত হয়। এতে ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলির ধারা দেখানোর কোন চেষ্টাই নেই।

● গীতচন্দ্রোদয়

পদামৃত সমুদ্রের পরই উল্লেখ করা যায় গীতচন্দ্রোদয়ের নাম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী (আঁর এক নাম ঘনশ্যাম) গীত চন্দ্রোদয় নাম একটি বিশাল পদ সংকলন নামে একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। ঐ গ্রন্থের মাত্র পূর্বরাগ সম্বন্ধীয় ১১৬৯টি পদ হরিদাস দাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে ক্ষণদাগী চিন্তামণির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন—"সামান্যতর প্রথমেতে গাব গৌর গীত।/চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত।।"

গীত চন্দ্রোদয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় "আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ্র করতলে বদন সঘন অবলম্ব' ইত্যাদি পদটির ভণিতায়. দেখি—'পুলক মুকুল ভরু সব দেহ/রাধামোহন কছু না পাওল সেহ।"

এই রাধামোহন রাধামোহন গোস্বামী। এই পদটি পদকল্পতরুতে ৬৮ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হয়েছে। সুতরাং গীতচন্দ্রোদয় সংকলনের সময় রাধামোহন ঠাকুরের কবি খ্যাতি প্রচারিত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী গীত চন্দ্রোদয়ে লিখেছিলেন—'মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা কিঞ্চিৎ ঘুচাইয়া।/অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া।/প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত।/তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চি/ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ।/পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।।

পূর্বরাগেই ১১৬৯টি পদ আছে, সুতরাং তাঁর সংকল্পিত গ্রন্থে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি পদ থাকবে এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্বরাগ ছাড়া আর কোন অংশ এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

● **গৌরচরিত চিন্তামণি**

এটি নরহরি ঘনশ্যাম রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টাকালীয় লীলা গ্রন্থ, এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাতকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিবিধ লীলা বর্ণিত। এই গ্রন্থটির পদে উদাহরণ ঃ—দুগ্ধ সায়র মধ্যচারু সুমেরুশৃঙ্গ-সামন গৌর কিশোর দেহ সুলেহমণ্ডিত চন্তকর-মদভঞ্জনা। শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত হেরি অনিমিখ অক্ষি রঞ্জিত লক্ষ স্মরকৃতগঞ্জনা।। এই গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েকটি ছন্দ উল্লেখ করা যেতে পারে—ললিত, শ্যামা, তারা, কুমারী, কান্তা, পার্বতী, সাবিত্রী, রজনী, রঙ্গমালা, দ্বিপদী, ত্বরিতগতি, মধুমতী, সুরঙ্গ, মোদক, মুক্তা কেশরী ইত্যাদি।

● **পদামৃতসমুদ্র**

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থটির সঙ্কলনের সঙ্গে "মহাভাবানুসারিনী" টীকাও সংযোজক করেছেন। পদামৃত সমুদ্রে পার ৭৬০টি পদ আছে। তাতে ২২৮টি পদ স্বরচিত বলে জানা যায়। রাধামোহন তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন, কথিত আছে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ নিয়ে যখন তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ছয়মাস ধরে প্রতিবাদ করে পরকীয়া বাদ স্থাপক করেন এবং সকল পণ্ডিত সমাজের দস্তখত যুক্ত এক জয়পত্র মুর্শিদাকুলি খাঁর দরবারে ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি মালীহাটিতে থাকতেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

রাধামোহন ব্রজভাষা, হিন্দি, মৈথিলী ও বাংলা গানের সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনা করে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেন। যদিও আগেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য এবং অসম্পূর্ণ। তিনি যে মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তা তান, লয়, বয়স, ভাব, ছন্দ, অলংকার এবং প্রসাদগুণ গুঙ্কিত তদীয় গীতাবলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

● **পদকল্পতরু**

বৈষ্ণব সমাজে পদামৃত সমুদ্রের পরই গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ 'পদকল্পতরুর' স্থান। বৈষ্ণবদাস নিজে একজন ভাল কীর্তন গায়ক ছিলেন। তিনি যে অনেক স্থানে ভ্রমণ করে ভাল ভাল পদ সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা নিজের সঙ্কলনের শেষে বলেছেন—

আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধা মোহন/ কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।/গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমদ্র আখ্যান।/জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।/নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।/তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া।/ সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে হইা কৈল।/প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।।

তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ৩১০১টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন বলে বহু কবির কীর্তি রক্ষা পেয়েছে। এক একটি লীলার ওপর তিনি যতগুলি ভাল পদ পেয়েছেন তা দিয়েছেন। পদগুলি ঐতিহাসিক কালানুযায়ী সাজাবার তিনি কোন প্রয়াস করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কলহান্তরিতা পদগুলি নেওয়া যায়। তিনটি পল্লবে তিনি যথাক্রমে ১৯, ১২ ও ১৩টি মোট ৪৪টি পদ সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে কীর্তনীয়া নিজের রুচি ও শ্রোতাদের অভিপ্রায় অনুসারে যে কোন ৮/১০টি পদ গাইতে পারেন। প্রথমেই রাধামোহন ঠাকুর কৃত গৌরচন্দ্রিকা, তারপর গোবিন্দ দাসে কয়েকটি পদ, পরে বিদ্যাপতির পদ, জ্ঞানদাসের পদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাসের পদ এবং তারপর ষোড়শ শতাব্দীর জ্ঞানদাস এবং দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের পদ স্থান পেয়েছে। ৬০০ বছরের মধ্যে ভাব, ভাষা ও সাহিত্যরীতির যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তার প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বৈষ্ণবদাস এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো সঙ্কলনকারীই মনে করেননি। ধর্মের বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখানো তাঁদের কাজ ছিল না। তাঁর রসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য পালা সাজিয়ে ছিলেন। পদকল্পতরুতে ও যে কবির রচনা সর্বপেক্ষা বেশি স্থান অধিকার

করে আছে তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। গোবিন্দদাসের ৪৬০টি পদ, জ্ঞানদাসের ১৮৫টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদ এতে স্থান পেয়েছে।

৮.৪ চরিতকাব্য

● **অকিঞ্চন দাস**

অকিঞ্চন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের পদ্যানুবাদ করেন।

● **প্রেমদাস**

প্রেমদাস গঙ্গাদাস মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৬৩৪ সালে কবিকর্ণসুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন ও 'বংশী শিক্ষা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বালুঘোষের মত গৌরলীলা বর্ণনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থে শ্রীপাট বাখ্‌নাপাড়ার ইতিবৃত্ত কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

● **নরহরি চক্রবর্তী**

নরহরি চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা রেঙাপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য জগন্নাথ। তাঁর রচিত গ্রন্থ—(১) ভক্তি রত্নাকর, (২) নরোত্তমবিলাস, (৩) শ্রীনিবাসচরিত্র, (৪) গীতচন্দ্রোদয়, (৫) ছন্দ—সমুদ্র, (৬) গৌরচরিত চিন্তামণি, (৭) নামামৃত সমুদ্র, (৮) পদ্ধতি প্রদীপ, (৯) সঙ্গীত কার সংগ্রহ প্রভৃতি। ইনি একধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতভক্ত এবং পরম ভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সকল ভক্তের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়নি। শ্রীলোকনাথ, শ্রী প্রবোধানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম প্রভুর কথা কোথাও নেই। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় আচার্যদের এবং তৎকালীন ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিত পূর্ব জীবনবৃত্তান্ত ভক্তিরত্নকার, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছন। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডলের এবং দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমার যে সুবৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন মানচিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে স্থান বিলুপ্ত হলেও সহৃদয় ভক্তচিত্তে ও কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক বিচারে গ্রন্থটির মূল্য অত্যল্প হলেও স্থানাসূচক বিবরণে গ্রন্থটি অমূল্য।

৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য

● **কবি তন্ত্রবিভূতি**

কবি তন্ত্রবিভূতির আসল নাম বিভূতি। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন বলেই তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচয় লাভ করেন। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। কিন্তু কবির নামেই অর্থাৎ তন্ত্রবিভূতি নামেই কাব্যটি বেশি পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

মঙ্গলকাব্যের কবিদের রীতি অনুযায়ী দেববন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে। মনসার আবাহন, ধর্মদেবতার স্মরণও বন্দনা। মনসার বন্দনা ও বাহনসহ দেবদেবীদের বন্দনায় কবি কাব্যকুশলতার পরিচয় রেখেছেন—

তোতালা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি—
বালকের যদি কর দয়া।

নাট নাটেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী

তুয়া গতি পদে দেহ ছায়া।।

চতুর্ভুজ মূর্তি সুন্দরী মনসার অষ্টনাগসজ্জায় অষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় পদ্মার প্রচণ্ড মনোহর রূপ উদ্ভাসিত— "চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।/নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।/... সিন্দুরয়িা নাগ দেবীর সিন্দূর উজল।/পুঞাচিঞা নাগ দেবীর নঞানে কাজল।/....দশনিঞা নাগ দেবীর দশন হইল।/দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুজরিতে নাগিল"।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী দেবীর স্বপ্নাদেশে তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্ভব বর্ণনা পুরাণকে অনুসরণ করলেও কবির নিজস্বতার পরিচয়ও এখানে আছে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহে দেবতাদের উপহার ও বিবাহে নানা উপঢৌকন দানের বর্ণনায় সমকালীন সমাজের বিবাহ প্রথারই জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়।

● **জগজ্জীবন ঘোষাল**

জগজ্জীবনের কাব্য ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ৫. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কবি জগজ্জীবন দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি পিতার নাম রূপরায় চৌধুরী ও মা-বেরতী।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মত দেবখণ্ড ও বাণিয়াখণ্ড এই দু'ভাগে বিভক্ত। কবি বানিয়া খণ্ডে তন্দ্রবিভূতিকেই বিশেষ করে অনুসরণ করেছেন। মতের দিক থেকে তিনি শাক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যে দেবখণ্ডের প্রথমে কবি ধর্মমঙ্গলের মতই সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনীতে কিছুটা বৈচত্র্য আছে।

কবির বানিয়াখণ্ডের চরিত্রে অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের থেকে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বেহুলার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য চাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব, পরে আবার ভক্তির আতিশয্য, সমকার স্নেহ ব্যাকুলতা প্রভৃতি বর্ণনা প্রায় গতানুগতিক। মানবমানবীর চরিত্র বর্ণনায় স্নিগ্ধ কোমলতা বজায় রেখেছেন, তাঁর কাব্যে ঘরোয়া সুর মন্দ হয়নি। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, সমাজের ভাষা, রীতিনীতির প্রভাব কাব্যটিতে স্পষ্ট। তাই কাব্যটির একটি আঞ্চলিক মূল আছে। তবে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনায় ক্ষেত্রে তিনি যেন রোখ করে গ্রাম্য পাশব ও অনাগরিক রুচির আশ্রয় নিয়েছেন।

জগজ্জীবনের কাব্যে অশ্লীল বর্ণনা থাকলেও রসে কৌশল প্রশংসার দাবি রাখে। কবি যে সংস্কৃত পুরাণ, অলংকার শাস্ত্র জানতেন তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যেই আছে। ছন্দ, শব্দপ্রয়োগ এবং উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, বুদ্ধি ও মনন বিশেষবাবে প্রশংনীয়। পয়ার ত্রিপদী ও তিনি অক্লেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ভাষায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রভাব থাকলেও বাক্‌রীতি অনেক জায়গায় তৎসম শব্দের অনুকূল। বেহুলা সনকার বিলাপ এবং চাঁদের শুষ্ক কঠিন বেদনা প্রকাশের ভাষা যথোপযুক্ত হয়েছে। 'হারামখোর'-দের প্রসঙ্গে কবি দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যটি মুদ্রিত হওয়ায় এর মধ্যে অঞ্চল বিশেষের সমাজ জীবনের বাস্তবচিত্র এবং মনসাকাল্টের অভিনব পরিচয় লাভ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

● **জীবন মৈত্র**

মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন অপ্রধান কবি জীবন মৈত্র। বাগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম অনন্ত, মা স্বর্ণমালা, কবিরা পাঁচ ভাই।

কবির উপাধি ছিল কবিভূষণ, কবি তাঁর কাব্যে কাব্য রচনা কালের নির্দেশ দিয়েছেন—

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্নিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

অর্থাৎ ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গল রচিত হয়। কাব্য মধ্যে কবি নিজেকে রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও লাজুক প্রকৃতির লোক হওয়ায় জীবন মৈত্র নিজের প্রচার করতে পারেননি। নাটোরের জমিদারের কাছ থেকে তিনি কোনো সম্মানে ভূষিত হননি।

কবির সংসার স্বচ্ছল ছিল না। এই অস্বচ্ছলতা ভুলিবার জন্য তিনি কল্পনার রাজ্যে বিতরণ করতেন, সংসার অনভিজ্ঞ বলে তিনি 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবনের মনসামঙ্গল দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড দুভাগে বিভক্ত। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকাসমূহ মনসার জন্ম, বিবাহ কাহিনী বর্ণিত। বণিকখণ্ডে আছে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা কাহিনী।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় 'ঊষা হরণ' নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। অনুমিত হয় এই অংশটি তাঁর মনসামঙ্গলেরই বিচ্ছিন্ন অংশ।

অন্যান্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে জীবনের মনসা মঙ্গলের কিছু পার্থক্য আছে। এখানে বেহুলার পিতা বাহো সদাগর, মা মেনকা, ভাই শঙ্খধর, এবং বেহুলার নাম বেললি, কাব্যটির দু'একটি উপকাহিনী অন্যান্য মনসা মঙ্গলের থেকে আলাদা যেমন—'কাজল রেখা'-র কাহিনী অনুসরণে বেললি মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় ভাই শঙ্খধরের সঙ্গে দেখা হয়। শঙ্খধর বেললিকে চিনতে না পেরে প্রণয় নিবেদন করল। বেললির পরিচয় জানার পর শঙ্খধর লজ্জিত হয় এবং তাকে গৃহে ফেরার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বেললি সে অনুরোধ উপেক্ষা করে দুর্গম কর্তব্য পথে এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত পুরাণের অশ্লীল অংশ গ্রহণ করার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসাত্মক। পাণ্ডিত্যের ভারে অনেক সময় রচনা শৈলী জটিল হয়ে গিয়েছে। কাব্যে সংস্কৃত উপমা অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। রচনা অনেক সময় লালিত্যবর্জিত। অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি পাণ্ডিত্যমুক্ত হয়ে সহজ সরল ভাবে ভাব প্রকাশ করেছেন।

অনেক অনাবশ্যক অবান্তর রচনা কাহিনীর গতিকে রুদ্ধ করে তুলেছে। কবি কাব্যটিতে প্রত্যক্ষ সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই স্তূপীকৃত উপকরণের নিচ থেকে তাঁর কাব্যের মূল বক্তব্য সহজে স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি।

৮.৬ ধর্মমঙ্গলকাব্য

● রামদাস আদক

সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি হলেন রামদাস আদক। ১৩১১ সালে সাহিত্য সংহিতায় (১০ম-১১শ সংখ্যা) মধুসূদন অধিকারীর লেখা 'অনাদিমঙ্গলের কবি' নামক প্রবন্ধে সর্ব প্রথম রামদাস আদকের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর ১৩৪৫ সালে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ থেকে রামদাসের অনাদি মঙ্গল কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই কবির কাব্যের আত্মপরিচয় অংশ গতানুগতিক। ভুরশুট পগণার রাজা ভারতচন্দ্রের পূর্ব পুরষ প্রতাপনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছাকাছি হায়াৎপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁরা জাতিতে চাষী কৈবর্ত্ত। চাষবাসই তাঁদের বৃত্তি ছিল। অতি অল্পবয়সে কবির পিতাবিয়োগ হওয়ার কালে বাল্যকালে

তিনি লেখা পড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পাননি। চৈতন্য সামন্ত নামক এক রাজকর্মচারী কবিকে বাকী খাজনার দায়ে আটকে রাখে—

"তিন দিন রামদাস ছিল বন্দিখানা।
শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রণা।

এরপর তিনি কোনমতে মুক্তিলাভ করে মামার বাড়ীর দিকে ত্রা করলেন পথে এক সিপাহির সঙ্গে দেখা। রামদাস মনেমনে ভাবলেন—

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই
বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই

সিপাই রামদাসের মাথায় মোট চাপিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তৃষ্মার্ত কবি কামদীঘিতে জল খেতে গেলে দীঘির জল শুকিয়ে গেল। আর রামদাস দেখলেন—ঝারি হাতে ঘাটে এক নবীন ব্রাহ্মণ। তিনি আসলে ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম। তিনি রামদাসকে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করতে বললেন।

নানা প্রমাণ থেকে মনে হয় কবি ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে অনাদিমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

রামদাসের কবিত্ব শক্তি প্রশংসার যোগ্য। কাহিনীও চরিত্রসৃষ্টিতে সংহত রচনা কৌশল, পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এর মধ্যে দুর্লভ নয়। এই ধরনের কিছু পদের উদাহরণ প্রমাণে দেওয়া যেতে পারে—

(১) চিনিতে রোশিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।
জগতে স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনো।।

(২) নলিনীদলের জল জীবনচঞ্চল।
জলেতে বিচম্বাক যেন বারে টলমল।।

(৩) যশকীর্তিহীন জীবন অকারণ।
যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ।।

তবে রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

● সীতারাম দাস

সীতারাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর একজন কবি। তাঁর কাব্যটি ১৬৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রচিত হয়েছে। এই কবির আত্মজীবনী থেকেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়। কবি জাতিতে রাঢ়ীয় কায়স্থ। কবির পিত্রালয় সুখসাগর গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর আত্মকাহিনী সহজ ও সাবলীলভাবে বর্ণিত।

কবি কাব্যের শুরুতে ময়ূরভট্টের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁরই পদটি অনুসরণ করে তিনি কাব্য লিখেছেন, একথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরকাব্যের যতগুলি পুথি পাওয়া গেছে সবই খণ্ডিত। তাঁর রচনা বিবৃতিমূলক, পরিচ্ছন্ন এছাড়া অন্য কোনও অভিনবত্বের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা হলেন যদুনাথ ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তত দশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে দুজন হলে বিশিষ্ট ঘনরাম ও মানিকরাম।

● ঘনরাম চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। ঘনরামের কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়।

ঘনরামের কাব্যের ভণিতা থেকে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কইমড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দক্ষিণে। তাঁর পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা। পিতামহ ধনঞ্জয়, মাতামহ রায়না-নিবাসী। হরি ঘনরামের চার পুত্রের নাম হল রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী ছিলেন। এছাড়াও ঘনরামের ভণিতা থেকে জানা যায় ঘনরামের গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস। ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে সমাপ্ত হয় বলে মনে করা হয়।

নানা পুরাণ উপপুরাণ ও কাব্যকাহিনী থেকে গল্প উপমা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ঘনরাম তাঁর কাব্যকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিয়েছেন। এটি ২৪টি পালায় বিভক্ত—

(১) স্থাপনা পালা (দেবদেবী বন্দনা, অম্ভুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গ, ধর্মপূজা প্রচারে মর্ত্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জন্ম) (২) ঢেকুর পালা (ইছাই ঘোষের কাহিনী, (৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালায় হরিশচন্দ্র ও লুইসেনের কাহিনী, (৫) রঞ্জাবতীর শানে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর লাভ, (৬) লাউসেনের জন্ম, (৭) অখড়া পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, (৮) ফলা নির্মাণ পালায় দেবী প্রদত্ত অস্ত্রের দ্বারা ফলা নির্মাণ (৯) গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রা (১০) কামদল পালা-এর বিষয়বস্তু হল লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ বধ, (১১) জ্যামতি পালাতে আছে অসতী নারীদের কবল থেকে লাউসেনের আত্মরক্ষা, (১২) গোলাহাট পালায় সুরিক্ষার কবল থেকে লাউসেনের উদ্ধার, (১৩) হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙুর যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, (১৬) কানাড়া স্বয়ম্ভবর পালায় রাজা হরিপালের কন্যা কলড়ীর সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ (১৮) মায়ামুণ্ড পালায় মহামহের কুটিল চক্রান্তে লাউসেন পত্নীদের বিভ্রান্ত করার কাহিনী। (১৯) ইছাই বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নির্ধন, (২০) আঘোর বাদল পালায় গৌড়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর আয়োজন, (২২) মহাময় কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করতে এসে যথাযোগ্য শাস্তি পেয়ে পলায়ন, (২৩) পশ্চিমে উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা, লাউসেনের অসাধ্যসাধন (২৪) স্বর্গারোহন পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ—এই খানেই সমাপ্ত হয়েছে।

এই মহাকাব্যে বিশালায়ন কাব্যে ধর্মের সেবিকা রঞ্জাবতী। তাঁর পুত্র ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেন। লাউসেনের বীরত্ব ব্যঞ্জক নানা কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন প্রভৃতি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি থেকে নানা গল্প কাহিনী পুরাণের ছাঁটেই গ্রহণ করেছেন। ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পূজা প্রচারের চেয়ে কৃচ্ছসাধন এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ঐতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্প স্বল্প সাদৃশ্য রেখে এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতন ধারার অনুকরণ করে ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই বীররসাত্মক

মহাকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করেছেন। রঞ্জার বাৎসল্য, ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বাহুবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, গৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অলৌকিক অনৈসর্গিক কৃতিত্ব প্রদর্শন—এ সমস্ত কাহিনীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করেছেন। নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর শৌর্য বীর্যের প্রকাশ একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। লাউসেনের চরিত্র পরীক্ষা অংশেও ঘনরামের কৃতিত্বের অবিসংবাদী পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের কাব্যে ঘটনা উপস্থাপনা ও বর্ণনার গুণে তাঁর চরিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার বেশি প্রশংসা দাবি করতে পারে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ঘটনা বর্ণনা, চরিত্র শ্রেষ্ঠ মহৎ আদর্শের রূপায়ণ এবং মঙ্গল কাব্যের অলৌকিক পরিবেশ। সৃজনেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি সমসাময়িক অনেক কবির তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্য কাহিনী পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় প্রবাহিত হয়েছে। তিনি ভারতচন্দ্রের মত অলঙ্কারসৃষ্টি ও মণ্ডলকলানৈপুণ্য দেখাতে পারেননি, আবার মুকুন্দরামের মত প্রসন্ন জীবনচিত্রও তিনি ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। শিরায়নের কবি রামেশ্বরের বাস্তব চিত্রণের কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পারেন না। কিন্তু তাহলেও ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন।

● মানিকরাম গাঙ্গুলি

মানিকরাম ধর্মমঙ্গলের পরিচিত কবি হলেও তাঁর কাব্যরচনার সাল তারিখ ইত্যাদি নিয়ে বাগম্বিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। বাংলা ১৩১২ সালে হরপ্রসাদশস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে মানিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্মমঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন এইকাব্যরচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৪৬৯ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ দত্ত এর কাল নির্ণয় করেছেন ১৮৮৭ অব্দ অর্থাৎ এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পদের কবি। এর অন্যতম প্রমাণ হল তার কাব্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন উল্লেখ আছে—

বিষ্ণুপুর বন্দির শ্রী মদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥

৮.৭ অন্নদামঙ্গল

● কবি ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা মঙ্গলকাব্যের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যেও নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দশবছর ধরে পরিশ্রম করে অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী সংকলিত করে তার সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় তার প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্পর্কে আরও নানা ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে।

ভারতচন্দ্র ১১০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে বা রাধানগর গ্রামে এক জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে বিবাদে তাঁর পিতা নরেন্দ্ররায় হৃতস্বর্বস্ব য়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র চোদ্দ বছর বয়সে সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাজপুরের কাছাকাছি সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদের একটি বালিকা কন্যার পানিগ্রহণ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে ফার্সি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় একদিন রামচন্দ্র মুন্সির গৃহে সত্যনারায়ণ পাঁচালী পাঠ করেন। এইটিই তাঁর প্রথম রচনা। এতে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে—

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাতে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি
নরেন্দ্ররায়ের সুত ভারতভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।

১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র পারসীভাষা শিক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে তাঁর অগ্রজেরা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে তদ্বির করার জন্য তাঁকে বর্ধমান রাজসরকারে পাঠান। কিন্তু বর্ধমান রাজ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে ভারতচন্দ্র কারাগার থেকে পালিয়ে যান এবং উড়িষ্যার কটকে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল এক নাপিত ভৃত্য, তার নাম রঘুনাথ। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় তিনি হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর শালিকাপতির নিবাস ছিল। তিনি ভারতচন্দ্রকে চিনতে পেরে তাঁকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে কিছুদিন সেখানেই বাস করতে থাকেন। তারপর স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তখন ফরাসডাঙায় প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ভারতচন্দ্র তাঁরই শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে ১৯৫৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠালে তিনি ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁরই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দিয়ে গঙ্গাতীরের মূলাজোড় গ্রামে তাঁকে সামান্য খাজনায় ইজারা দেন। কিন্তু রামদেব নাগ নামে এক ব্যক্তির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। কৃষ্ণচন্দ্র এর অর্থ উপলব্ধি করে রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করার ব্যবস্থা করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের সময় অষ্টদশ শতাব্দী যুগসন্ধিক্ষণকে ধারণ করেছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর কাব্যে সেই নতুন যুগের রূপটি ধারণ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেশ থেকে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে। মুসলমান আমলের সেই চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মান দীপ্তি তৎকালীন সমাজের ওপর নিজের বিলীয়মান প্রভাবে অন্তিম প্রহর ঘোষণা করছে। অন্যদিকে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ পুষ্ট হয়ে দেশে এক নতুন অভিজ্ঞতা ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে লাগল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার বেশ রয়েছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নেই। চারদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করছে। প্রবৃত্তির এই নিম্নাভিমুখী গতি ভারতচন্দ্রকেও গ্রাস করেছিল। তাই তাঁর মহৎ প্রতিভা তিনি উপযুক্ত সৃষ্টিতে নিয়োগ করতে পারেননি। তৎকালীন জনরুচির কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'অন্নদামঙ্গল' রচনার আগেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পরিণত বয়সে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন—

বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথম খণ্ডের নাম 'অন্নদামঙ্গল বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলা'। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্ভবন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্ভবন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসূষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও 'মানসিংহ-কাব' কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্মচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্মনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গালকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গালে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

তিনটি কাহিনী। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা দেবতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ধরনের ভক্তিভাবের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মের গোঁড়ামি সবসময়ই পরিত্যাজ্য ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিবের মুখ দিয়ে ব্যাসের প্রসঙ্গে তা বলিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় আর কারো মধ্যে তা দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত অন্যান্য কবি নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্যের আদেশে পৃষ্ঠপোষকের পারিবারিক গৃহদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

সমাজজীবন সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসুন্দরে কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন যে কুলীনসর্বস্ব নাটক রচনা করেছিলেন, ভারতচন্দ্রের নারীগণের পতিনিন্দা থেকেই তিনি তার প্রেরণা পেয়েছিলেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তরে বড়দিদি হই।
* * * * *
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারিতায়
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥

অসম বিবাহে দাম্পত্যজীবনে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তা সমাজ সেদিন অনুভব করেনি। কারণ নারীমনের দুঃখ বেদনার অনুভূতি সেদিন অব্যক্ত ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র নারীমনের এই অব্যক্ত বেদনার অবরুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। অসমবিবাহই সে যুগের সমাজে নারীজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল। বিদুষী নারী তার কালা স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হল হত॥

হাস্যরসের আড়ালে মধ্যযুগীয় কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতাকে কবি এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের নাগাষ্ঠক শিখারিণী ছন্দেরচিত। অন্যান্য কাব্যে ও তার ছন্দকুশলতার পরিচয় আছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে এক বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবির্ভাব সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই অমর হয়ে আছে। চরিত্রটি ঈশ্বরী পাটনীর। ঈশ্বরী পাটনী চিরকালের নিরন্ন বাঙালির প্রতিনিধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দরিদ্র বাঙালি মাঝি দেবীর পায়ের স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া সেঁউতির অলৌকিকতায় ভুলে যায়নি। সে তার দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিজের জীবনে আলো আর পাবে না জেনেই দেবীর কাছে বর চেয়েছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

নাগাষ্টক, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আরঅমর সৃষ্টি অন্নদামঙ্গল ছাড়াও ভারতচন্দ্র রচনা করেছেন রসমঞ্জরী। এটি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নায়িকা প্রকরণ অবলম্বনে লেখা।

এছাড়াও আছে ভারতচন্দ্রের লেখা টুকরো কবিতা। ঋতুবিষয়ক দুটি কবিতা হল বসন্ত বর্ণনা ও বর্ষার বর্ণনা। এর মধ্যে বর্ষা বর্ণনায় আছে কৃষ্ণনগর প্রসঙ্গ—

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভূজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা।

এছাড়া হাওয়া বর্ণনা, বাসনা বর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি নামের টুকরো কবিতাও তাঁর রয়েছে। ভারতচন্দ্র মিশ্র ভাষায় চণ্ডীনাটক রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি শেষ হলে সাহিত্যরীতির অন্যন্য নিদর্শন হোতো। কিন্তু এর সামান্য সূচনা হয়েছিল মাত্র। এতে কবি সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় মলিনী ছন্দে লেখা 'গঙ্গাষ্টক' ও ভারতচন্দ্রে কবিপ্রতিভার নিদর্শন।

৮.৮ বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

● কৃষ্ণরাম দাস

কৃষ্ণরাম দাস ছিলেন নিমতার কবি। কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ছায়ায় তাঁর যশ অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ কে দিলে কৃষ্ণরাম দাসই বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখযোগ্য কবি।

কাব্যে কলি জ্ঞাপক হেঁয়ালি থেকে বোঝা যায়, ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাব্য সমাপ্ত করেন। কাব্যের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ও সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের নাম আছে। কবি বলেছেন মাত্র ২০ বছর বয়স তিনি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কাব্যের সুচনায় পৌরাণিক আখ্যান থেকে থাকতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু যে পুথি পাওয়া গিয়েছে তাতে লৌকিক আখ্যানটুকু আছে। মনে হয় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য পুথি লেখকরা পৌরাণিক অংশ বাদ দিয়ে লৌকিক নায়ক-নায়িকার আখ্যানটি নকল করেছিলেন।

কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক। দু-একটি জায়গায় ও চরিত্রে যৎসামান্য নতুনত্ব আছে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণরাম অশ্লীল শব্দ লিখতে সঙ্কোচবোধ করেননি। কলাবতী শম্নী ব্রাহ্মণীকে বিদ্যা যে ভাষায় লাঞ্ছিত করে সে ভাষায় অশ্লীল। দু একটি চরিত্র বর্ণনায় এবং পরিমিত ভাষা ব্যবহারের পরিণত কবিবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তার কাব্য প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তিনি মাটির ঢেলা দিয়ে বিরাট ইমারত গড়তে গিয়েছিলেন। আর ভারতচন্দ্র তাই দিয়ে বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন। হতে পারে, অপরিণতি বয়সের রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যগুলিও দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা।

● রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর

রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলের মোড়কে আদিরস প্রধান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিতে আদিরসের সঞ্চারের কারণ মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তক রামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমির দলিল দেখে মনে হয় তাঁর বিদ্যাসুন্দর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দরে কৃষ্ণরাম দাসকে অনুকরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কবি হওয়ার এবং একই ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সম্ভবত কেউ কাউকে বড় একটা অনুসরণ করেননি। ভক্তকবি

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কিছু উল্লেখযোগ্য। চরিত্র পরিকল্পনায় রামপ্রসাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। যদিও ভারতচন্দ্রের মত কবিত্ব ও রচনাকৌশল তাঁর ছিল না। তাই সমাগুণ সত্ত্বেও কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কাব্যটিতে দু একটি স্থানে অশ্লীল বর্ণনা আছে। এই অশ্লীলতা শিল্পের দ্বারা সংযত তিনি করেননি। কাব্যটিতে যত্রতত্র কালী সাধনার উল্লেখ করেছেন এবং বৈষ্ণবদের তীব্র নিন্দা করেছেন। যাই হোক, যুগধর্ম ও রাজপৃষ্ঠ পোষকতা রামপ্রসাদের এতটা প্রভাবিত করেছিল যে এই ভক্তকবি বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের কামকূপে ডুবতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করেননি।

● কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী কে বিদ্যোৎসমাজের সামনে নিয়ে এসেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের আগে ১৭শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে বিশুদ্ধ মঙ্গল কাব্যের ছাঁচে কলিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কাব্যটির শেষাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ার রচনাকাল জানা যায় না। তবে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কারণ তিনি কাশীজোড়ার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ ছিলেন। এঁর কাব্যে রাঢ়ের দেবদেবীর উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় কবি রাঢ়ের কবি। রচনা ও কাহিনী গ্রন্থনে অল্পস্বল্প নতুনত্ব থাকলেও এতে কবির বিশেষ কোনো প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুন্দরকে তিনি উৎকলের রাজপুত্র বলেছেন। কবি সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের শেষের অপ্রাসঙ্গিক আজগুবি গল্পের অবতারণা অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কাব্যটি নীরস হওয়ায় জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। তবে দেবদেবীদের কৌতুকাবহ চরিত্র বর্ণিত হওয়াতে খানিকটা চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে।

৮.৯ শিবায়ন

● রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্পতম। এর মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিব সংকীর্তন' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামেশ্বর ভারতচন্দ্রের পঞ্চাশ বছর আগে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দেড়শো বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন চিত্র, কাব্যকলা প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবি বলতে হবে। তবে রামেশ্বর মুকুন্দের মতো প্রথম শ্রেণীর কবি নন, আবার ভারতচন্দ্রের রচনাবৈদগ্ধ্যও তাঁর ছিল না।

রামেশ্বর কাব্যের মধ্যে তাঁর গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগনার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। রামেশ্বরের পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী। কবির দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবি ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের গ্রাম যদুপুর ত্যাগ করে কবি কর্ণগড়ের জমিদারদের সভায় পুরাণ পাঠকরূপে বসবাস করেন। তিতিন তাঁর কাব্যে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ওতাঁর পুত্র যশোবন্দ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—

রাজা রামসিংহ সুত যশোবন্দ নরনাথ
তস্য পোষা দ্বিজ রামেশ্বর

রামেশ্বরের দুখানি কাব্যগ্রন্থই প্রমাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। (১) শিবসংকীর্তন বা শিবায়ণ (২) সত্যপীরের ব্রতকথা। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নিঃসন্দেহে শিবায়ন।

রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন সাতপালা ও জাগরণ আর পালায় সমাপ্ত। প্রথম থেকে তৃতীয় পালায় পুরাণাশ্রিত কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। শিবের বিবাহ পর্যন্ত কাহিনী এতে আছে। কবি পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্লাসিক সাহিত্য থেকে এই অংশের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

হর পার্বতীর বিবাহের পর থেকে পৌরাণিক ও কাহিনীর পরিবর্তে কবি ক্রমশ লৌকিক শিবের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহন মূর্তিধারণ, হরগৌরীর বিবাহ দিয়ে তৃতীয় পালা শেষ হয়েছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এতে মহাদেবের ভিক্ষা উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ ইত্যাদি বর্ণিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত। যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ওজাগরণ পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগ্‌দিনী বৈশিনী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরা, শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাসে যাত্রার কাহিনী বর্ণিত। জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা পরবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্যে অভিমানিনী পার্বতীর পিতৃগৃহ গমন ও শিবের কৈলাসে যাত্রা, শাঁখা পরিয়ে বৃদ্ধ শিবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা এবং অবশেষে হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কাব্যে কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে শিবের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায়। এই লৌকিক কাহিনীগুলি কোনও প্রামাণ্য পুরাণে পাওয়া যায় না। কেবল নন্দিকেশর পুরাণে কিছু পরিমাণে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কহল, চাষবাস ও মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুরোপুরি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত। বিশেষ করে শিবের কৃষিকার্য ও ধন্য রোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণ কবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ইন্দ্রের কাছ থেকে শিবের জমির পাট্টা নেওয়া আর কুবেরের কাছ থেকে বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে মধ্যযুগে শোষণ আর বঞ্চনার শিকার সাধারণ বাঙালি কৃষাণের জীবন চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় বলেছেন—"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবনকাহিনী।"

আবার পার্বতীর মান-অভিমান, দারিদ্র্যের সংসার, পুত্র কন্যাদের জন্য চিন্তা, নিষ্কর্মা স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রদুষ্টি তাঁকে চিন্তাভার পীড়িত সাধারণ গৃহিনীতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে শিবের লাম্পট্য দোষও যেন সমকালীন এক শ্রেণীর মানুষে চিরত্রে শিথিলতার প্রকাশ।

রামেশ্বরের কাব্যের হাস্য কৌতুকে ভারতচন্দ্রের মতো মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য নেই, আছে গ্রাম্য কৃষাণ জীবনের স্থূলতা ও সারল্য। পুত্র সহ মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনা খুবই চমৎকার—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী
দুই সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
* * * * *
কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরি খা॥

সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্নগ্রহণ করলেন। মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনই যেন এখানে প্রতিফলিত। ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে সন্তানের "দুধে ভাতে" থাকার বর প্রার্থনা করেছিল। আর রামেশ্বরের কাব্যে সদ্যোবিবাহিতা কন্যার বিদায়ের সময় শাশুড়ী জামাতাকে অনুরোধ করেছেন—

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ॥

রামেশ্বরের কাব্যের কিছু কিছু বাক্য বিন্যাসও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন—

(১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলা কাটা

(২) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

(৩) দারিদ্রে দোষের পর দোষ নাই আর।

(৪) শমের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে।

অনুপ্রাসের ব্যবহারে করিব শব্দালঙ্কার নির্মাণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে—

(১) খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।

(২) চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া জিরন্তর।

ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

তবে কবি অনেক সময় শ্রুতিকটু অপ্রয়োজনীয় অনুপ্রাসও ব্যবহার করেছেন।

রামেশ্বরের কাব্য পাঠ করে মনে হয় তিনি হিন্দু ধর্মের এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। শিব শক্তির বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কবির গভীর নিষ্ঠা ছিল। কাব্যের নানা জায়গায় নিজের বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—

শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে॥

এমনকি মহাদেবের মুখ দিয়েও তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি চৈতন্যদেবের উল্লেখও করেছেন, রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন নিয়ে কিছু রঙ্গ কৌতুক করেছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে মিলিয়ে, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য বর্ণনায় খাদ মিশিয়ে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় যা রচনা করেছেন, তা একযুগের জীবন্ত সমাজচিত্রই হয়ে উঠেছে।

৮.১০ অনুবাদ কাব্য

৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি। রামায়ণ কাব্য ছাড়াও ইনি শিবায়ণ, বাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুনিরাম চক্রবর্তী। বাসস্থান মল্লভূমির নিকট। ইনি একাধিক মল্লরাজের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। রাজার প্রচলিত 'রামায়ণ'-এ অঙ্গদ রায়বার', তরণীসেন বধ' ইত্যাদি স্থানের অনেক স্থলেই এই কবির সরল রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৮.১০.২ রমানন্দ ঘোষের রামায়ণ

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বুধ্বাবতার রামানন্দ ঘোষ তাঁর 'রামায়ণ' কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য নেই। কিন্তু ভূমিকাংশে লেখা আত্মবিবরণী কৌতুকপ্রদ। নিজেকে তিনি বুধ্বাবতার বলে প্রচার

করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের (দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেভই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

কবির এই ভাবার্থ ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই ব্যাসদেব ঢাকা পড়ে গেছেন এবং কালের হাওয়ায় বৈষ্ণব ভাপুকতার যে পরিমল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই-ই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এর উদাহরণ দেওয়া যায়। উদূখলের বন্ধনে বাঁদা পড়ে কৃষ্ণ যমলার্জুন উদ্ধার করলেন। এই হল ভাগবতীয় কাহিনী, পরে পরম বিস্ময়ে নন্দ এসে কৃষ্ণকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি শ্রীদাম, সুদাম, প্রভৃতি সখার অনুরোধে বলরাম এসে ওজর ধরলেন, কৃষ্ণকে মুক্ত করে দেওয়া চাই। এতে ভাগবতের ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার বাৎসল্য ও সখ্য ভাবতরেক যুক্ত হয়েছে। মল্লরাজসভার বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বাস করে এবং রাজসভার উপযোগী কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিচন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাগবত কাহিনীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত—ভাগবতের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করেই কবি অনেক নতুন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। যেমন কবি বর্ণিত গেড়ুঁ খেলার পল্লবিত কাহিনীটি 'ক্ষেপণের ক্ষিপতর ক্বচিৎ' অথবা "ক্বচিৎ বিল্বের ক্বচিৎ কুষ্মেভরর ক্ব চামলকমুষ্টিভির"-র মত শ্লোকাংশে সামান্য ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। এইভাবে গেঁড়ু অন্তর্হিত করার কাহিনী 'মিলায়নৈর' শব্দের ইঙ্গিতে, লুকা লুকী খেলার কল্পনাসূত্রে 'অস্পৃশ্য নেত্র বন্ধাদৈর'-তে, হাডু-ডু খেলার সূত্র 'দর্দুর প্লবৈঃ" রাখাল রাজা খেলার সূত্র "কর্হিচিন্নপচেষ্টায়"-র মধ্যে নিহিত আছে। ফল ভোজন, কিরাতীয় উদ্ধার ও কিরাত সহ কিরাতিনীর অন্ডে স্বর্গ প্রাপ্তি প্রভৃতি উপাখ্যানের উৎসও ভাগবতের মাত্র দুটি শ্লোকের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের ফল ভক্ষণের কাহিনী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির একটি পরিচিত প্রিয় প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকাদের কাব্যেও আমরা ভাগবতের দুটি শ্লোককে অবলম্বন করে কাহিনী বয়নের চেষ্টা দেখেছি। কিন্তু কবিচন্দ্র বেশ একটি পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন। এই নির্মিতিতে কবির যথেষ্ট কৃতিত্বও প্রকাশিত হয়েছে।

ফল ভক্ষণ কাহিনীতে বৃদ্ধ ফল বিক্রেত্রীর যুবতীতে রূপান্তিরত হওয়া, গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার স্বামীর তাকে অপরিচিতা রমনী ভেবে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো কৃষ্ণমঙ্গলের নেই। এগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। আর কিরাতের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ মদনমোহন মন্দিরে কীর্তন নৃত্যরত আবিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের ছবিই যেন তুলে ধরে। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক লব্ধ প্রত্যক্ষ জীবনের ছবিই এখানে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়।

এ সমস্ত প্রসঙ্গ ছাড়াও ভাগবত পুরাণ বহির্ভুত কিছু কিছু কাহিনীও কৃষ্ণ কথার বর্ণনায় কবি গ্রহণ করেছেন। যেমন কর্ঘমুনর পারণ, কোকিল সংবাদ ও দিবা রাসের কাহিনী ভবিষ্যপুরাণ থেকে গৃহীত বলে কবি উল্লেখ করেছেন, যদিও বর্তমান প্রচলিত মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে এসব কাহনী নেই। অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত এই কবিও পারিজাতহরণ হরিবংশ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, নারদ পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কপোত কপোতী সংবাদও ভাগবতের কাহিনী নয়। এর কোনো পৌরাণিক উৎসত্ত জানা যায় না। কাহিনীটিতে শত্রু ব্যাধ ক্ষুধাতুর হলে, তার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কপোত কপোতী নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অতিথি পরায়ণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখেছে।

কলঙ্ক ভঞ্জনের নষ্টচন্দ্রদর্শড় প্রসঙ্গটি সম্ভবত ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ থেকেই গৃহীত। তবে পদ্মপুরাণেও এই কাহিনীটি রয়েছে।

চতুর্থত—এই কবির কাব্যের কিছু কাহিনী প্রত্যক্ষভাবেই গোস্বামীদের কৃষ্ণকথার উত্তরাধিকার। যেমন মুক্তা চাষের কাহিনী। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মক্তাচরিত্রের' প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কবি মুক্তাচরিত্রের প্রাথমিক ঘটনাটুকুমাত্র এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, পুরো কাহিনীটি বর্ণনা করেননি। কৃষ্ণকালী সংবাদ, রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধবের কাহিনী-কৃষ্ণের গৌরী মূর্তি ধারণের প্রসঙ্গজাত বলেই মনে হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা এই ধরনের কাহিনী পেয়েছি।

আবার এমন কিছু কিছু কাহিনী কবিচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, যা হয় তাঁর কপোল কল্পিত, নয় কোন লৌকিক উৎস সঞ্জাত। যেমন কাঠুরিয়া ভক্তি কাহিনী, মূষিক মার্জার লীলা প্রভৃতি। দাতা কর্ণের কাহিনীও মহাভারত কিংবা জৈমিনীয় সংহিতায় নেই, প্রসঙ্গটি জন্ম বাংলাদেশেই।

ভাগবতবতের 'গোবিন্দমঙ্গল' সম্পাদক যে গুরুদক্ষিণা পালাটি সংকলন করেছেন, তা কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তীর রচনা নয়। কারণ কবিচন্দ্র লেগোর দক্ষিণে অবস্থিত পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥

কিন্তু যে শঙ্কর কবিচন্দ্র গুরু দক্ষিণা পালাটি রচনা করেছেন, তাঁর বাস বর্ধমান জেলার কুলচন্ত গ্রামে—"শঙ্কর রচিল যার কুলচন্ত বাস"। এই পালাটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৫তম অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্ভবনে রচিত। গুরুদক্ষিণার কাহিনী অবশ্য অগ্নিপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতেও দেখা যায়। কিন্তু ভাগবত পুরাণের কাহিনীতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, অন্য পুরাণের কাহিনী থেকে একে সহজেই পৃথক করা চলে। যেমন শঙ্করের বর্ণনায় শঙ্খানুর হরিবংশ অনুযায়ী তিমি মাছ নয় শঙ্খ। ভাগবতের কাহিনীতে যমরাজ ভক্তিতেই কৃষ্ণের গুরু পুত্রকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন, কিন্তু হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রত্যর্পণ করেন। শঙ্কর এখানে ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কাহিনী বয়সে ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু প্রসঙ্গে কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি হেতু যমলোকে বন্দী সমস্ত পানীয় উদ্ধার প্রসঙ্গটি অভিনব। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংকলিত এই পালাটির আরও একাধিক পুথি পাওয়া যায়। যেমন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৬/প্রথম সংখ্যা) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে ২৪৬ সংখ্যক পুথিটি শংকরের গুরুদক্ষিণা পালার।

৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বলরাম দাস' অন্য বহু সমস্যার মতই এখনো পর্যন্ত সমাধানহীন একটি সমস্যা। গৌরপদ তরঙ্গিনীর সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাধিক সংখ্যক ১৯ জন বলরামের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাকে কিছুটা কমিয়ে (৫ জনে) আনার গবেষণা করেছেন। কৃষ্ণলীলামৃত রচয়িতাকে তিনি অন্যদের থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেই চিহ্নিত করেছেন। ইনি নিজেকে ভণিতায় 'দীন' বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য সব সময় যে করেছেন, এমন নয়—"কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে" ও ভণিতা হিসেবে দেখা যায়। এই দীন চিহ্নিত বলরাম দাস যে অন্যদের থেকে পৃথক, তা স্বীকার করা যেতে পারে। দীন বলরামের নামে যে দু'একটি পদ পাওয়া যায়, তাও হয়ত এঁরই রচনা হতে পারে।

বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত একটি কৃষ্ণলীলামূলক কাব্য, হেঁয়ালিতে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন—"অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী যকায়/এই পরমাণে সকাদিত্য এক জায়।।" (অজমুখ = ৪, ভুজ = ২, অঙ্গ = ৬, অশ্বিনী = ১) অর্থাৎ ১৬২৪ শকাব্দ বা ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দ কবির কাব্য রচনা কাল।

বন্দনাদির পর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে কবি কাব্য আরম্ভ করেছেন। দেখা যায় কাব্যের মধ্যে কবি গদাধর দাসের চরণ বন্দনা করেছেন—"শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।/কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে।।"

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ধারায় বলরাম দাসের কাব্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাব্যটির গঠনই অন্য সমস্ত কাব্যগুলোর থেকে কবিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সাধারণত শুক, শরদ জনমেজয়ের মুখ দিয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পৌরাণিক রীতির অনুবর্তন করেই কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনীসমূহ বয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বলরাম গ্রন্থারম্ভে একটি অভিনব কাহিনী

উপস্থাপন করেছেন— "মগদ্য দেশেতে এক রাজার কুমার/শুদ্রেতে কুলীর ছিল মহা অধিকার/ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈঞা মনে।/সকল ছাড়িয়া তিঁহো গেলা বৃন্দাবনে।।/ব্রজেতে কলি বাস বরিস দশেক।/সর্বশাস্ত্র পড়ি গ্রন্থ দেখিল অনেক।।/ইষ্টদেব স্থানে তিহোঁ বিদায় লইয়া।/প্রতি দেশে দেশে তিহোঁ বেড়ান ভ্রমিয়া।/ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস রাজার দেশে।/পাঞ্চাল নগরে রাজার করিলা প্রবেশে।।/জমুনার হেন কথা দুকুলে নগর।/তটের উপরে দির্ব্ব স্থান মনোহর।/

****

নদির তীরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।/পথশ্রম পাঞা তেহো গেলা তার কাছে।/পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।/দেখিয়া হরিন বড় হইলা অন্তর।/বসিলা বিবেক গ্রন্থ রাখিয়া ভূমিতে।/বেলা অবসান দেখি লাগিল ভাবিতে।/

****

এই মতে বসিয়া করেন আলোচনা।/দিবর্ব এক নিতান্তিবনী তথা আগোমন॥"

ইনি আত্ম পরিচয় দিলেন—

শোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতী।/শিশুকাল হৈতে করি গোবিন্দয-ভকতি॥/

****

আমার বাসাতে চল বৈষ্নব গোসাই।/করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ঠ ভাই॥

আর এক আছে মোর কনিষ্ঠা ভগিনী।/অলপ বত্রসে রাড়ি সেই অভাগিনী।/

যাই হোক বিবেকী শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়। সন্ধ্যাকালে সত্যবতীর অনুরোধে বিবেকী কৃষ্নকথা আরম্ভ করলেন। বর্ণনায় খন্ডিতা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা, প্রভৃতি রূপ নির্দেশিত রস পর্যায় যে বিবেকীর ভালভাবেই রন্ত, তা বোঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উৎকলিত হতে পারে—

"যেহেতু কলহ জন্মে কহিত্র তোমারে।/নাম না জন্মিলে রস পুষ্টি নাহি ধরে॥/

নাইকা ছাড়িয়া অন্য নাইকার ঘরে। রসের লালসে যদি নিরসক্তি করে॥/

সে কথা বেক্ত যদি হয় তার আগে।/মাণিনীর ভক্ত যদি হয় অনুরাগে॥'

এছাড়া কাব্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসেবে চিত্রণও রূপ গোস্বামী প্রভাবিত। সমস্ত কাব্যটির বুনুনী এই বিবেকী সত্যবতীর প্রশ্নোত্তর গ্রথিত। গঠনের দিক থেকে কাব্যটি যে অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে। এছাড়া কাব্য কাহিনী সম্পূর্ণ প্রেম ভক্তির ভোরে গাঁথা ব্রজলীলার উপাখ্যান। ঐশ্বর্য বর্ণনা কবি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্নের মথুরা গমনে গোপীদের খেদে কাব্য শেষ হয়েছে। কাহিনীর উৎস নির্দেশ করে বলা হয়েছে—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে/তাহা আমি করি বিরেচন।" বর্ণনার ক্ষেত্রে করিব ক্ষমতা নিতান্ত মন্দ নয়। নায়িকার মানে কৃষ্নের বিরহ অবস্থার একাংশ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়—

"বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ন হইঞা হৃদএ তৃষ্না
ঘন ঘন ছাড়েন নীশাস।
মাগধী তলাতে বসি ফেলাঞা হাতের বাশি
নি(ি) রক্ষণ করে দিগ পাষ॥

পথে রাধা না দেখিয়া পড়ে মূর্ছাগত হৈঞা
পুন উঠে পথ পানে চায়।
মুণ্ডে (?) পানি হানি কহে আজি প্রাণ নাহি রহে
কি হইল করে হায় হায়॥"

৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথ-এর ভাগবত

এই কবির কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যটিতে পৌরাণিক কাঠামোর অনুসরণে শুক, নারদ, অথবা পরীক্ষিত জনমেজয়-এর কথোপকথনে কাহিনী বিকৃত হয়নি। কাহিনীর বক্তা কবি নিজেই অবশ্য এর আগেও কখনও কখনও স্বয়ং কবিকে বিবৃতিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। কাব্য প্রারম্ভে দেবকী ও যশোদার সাধনা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য তাঁরা কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন, সেই তপস্যার সময়—

—ধরিল শিশুর বেশ দেব নারায়ণ।
দেবকী নিকটে আসি দিলা দরসন॥
দেবকী আছেন চক্ষু মুদ্রিত হইআ।
ছল করি কৃষ্ণ তোথা দান্ডাইল গিয়া।
নিজরূপ ধরি প্রভু দৈবকীরে কন।
কি হেতু করহ তপ থাকিআ নির্জন॥

তখন দৈবকী বর চাইলেন "তুমা হেন পুত্র জেন এই জন্মে পাই।।" যশোদাও সেই প্রার্থনা করলেন।

ধরা দ্রোণ, সুতপা, পৃশির তপস্যার প্রসঙ্গ ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। এঁরাই পরে যথাক্রমে যশোদানন্দ ও বসুদেব দেবকী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কবি সেই প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এরপর কাহিনী যথারীতি ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর দুঃখ জ্ঞাপনে আরম্ভ হয়েছে। দেবকীর বিবাহ, কংসের প্রতি দৈববাণী ইত্যাদি ভাগবত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভণিতাংশে কবির নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায়। যেমন—

(১) দ্বিজ রমানাথ বলে গোবিন্দ কৃপায়॥
(২) দ্বিজ রমানাথ বলে কৃষ্ণের কৃপায়॥
(৩) অঘাসুর বধ করা শুনে জেই জনে।
তার সত্রু নাস জায় রমানন্দ ভনে॥

পুথিতে ভাগবতের কাহিনী, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, মুখব্যাদনকারী কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন, গর্গের নামকরণ, উদুখলে বন্ধন, বৎসাসুর বধ, বকাসুর ও অঘাসুর বধ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গের তুলনায় কালীয়দমন প্রসঙ্গ দীর্ঘ। এছাড়াও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পেতে চেয়ে গোপীগণের কাত্যায়নী পূজার কাহিনীও এখানে আছে— "নন্দের নন্দনে দুর্গাস্বামী করি দিব।" কবি বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। যজ্ঞস্থানে রাখালদের অন্নপ্রার্থনা, ঋষি পত্নীদের কৃষ্ণকে ভোজন করানো, গোবর্ধন, ধারণ, কুক্ষণে, স্নানের সময় বরুণের অনচর কর্তৃক নন্দকে হরণ ও কৃষ্ণের নন্দ উদ্ধার প্রভৃতি ভাগবতীয় কাহিনী বর্ণিত। এছাড়াও অবিষ্টাসুর বধ, ব্যোমাসুর বধ ও অক্রুরের ব্রজে আগমন, কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা, গোপীগনের বিলাপ, পথে যমুনায় স্নানকালে

অক্রুরের জলের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন, কৃষ্ণের মথুরায় আগমন রজক হত্যা ও শিশুগণকে বস্ত্র বিতরণ পর্যন্ত কাহিনীর পর পুথি খণ্ডিত হয়েছে।

এই সমস্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও এই কাব্যে দানলীল, নৌকালীলা ও জলক্রীড়ার কাহিনী আছে। দানলীলার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

'আর রপে গেলা কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
দানছলে রহিলেন কদম্বের তলে॥
হোথা সে শ্রীমতি গিয়া সখি ডাকে বলে।
বিধাতা কলি যদি গো গোয়ালার জাতি।
দধিদুগ্ধ বিকিকিনি এই মোদর বিত্তি।

রাধা সঙ্গে বড়াইকেও নিলেন, এরপর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

নিতি নিতি জাহ বিকে দান দেহ কোন লোকে
ভুলিইয়া গেছ বহু দানি॥

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলার বড়াই র ভূমিকাটি খুবই সক্রিয়। দানী দান চাইলে সমস্যায় পড়েছেন গোপীরা। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল বড়াই এবং সমস্যার সমাধানও করল।

নৌকালীলার বর্ণনাও রয়েছে। নৌকালীলার পর রাস, কাত্যায়নী ব্রত ও শঙ্খাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গের পর কৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। জলক্রীড়া প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চন্দ্রাবলী এখানে রাধার সঙ্গে এক নয়, পৃথক চরিত্র। জলক্রীড়ার সময় চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ায়, কে চুরি করেছে জানার জন্য সবার বস্ত্র আভরণ ঝেড়ে দেখা হল। জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কবির কপোলকল্পিত।

এ কাব্যে দু একটি রাগিনীসহ কিছু প্রদত্ত পাওয়া যায়। যেমন কালীয় দমন বর্ণনাকালে একটি করুণারাগের পদাংশ—

কোথাকারে গেলিরে প্রাণের কানাই রে
তোমা বিনে সখা কেহো নাঞি রে।

অপর একটি পদের রাগ মালসি, গোবর্ধন ধারণ লীলায় যুক্ত হয়েছে। মল্লার রাগে আর একটি পদ আছে। এছাড়াও ধনশ্রী, কামদ, বিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। এই পুথিটি ঠিক বিশুদ্ধ আকারের পাওয়া যাচ্ছে না। একটি ভণিতায় আছে—

হেন বেলে কোকিলের কলরব শুনি
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণরস বাণি।

এরপর রাসের বর্ণনা রয়েছে। অথচ চৈতন্যোত্তর কালের পরিচিত বৃদ্ধাদূতীর চরিত্রটি এখানে উপস্থিত—

এত যদি বলিলেন রাই বিনোদিনী।
কান্দে কান্দে বলে বৃদ্ধা আধ আধ বাণী।

পুথিটি যদি নির্ভেজাল হত, তাহলে রমানাথের পরিচয় স্পষ্ট হত।

৮.১১ শাক্ত পদাবলি

● রামপ্রসাদ সেন

বাংলা ভক্তি সংগীতের ধারায় শ্যামাবিষয়ক পদরচনার ঐতিহ্যের প্রবর্তক রামপ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কবির পদগুলি লোকমুখে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে রামপ্রসাদের পদের অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়েও রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ— "ব্রহ্মণে আমরা একটি ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা সাধু পুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্বস্থানে পরমার্থ সাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারিদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বজলা যায় না।"

ভক্তির এই সহজ উৎসারণেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ তিন তান্ত্রিক সাধক, এইরূপ পরিচিতি তাঁর ভক্তি ভাবনাকে যেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন—

"(রামপ্রসাদ) সাধকরূপে প্রাচীন তন্দ্র সাধনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি রূপে তাঁহার প্রকাশরীতি ও অনুভুতির স্বকীয়তা আধুনিকত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পদাবলিতে রূপবর্ণনা ও সাধনাক্রম নির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। কিন্তু মাতৃরূপিনী বিশ্বশক্তির সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রচেষ্টা মধ্যে তাঁহার যে মানবিক আবেগ-আকৃতি ও দুরূহ তত্ত্বে অনুপ্রবেশ শীলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আধুনিক।" রামপ্রসাদের পদে তান্ত্রিক উপাসনার সাধন সংকেত থাকলেও প্রকৃত ভক্ত কবি কোথাও উপচার বা মন্ত্র তন্ত্রের যান্ত্রিকতাকে সহজ ভক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেননি। পুনরায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণ করা যায়—

"তন্দ্রসাধনায় সুকোমল হৃদয় বৃত্তির বিশেষ কোনো স্থান নাই—বরং সাধারণ প্রবৃত্তির উৎপাদনের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। নারী লইয়া সাধনা, মদ্যমাংসের উপচার, নরবলি, কৌমার্যহরণ প্রভৃতি নৃশংসাচার। শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে পূজানুষ্ঠান এ সমস্তই সহজ জীবনযাত্রা ও ভক্তি নিবেদন প্রণালির বীভৎস ব্যত্ক্রম। এই কঠোর তপসচর্চা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দয়া মায়া প্রীতি মান অভিমান আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার প্রলয়ংকারী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংসতার অন্তরালে স্নেহ মমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া রামপ্রসাদ দেবী ও মানবের সম্পর্ক রহস্যকে এক সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, কলকাতা তখনও এমন কিছু নগর অভিধা পায়নি। তবু রাজসভার অস্তিত্বে, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের অবস্থান গৌরবে, দেশের বহমান অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনে, উচ্চশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যবোধে, বিলাসব্যসনে ও শ্রেণী বৈষম্যের কারণ সৃষ্টিতে এক জাতীয় সামাজিক নাগরিকতা বা সোশ্যাল আরব্যানিটি গড়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রর কাব্য সেই অর্থে নাগরিক কিন্তু রামপ্রসাদের পদ সেই তুলনায় সম্পূর্ণ কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণসমাজের সৃষ্টি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন ঃ-"রামপ্রসাদের ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাংলার গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিবত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সত্যকার গ্রাম জীবন, ইহার মধ্যে কোনো

ভাবাদর্শগত রূপান্তর কল্পনাবিলাস নাই। এই গ্রামজীবন অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতীক, কিন্তু ইহা স্বধর্ম হারায় নাই, ইহার অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উবিয়া যায় নাই।"

রামপ্রসাদের আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি পর্যায়ের গান বাঙালির চিরকালের সম্পদ। তিনি নিজে তন্ত্র সাধক ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্র সম্মত আবার নিষ্ঠ কর্ম কাও পরিহার করে সাধারণ মানুষের কর্মক্লিষ্ট জীবনের সহজ মাতৃ ব্যাকুলতায় ভক্তিকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবৎকাল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। এই সময় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ বন্ধন ব্যক্তিতান্ত্রিকতার আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে। বিশ্বাসের জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে সংশয়। রামপ্রসাদের গান এই সংশয়পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আলোর সংকেত। তাঁর আগমনী ও বিজয়াগানে বাঙালির একটি সামাজিক প্রথা রূপায়ণ। কন্যা বিরহাতুরা মেনকার বেদনায় এই পদগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝঘড়া জামাই বলে মানব না।

আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের গান বাংলা ভাষায় প্রথম কে রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে প্রাপ্ত লিখিত পদের মধ্যে রামপ্রসাদই সম্ভবত প্রাচীনতম কবি। রামপ্রসাদের এই আগমনী বিজয়া পদগুলি গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতা বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত। তবুও কবি কখনও কখও পাঠককে মনে করিয়ে দেন গৃহাগত কন্যা আসলে জগজ্জননী বিশ্বপালত্রী মহামায়া, নিছক লীলা বসে তাঁর মানবীরূপ কন্যারূপ ধারণ করা। রামপ্রসাদ তাঁর একটি আগমনী, বিজয়াপদে ব্রজবুলিমিশ্রিত ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলির গোষ্ঠলীলার অনুসরণে উমাকে বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠপদের কৃষ্ণের মত বেণুবাদীকা ও ধেনুচারণরত মূর্তিতেও দেখেছেন।

উপাস্যতত্ত্বের পদেও রামপ্রসাদ বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাবে শ্যামাজননীকে দিয়ে রাসলীলার শাক্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। আবার কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে স্থূল মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে বিশ্বব্যপ্ত বিমূর্ত মহাশক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা সে মা-টি কি মাটির বালা
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে।

কখনও কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে প্রত্যহের পরিচিত বস্তু বা বিষয়ের নিপুণ রূপক ব্যবহার করে তাঁর দেহাধীন জীবনের কর্মভার ও সংসার গ্লানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি একটি উদারনৈতিক চেতনার প্রবর্তন করেন। রামপ্রসাদের এই ধর্মীয় উদারতারই মূর্ত রূপ দেখা যায় পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

● কমলাকান্ত

বাংলার শাক্তপদ সাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতই গৌরভ লাভ করেছেন। ভক্তিরস, সঙ্গীতরস ও কবিত্বে তিনি প্রায় রামপ্রসাদেরই সমতুল্য। তিনি বর্ধমান নিবাসী সাধক ছিলেন। বর্ধমানের রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে ভক্তি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজবাটী থেকেই তাঁর প্রামাণিক পদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর

পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। তাঁর চরিত্রেও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান রাজেরা তাঁকে সভাপণ্ডিতও করেছিল। রামপ্রসাদের মতই তাঁর জীবনও নানান অলৌকিক গল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়, তখন মুমূর্ষ কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে যেহেতু গঙ্গা দুর্গার সপত্নী তাই তিনি গঙ্গার তীরে যাবেন না। তাঁর জীবনের সাল-তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় ৫০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় ৩০০ পদ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর শাক্ত সঙ্গীতগুলিকে রামপ্রসাদের সাধকসঙ্গীতের উত্তরাধিকার বলে মনে করা হয়। কমলাকান্তের আগমনী পদগুলি অবশ্য সেই তুলনায় ঠিক ভক্তিগীতি নয়, বরং কবিওয়ালাদের মত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। কমলাকান্তও যথারীতি মেনকাকে দিয়ে শরৎপ্রভাতে কন্যার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই স্বপ্নে দুর্গা-রূপের সঙ্গে কমলাকান্ত উপাসিত কালিকারূপের স্মৃতি মিশে গেছে। কমলাকান্তের একাধিক পদে মেনকার স্বপ্ন দর্শন কাব্যের বিষয় হয়েছে। স্বপ্ন ব্যথিতা জননী মেনকা আপাত নিশ্চিন্ত গিরিরাজকে কন্যা আনয়নের জন্য নানা ভাষায় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও গঞ্জনা জানিয়েছে—

কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হইয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কী আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জমন কেবল যন্ত্রণা সহিতে।

বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা আগমনী বিয়জা পর্যায়ের গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে। এছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোনো দিক দিয়ই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন—

১. সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি॥

২. তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী॥

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ় সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছুটা শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি লিখেছেন—

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে দিলে আর কোন শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণবপদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার মূল্য বেশি নয়।

৮.১২ নাথসাহিত্য

নাথ সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকে সাধনভজন করে আসছিল এবং এখনও এরা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি ছড়া গান ও আখ্যানকাব্য বাংলাসাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ দশম দ্বাদশ শতব্দীর দিকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু আদিনাথ-মীননাথ কাহিনীর শুরু অষ্টম শতকে। গোপীচাঁদের গান সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে। কিন্তু ময়নামতীর গান লোকসাহিত্য হিসেবে বিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছে।

মৌখিক নাথ সাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে হাজার বছর আগেকার জীবনচেতনার, জীবনযাত্রার, সমাজের ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন ও আভাস মেলে।

নাথ সাহিত্য বলতে আমরা নিম্নলিখিত রচনাগুলিকেই বুঝি—

(১) গোরক্ষ বিজয় (২) মানিকচন্দ্র রাজার গান (৩) ময়নাবতীর গান (৪) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস (৫) যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত (৬) চৌরঙ্গীনাথ (৭) সাধন মাহাত্ম্য (৮) যোগীর গান (৯) যোগীকাচ (১০) যোগ চিন্তামণি।

হিন্দি-মারাঠী-উড়িয়া-তিব্বতী ভাষায়ও এইসব কাহিনী প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মীননাথ গোরক্ষনাথ কাহিনী সর্বভারতীয় এবং নেপালে তিব্বতেও প্রচলিত।

এই নাথপন্থীরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ভিষগ্‌বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষমুক্তি নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এক কথায় এঁদের যোগী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নাথ ধর্মে যে নজন গুরুর কতা জানা যায় বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও তাঁদের পূজা করতেন। চর্যার পদে ও টীকায় নাথ ধর্ম ও নাথ গুরুর উল্লেখ আছে।

নাথ সাহিত্যে সমস্ত কাহিনীর মধ্যে দুটি কাবিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) গোরক্ষনাথের মহিমা বিষয়ক কাহিনী এবং (২) ময়নামতী-গৌপীচন্দ্রে গান।

গোরক্ষনাথকে নিয়ে শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেই নানা ধরনের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে আবার অনেকে ঐতিহাসিক পুরুষও বলতে চান।

অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় তাঁর কাল বলা হয়। তিনি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতেই কোন সময় বর্তমান ছিলেন। পরে শিব-মৎসেন্দ্রনাথের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

গোরক্ষ বিজয়ের তিনখানি পুঁথি পাওয়া যায় (১) ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (২) মুন্সী আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় (৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের গোর্খ-বিজয়। যোগী সম্প্রদায়ের গায়কেরা এই তিনজনের রচনাকেই একসঙ্গে গ্রথিত করে গান করে থাকেন।

গোরক্ষ বিজয় মীন চেতননের আখ্যানে নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ গোরক্ষনাথ কিভাবে তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার করলেন একাব্যের মূল কাহিনীতে তারই পরিচয় আছে। আদিপুরুষ নিরঞ্জনের মুখ থেকে শিব, নাভি মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ, কান থেকে কানুপা এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম হল। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মালেন গৌরী। গৌরীকে শিব বিয়ে করলেন নিরঞ্জনেরই আদেশে। এরপর মীননাথ ও হাড়িপা মহাদেবের শিষ্য হলেন, গোরক্ষনাথ মীননাথকে গুরু বলে বরণ করলেন এবং কানুপা হলেন হাড়িপার শিষ্য।

এরপর তাঁরা সবাই যোগী হে তপস্যায় বসলেন। একদিন শিব গোপনে গৌরীকে "মহাজ্ঞান" তত্ত্ব বোঝানোর সময় মীননাথ মাছের রূপ ধরে তা শুনে নিলে ক্রুদ্ধ শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি যা শুনেছেন তা ভুলে যাবেন। এরপর একদিন শিবের শিষ্যদের চরিত্র শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পার্বতী তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য সবাই তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁকে জননীরূপে কল্পনা করলেন। তখন দুর্গা অন্য সবাইকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথকে তিনি আরও কঠোর পরীক্ষায় ফেললেন। এতেও গোরক্ষনাথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এরপর শিবের অনুরোধে বিবাহ করেও গোরক্ষনাথ পথে বেরিয়ে পড়লেন এবং একসময় শুনতে পেলেন যে তাঁর গুরু মীননাথ কদলীরাজ্যে গিয়ে জপধ্যান বিসর্জন দিয়ে ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর বিন্দুনাথ নামে একটি পুত্রও জন্মেছে। গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে সংসার মোহ থেকে নির্গত করে আবার যোগ সাধনার পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। গোরক্ষনাথ এজন্য প্রথমে বিন্দুনাথকে মেরে ফেললেন। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। তখন তিনি বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে দিয়ে কদলীরাজ্যের সব রমনীকে বাদুড় করে উড়িয়ে দিলেন। এরপর মীননাথ ও তাঁর পুত্র বিন্দুনাথ উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে শিবের অন্যতম শিষ্য গোরক্ষনাথের চরিত্র মহিমাই প্রধান হয়ে উঠেছে। গোরক্ষনাথের অবিচল মায়ামোহ বর্জিত নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আবার কদলীরাজ্যে নরীসঙ্গে মুগ্ধ মীননাথের চিত্রও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এই কাহিনীতে উচ্চতর কাব্যসৃষ্টির উপাদান থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ কবিরা ছিলেন বেশির ভাগই অল্পশিক্ষিত আর শ্রোতারাও ছিল নিরক্ষর। এই কাব্যধারার সর্বাধিক পরিচিত কবি হলেন শেখ ফরজুল্লা। কাব্যের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মহিমা যে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি, শিবদূর্গার চরিত্রচিত্রণ থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এই কাহিনী মধ্যযুগে সারা বাংলাদেশেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ময়নামতী গোপীচন্দ্রের গান এই ধারার আরগ এক জনপ্রিয় কাহিনী। বাংলাদেশের নানা জায়গায়, এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবন নিয়ে নানা সকরুণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীটির আদি উৎস বঙ্গভুমি এবং এখান থেকেই এটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রাজা গোপীচন্দ্রে সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনীটি এই কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। রানী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাঁর সেই দিব্যশক্তি বলে বুঝলেন যে রাজা মানিকচন্দ্রের তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। কিন্তু

মহাজ্ঞান গ্রহণ করলে মৃত্যু হবে না। রানী ময়নামতী রাজাকে তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞান গ্রহণ করতে বললে রাজা তাতে স্বীকৃত হলেন না। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। যমদূতের সঙ্গে ময়নামতী তুমুল যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রাজার প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না। রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পর ময়নাবতী পুত্র গোপীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করল। গোপীচন্দ্রের বিবাহ হল অদুনা-পর্দুনা নামের দুজন রাজকন্যার সঙ্গে। ময়নামতী যখন তাঁর দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্রেরও স্বামীর মতই অকাল মৃত্যু হবে,তখন তিনি তাকেও হাড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাসী হতে বললেন। কিন্তু তরুণ যুবক গোপীচন্দ্র তাঁর স্ত্রীদের ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজী হলো না। অদুন-পর্দুনাও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে গোপীচন্দ্রর সহায়তায় কলঙ্ক লেপন করলে। নিজের কলঙ্কহীনতা প্রমাণের জন্য ময়নামতী ছেলের কাছে পরীক্ষা দিলেন। এরপর বাধ্য হয়েই গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হল। ময়নামতীর গুরু হাড়িসিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ীতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। দেখতে দেখতে সন্ন্যাসের কাল শেষ হল। হাড়ি সিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ী থেকে উদ্ধার করে মহাজান মন্ত্র দান করলেন। গোপীচন্দ্রে আর অকাল মৃত্যু হলো না। দুই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই কাহিনীর যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর-মাহমুদ প্রভৃতি বিভিন্ন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। পুঁথিতে অবশ্য কাহিনীকে অল্প কিছু পরিবর্তিত করা হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে। এই কাহিনীর মানবিক আবেদন সম্পন্ন অংশগুলি বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত। বিশেষ করে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভাবনা জানতে ওপরে অদুনা-পদুনার কান্নার মধ্যে একটি করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। অনেকে গোপীচন্দ্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেও মনে করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের কাছ থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান'নামে দেবনাগরী হরফে ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রংপুরেই এই গানের সর্বাধিক প্রচলন আছে। এছাড়া এই গোপীচন্দ্রের গানের আরও নাা পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলিকে ঠিক প্রামাণ্য বলা যায় না। মৌখিক সাহিত্য হিসেবেই এটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাসাহিত্যে চলে আসছে।

৮.১৩ মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গীতিকা সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে প্রকাশ করেন।

এই কাব্যগুলি আসলে লোকসাহিত্য। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে নামে একজন লোকসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কয়েকটি লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র তাঁকে উৎসাহ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে চন্দ্রকুমার দে, জলীমুদ্দিন ও আরও কয়েকজনকে বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে বিভিন্ন গীতিকা সংগ্রহ করেন। গীতিকাগুলির মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্কও লীলা, মদিনা, দস্যু কেনারাম ইত্যাদি পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর এর আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে।

এই গীতিকা হল কবিতায় বা গানে বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। গ্রামের একেবারে সাধারণ মানুষ নরনারীর প্রেমঘটিত কোনো রোমান্টিক আখ্যান, জমিদারদের দলাদলি বা ঐ জাতীয়

লোকজীবনের অন্য কোনো কৌতুহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া পাঁচালীর ঢঙে মুখে মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন। আর গায়েনরা তাতেই সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন।

এই গীতিকাগুলিতে যে জীবন ও যে সাজের ছবি উদঘাটিত হয়েছে, তা মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যের থেকে পৃথক। এখানে সমাজ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নয়। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চাঁদ বিনোদ সমাজের একেবারেই পরিচিত চোখে দেখা মানুষ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, ধর্মান্ধতা নয়। সংগৃহীত পালাগানের মধ্যে যেগুলোতে প্রেমপ্রণয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি পালার উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরপেক্ষ প্রেম বর্ণনা গীতিকাগুলির সম্পদ। এর রচনা সরল আবেগ, উচ্চতর প্রেমের আদর্শ, প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ প্রভৃতি গ্রাম্য কাহিনী কৃত্রিম সাহিত্যের মধ্যে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছে। বিশেষত জাতি সম্প্রদায়হীন মানবপ্রেমের মহিমা বর্ণনার জন্য কৃষককবিরা পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছেন। গাথাকেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের মধ্যে গীতিকাগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য গাথার থেকে বাংলা গাথাগুলি আবেগ, পবিত্রতা, ত্যাগ, সরলতার দিক থেকে অধিকতর প্রশংসনীয়। আবার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু পালার কাব্যগুণ বিশেষ উৎকৃষ্ট নয়, নগণ্ণ। উদাহরণ হিসেবে হাতীধরা, জমিদারের বিরোধ, তীর্থ স্থান নিয়ে কলহ পালাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রণয়বিষয়ক পালাগুলিই উৎকৃষ্ট। এবং এই ধারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পালা 'মহুয়া' তুলনাহীন এই পালাটিতে বেদে প্রতিপালিত 'মহুয়া'-র সঙ্গে উচ্চকুলোদ্ভব জমিদার নদ্যার চাঁদের বেদনামধুর লিরিক আবেগে কম্পমান প্রেমের গল্প বলা হয়েছে। এই লোকগাথাটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গাথা-সাহিত্যের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তথাকথিত ভদ্রসমাজে ঠিক এই ধরনের বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র এবং উদার সাম্প্রদায়িক মিলনের রূপ বিরল। ভদ্রসাহিত্যে অনেক পাণ্ডিত্য, কারুকার্য থাকতে পারে, কিন্তু গাথার অনাবৃত সন্দৌর্য এবং নিরাভরণ ঐশ্বর্য মধ্যযুগের পুঁথিজীবি সাহিত্যে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

মৈমনসিংহগীতিকার ও পূর্ববঙ্গগীতিকায় রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশ কবিদের প্রকৃতি বর্ণনার মৌলিকতা আর রূপ মুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছে। এই জাতীয় কাব্যে আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ভাগল আঁখি, তেল ফুরাণ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাখা পরভাত প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি সজীব কল্পনার নিদর্শন এবং রূপচাঞ্চল্যের দ্যোতক।

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংরে প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কম তীক্ষ্ণ নয়। কেনারাম ডাকাতের চোহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থমথমে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়ন ত্রস্ততা প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিক কথাও কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে। দু'একটি গ্রামজীবন উপমার প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবন ক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।—

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উছে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে॥

(নুরন্নেহা ও কবরের কথা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির এই ধরনের উপমা ব্যবহার করতেন না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধূয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই বাক্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে—

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি॥ (ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্য সংযোজনারীতি লোকসাহিত্য বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে আধুনিক ভাষার ব্যবহার প্রচ্ছন্ন আছে তা বোঝা যায়। তা দিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা বাগিউত্তাত্ত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশ মৌলিক যে পালাগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলির ভাষা একেবারেই যথাযথ রেখে প্রকাশ করা হয়েছে, এছাড়া তিনি অনেকগুলি নতুন পালাও আবিষ্কার করেছেন। সম্পাদনার জন্য রচিত তাঁর নিবন্ধগুলিও গীতিকার স্বরূপকে বুঝতে সাহায্য করে।

৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ মানববিষয়ক কাব্যের অবতারণা প্রধানত করেছিলেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিরা। মনব-মানবীর প্রেমবিরহ মিলনের যে রোমান্টিক চেতনা তাঁদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা তাঁর আয়ত্ত করেছিলেন আরবী-ফারসী ভাষার প্রণয় কথার মাধ্যমে। চট্টগ্রামের কবিরা যে সমস্ত হিন্দীকাব্য থেকে তাঁদের কাব্যরচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাদেরও উৎস আরবী-ফারসী ভাষার কাব্য।

বৃহত্তর বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে চাটিগাঁ রোসাঙের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই অঞ্চল তখন আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানীরা বর্মী হলেও আরাকান রাজসভায় প্রথম থেকেই বর্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্মেলনের এক সহজ পরিবেশ প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল। আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা ধর্মসূত্রে যেমন পালি প্রাকৃতভাষার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলনে, তেমনি তাঁদের রাজসভাসদ ও প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। অতএব রোসাঙ রাজসভাতে একাধারে আর্যভারতীয় এবং মুসলমানী সংস্কৃতির চর্চা সুপ্রচলিত ছিল। কবি দৌলত কাজীর বর্মনায় আছে যে রোসাঙ রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার মধ্যেও বাংলাই ছিল রোসাঙের দেশি ভাষা সাহিত্য। এর ফলে ঐ অঞ্চলের গড়ে ওঠা সাহিত্য বিচিত্র ভাব ও সংস্কৃতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করলেও তা হল বাংলা সাহিত্য।

● দৌলৎ কাজি

দৌলৎ কাজি একখানি মাত্র কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটিকেও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তবুও তিনিই চট্টগ্রাম রোসাঙের শ্রেষ্ঠ কবি। রোসাৎ শহরে বসে কাব্য লেখার সময় কবি রোসাঙের অবস্থান নির্দেশ করেছেন—

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসান্দ-নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খবরও কবি দিয়েছেন। 'রোসাঙরাজ শ্রীসুধা'র "ধর্মপাত্র" ছিলেন আশরফ খার এঁরই নির্দেশে কবি দৌলৎ তাঁর কাব্য রচনান্ত করেছিলেন। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। আশরফখান গোছারী ঠেট ভাষা ছেড়ে সহজবোধ্য ভাষায় কবিকে কাব্যরচনার নির্দেশ দেন। কবি সাধন রচিত "মৈনা সত" কাব্যের অনুসরণেই কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু দৌলতের কাব্য হুবহু অনুসৃতি নয়। সাধনের কাব্যকাঠামোকে আশ্রয় করে দৌলৎ কাজির কবিমানস ভাব-কল্পনার সৌন্দর্যলোকে অবাধ সঞ্চরণ করেছে।

দৌলত কাজির কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। রাজপুত্র লোরকের সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী ময়নামতীর বিবাহ হয়েছিল। একদিন লোরকের অরণ্যবিহারের ইচ্ছা হল। তিনি রানী ময়না ওবং বৃদ্ধ পাত্রদের ওপর

রাজ্যভার দিয়ে বলে গেলেন। সেখানে এক যোগীর কাছে অপূর্ব রূপবতী গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিষ্ঠিত দেখে লোর মুগ্ধ হলেন। চন্দ্রানীর স্বামী মহাবীর বামন গোহারী রাজ্যকে শত্রুর সর্বশঙ্কামুক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল ব্যর্থ। এদিকে লোর তো চন্দ্রানীর সন্ধানে গোহারি রাজ্যে এলেন এবং বামনের অনুপস্থিতির সুযোগে চন্দ্রানীর সঙ্গে তাঁর গোপনে মিলন হল। কিন্তু ইত্যবসরে বামন ফিরে এলে তাঁরা দু'জন পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গভীর বনে বামন গিয়ে তাঁদের পলায়নে বাধা দিলে লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীও সাপের কামড়ে মারা গেল। কিন্তু এক ঋষি এসে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন গোহারি রাজও লোরের সঙ্গে শত্রুতা না রেখে সাদরে গ্রহণ করলেন।

এদিকে স্বামীবিরহিনী সতী ময়নামতীকে ছাতনকুমার নামক এক রাজপুত্র কামনা করল। দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করল রতনা মালিনীকে। ময়নামতীর বিরহবেদনার মুহূর্তে ইমালিনী তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চাইল, কিন্তু সতীত্ব ও দৃঢ় মনোবলে ময়নামতী তা উপেক্ষা করলেন। অবশেষে বারোমাসের শেষে সতী ময়না তাঁকে বিদায় করেন শান্তি দিয়ে। কিন্তু ময়নামতীর এই 'বারমাস্যা' দৌলত কাজী শেষ করে যেতে পারেননি। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বর্ণনার আরম্ভেভই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর কাব্য শেষ করেছেন পরবর্তী কবি আলাওল। আলাওলের কাব্যে দেখা যায় ময়নামতী রাজা লোরের কাছে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠালেন। ইতিমধ্যে লোর চন্দ্রানীর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। লোর গোহারি রাজ্যের ভার চন্দ্রানীকে দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই রানীই সহমৃতা হল।

দৌলৎ কাজীর রচনাংশের তুলনায় আলাওলের কবি ধর্ম,—অন্তত সতী ময়নামতী কাব্যে অনেক নিষ্প্রভ। আলাওলের সব রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য। দৌলৎ কাজিও পণ্ডিত ছিলেন। এদিকে মুসলিম ও সুফী ধর্মশাস্ত্রে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান ও ভক্তি আর অন্যদিকে বেদ-পুরাণ-জয়দেব-বিদ্যাপতি, এমনকি কালিদাসের কাব্যকেও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। কিন্তু দৌলৎ কাজির পাণ্ডিত্য কোথাও ভার হয়ে যায়নি। বরং তাঁর রচনা সরল, প্রাঞ্জল ও সরস।

তাঁর কাব্যে চরিত্রগুলিও প্রায় স্বাভাবিকরূপেই চিত্রিত হয়েছে। ময়নামতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারীস্বরূপের দুটি দিককে প্রকাশ করেছে। একদিকে আদর্শবাদ আর অন্যদিকে জীবনবাদ। ময়নামতী আদর্শবাদের কাছে—শাস্ত্রনীতির ও সমাজরীতির কাছে জীবনকে বলি দেয়। আর একজন জীবন ভোগের নামে আদর্শকে পদদলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব নারীত্ব, মর্যাদা ও লালসা, ত্যাগ ও ভোগ, লোভ ও ক্ষান্ত প্রভৃতির দ্বন্দ্বই কবি এই চরিত্র দুটিতে সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

এছাড়াও উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের ও সুভাষিত বুলির প্রয়োগে ও বহুলতায় মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের বিরল ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। রোসঙ্গরাজের প্রশস্তি উপলক্ষ্যে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি হিন্দুপুরাণ থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন—

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতল না যায় তারে ঠেলি॥
* * * *
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥

আবার মহম্মদ প্রশস্তিতে তাঁর অপার শক্তিদ্যোতকে উপমাপ্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে কিছুটা অভিনব—

অঙ্গুল-ইঙ্গিত শরে শশী দুই খণ্ড বারে
প্রলয়-সমান তান দাষা॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু-বৃষ্টি-জলে॥

দৌলত কাজির সুভাষিতাবলীর প্রাচুর্য তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ আর অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।

● **আলাওল**

দৌলৎ কাজির পরেই রোসাঙ রাজসভার দ্বিতীয় কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল। আলাওল প্রতিভা বিচিত্র কাব্যরচনায় সব সময়েই ব্যাপৃত। কিন্তু কবির নিজের জীবনও কম চিত্তাকর্ষক নয়। 'মুল্লুক ফতেহাবাদের জামালপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস ছিল। কারও কারও মতে এই ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ফতেহাবাদ অর্থে প্রাচীন ফরিদপুরকেই বোঝায়। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মান ও ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আলাওলের পিতা নবাব কুতবের সভাসদ ছিলেন। একবার নৌকাযাত্রার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগীত জলদস্যুদের হাতে পড়েন। আলাওলের পিতা জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। আলাওল বহু দুঃখ ভোগ করে রোসাঙে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কাজগ্রহণ করেন। রোসাঙ্গের প্রধান অমাত্য মগন ঠাকুর কবির প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কবির বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' রচিত হয়। এরপর কিছুকাল তাঁকে আরাকানের কারাগৃহে বিনা দোষে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। তবে অল্পদিনের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আনুকূল্যে তিনি তাঁর পূর্বগৌরব ফিরে পান। মগন ঠাকুর ছাড়াও অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সৈয়দ মুসা ও আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুবর্মার নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন।

মুসলমান সমাজে আলাওলের জনপ্রিয়তার কারণ হল তিনি ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থ মূল আরবী ও ফারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—(১) সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল (১৬৫৮-৭০), (২) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৩) তোহফা (১৬৬৩-৬৯), (৪) সেকান্দার নামা (১৬৭২) এগুলি সমস্তই ইসলামী বিষয় অবলম্বনে মুসলিম সমাজের জন্য লেখা—তাই এই কাব্যগুলি হিন্দুসমাজে আদৌ প্রচার করায়নি।

কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অনুবাদকাব্য 'পদ্মাবতী' হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এটি মালিক মুহম্মদ জায়গীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। এই পদুমাবত কাব্যটি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি রচনা করতে আরম্ভভ করেন। এটি সূফী সাধনতত্ত্বের রূপক। রূপককাব্যের কাহিনী হল রাজপুতানায় বহুল প্রচলিত। একটি লোকগাথা, রত্নসেন-পদ্মিনী দেওপাল ও পদ্মিনী সংক্রান্ত কাহিনী এতে বর্ণিত। জায়গীর কাব্যে উত্তর-ভারতীয় উপভাষার একটা সহজ লালিত্য ও মাধুর্য আছে। এছাড়াও ভাবুকের কাছে এটি জীবাত্মা-পরমাত্মাবিষয়ক তত্ত্বের আকর।

এই কাব্যে চিতোর অর্থে মানবদেহকে বোঝায়, রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা, আবার পদ্মিনী হচ্ছেন বিবেক, শুকপাখি ধর্মগুরুর প্রতীক।

আলাওল এই অধ্যাত্মরূপকটিকে তাঁর কাব্যে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। কবি প্রেম ও বিরহের যে বর্ণনা দিয়েছেন,তা দৃশ্যত লৌকিক হলেও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্ম রসব্যঞ্জক। পদ্মিনীর রূপ বর্ণনাতে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণ করেছেন। এছাড়াও কবি তাঁর এই কাব্যে হিন্দু অলঙ্কার, পিঙ্গলাচার্যের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার রাজসভার ঐশ্বর্য। ঘোড়া ও হাতীর নানা ধরনের খেলা ও কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে। এসমস্ত কিছুই কবির কাব্যে এক উদার

ধর্মনিরপেক্ষতার সৃষ্টি করেছে। কবির সুভাষিতবলী ও প্রবাদবাক্য রচনা ও তার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে—

(১) পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই।
(২) তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়
ছেদিলে শতেক বার দুইখণ্ড নয়॥

পদ্মিনী রূপ বর্ণনায় কবি রোমান্টিক আবেগও সৃষ্টি করতে পেরেছেন—

সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন হেতু করায় লহরী।

পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের অন্যান্য কাব্য দুর্বলতার মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি সৈফুল মুলুক বদি উজ্জমান রচনা করেন ১৬৫৮-৬০ খ্রিষ্টাব্দ। এটি ইসলামী রোমান্টিক প্রেম শহিল অবলম্বনে লেখা।

'হপ্ত পয়কর' ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। এঁতে আরবের রাজকুমার বাহরামেক যুদ্ধ জয় ও সপ্ত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। এর কাহিনীও কবির নিজস্ব নয়। ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দের ফারসী ভাষায় লেখা আখ্যানই কবির মূল অবলম্বন। তোহফা ইসলামী শাত্রসংহিতার উপদেশে পূর্ণ নীতি গ্রন্থ। এটি ১৬৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। আলাওলের সর্বশেষ কাব্যের নাম সেকান্দার নামা। এটি নেজামি সমরকন্দীর ফারসী কাব্য 'ইসকান্দারনামার' সরল অনুবাদ। এর উপজীব্য আলোকজাণ্ডারের বিজয়কাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন অল্পখ্যাত কবি হলেন 'চন্দ্রাবতী' রচয়িতা মাগন ঠাকুর, ইউসুফ জুলেখা রচয়িতা আবদুল হাকিম গুলের কাওলী রচয়িতা নওয়া জিস খান, মুক্তালহোসেন রচয়িতা মোহাম্মদ খান প্রভৃতি।

এছাড়াও সৈয়দ সুলতান রচনা করেছিলেন নবিবংশ, মুহম্মদ খান রচনা করেছিলেন 'সত্যকলিবিবাদ সংবাদ'।

পদুমাবৎ এর কাহিনী—কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম। চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন তাঁরপত্নীর নাম নাগমতী। সিংহল রাজ-দুহিতা পদ্মাবতীর রূপ গুণের খ্যাতি শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং সুশিক্ষিত শুক পাখি নিয়ে। সিংহল যাত্রা করেন। শুকের সাহায্যে রত্নসেন পদ্মিনীকে লাভ করেন। দুই পত্নী নিয়ে তাঁর সুখে দিন কাটতে থাকে। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনে তাঁকে পাওয়ার জন্য চিতোর আক্রমণ করে ও রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যায়। রত্নসেন সুকৌশলে পালিয়ে আসেন। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মিনীকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রত্নসেন ফিরে এসে তাকে মেরে ফেলেন এবং নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী ও নাগবতী অশুমৃতা হন। আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রমাণ করে ফিরে যান।

৮.১৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে?

২। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট ধর্মমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে, আলোচনা করুন।

৩। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে উঠে এসেছে?

৪। চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের বিবরণ দিন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়কার পদাবলির গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৫। মধ্যযুগ রচিত যে কোনো চারটি চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের বিশেষত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৬। আরাকান রাজসভার সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট কবির পরিচয় দিন।

৭। চৈতন্য পরবর্তী অনুবাদ সাহিত্যের বিশিষ্টতা আলোচনা করুন। যে কোনো দুটি ধারার দু'জন কবির রচনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৮। কালিকামঙ্গালের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন। মঙ্গালকাব্যের বিশষত্ব এই কাব্যগুলির মধ্যে কতটা আছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গাল

২। যে কোনো দুটি বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন সম্পর্কে আলোচনা—গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু।

৩। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বিশেষত্ব কী?

৪। শঙ্কর কবিচন্দ্র কোন্ সময়ের কবি? তাঁর ভাগবত অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)/সুকুমার সেন, ১৪০১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৬

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/প্রথম পর্যায়/ভূদেব চৌধুরী, ১৯৯৫

৪. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা/প্রথম খণ্ড/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা/প্রথম খণ্ড/গোপাল হালদার, ১৯৫৭

৬. বাংলা মঙ্গাল কাব্যের ইতিহাস/আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৩৬

৭. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্য/বিমানবিহারী মজুমদার

৮. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস/ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯২

৯. সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য/জনার্দন চক্রবর্তী

১০. বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য/আহমদ শরীফ/বাংলা একাডেমী ঢাকা/১৯৮৩

১২. বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ/সত্যবতী গিরি, ১৯৮৬

১৩. মৈমনসিংহ-গীতিকা : পুনর্বিচার/মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩

১৪. বাংলা নাথ সাহিত্য/সুখময় মুখোপাধ্যায়

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। "পদামৃতসমুদ্র" তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিনী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

"মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।"

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

"তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।" এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্ভেবাধন করে বলেন—

"ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।"

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। "চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।" বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—"একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।" শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। "নূপূর কলরব

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্বন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসুষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও 'মানসিংহ-কাব' কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গলে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের (দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

পর্যায়-৩

একক ১ □ রবীন্দ্রসাহিত্য

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ প্রস্তাবনা ঃ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা
১.৩ পাঠ ও আলোচনা
১.৩.১ প্রথম পর্ব
১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব
১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব
১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব
১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব
১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব
১.৩.৭ সপ্তম পর্ব
১.৩.৮ অষ্টম পর্ব
১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

বাংলাসাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে আধুনিক যুগলক্ষণের সূত্রপাত ১৯ শতক। মধুসূধনের মধ্য দিয়ে নবজাগ্রত বাঙালিসমাজের সাহিত্যবোধ আধুনিকতার আলোকে উদ্দীপ্ত হল। সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ক্ল্যাসিক রীতির পরিবর্তে রোম্যান্টিক গীতিময়তার যে সূচনা বিহারীলালে, তার পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। প্রথমত ও প্রধানত কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভার সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রেখে গেছেন স্বর্ণালী স্বাক্ষর। কবিতা, গান, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি চিঠিপত্রেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যসভায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকে যে সাহিত্যযুগ শুরু তাকে বলতে পারি রবীন্দ্র-রেনেসাঁস সমৃদ্ধ রবীন্দ্রযুগ।

১.২ প্রস্তাবনা : রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।"

এই উক্তির প্রেক্ষিতেই আমাদের মনে পড়তে পারে রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তি—"কাব্য সাধনাই রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সাধনা এবং কাব্য সাধনাই তাঁহার জীবন সাধনাও বটে।" একারণেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বীকারোক্তি আবারও মনে পড়ে যায়—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী"

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কালপর্বে এই 'বহুকালের প্রেয়সী' কবিতা বারবার নানা রূপে-রূপান্তরে ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক গীতিকবি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, মর্ত্য ধূলির প্রতি মমতাময় আসক্তি ও মানবজীবনের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশিত, সেইসঙ্গে রোম্যান্টিক বিষাদ ও বেদনার অনুভব যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যের। কল্পনা ও অনুভূতির রসসঞ্চারে তাঁর কাব্য যথার্থই রসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে মধুসূদনের মধ্য দিয়ে যে ক্ল্যাসিক রীতির মহাকাব্য রচনার ধারা শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে এসে তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হল। প্রাথমিকভাবে বিহারীলালের কাব্যেই সেই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম দেখা মেলে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের মিষ্টিক কবি বিহারীলালের কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেছিলেন কাব্যের অন্তর্লীন সুর ও আবেগ। তাঁর কাব্যেও আমরা উপলব্ধির ক্রমপর্যায়ে দেখি রোম্যান্টিক চেতনা তেকে প্লেটোনিক ভাবনা ছুঁয়ে গিয়ে মিষ্টিক ভাবকল্পনায় কবিতা মুক্তি পেয়েছে এবং এভাবেই তা সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে ভাবে বিকশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম কৈশোর থেকে পরিণত বয়স অতিক্রম করেও তিনি নিত্য নবভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—তাঁর কবিতার মধ্যে রয়ে গেছে নবনব সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। তাঁর তেরো বছর বয়স থেকে মৃত্যুকালীন আশি বছরের প্রাপ্ত সীমায় পৌঁছেও তিনি কাব্য রচনার অক্লান্ত পথিক।

১.৩ পাঠ ও আলোচনা

১.৩.১ প্রথম পর্ব

তাঁর কাব্যের আদিপর্বে আছে কবিকাহিনী, বনফুল, শৈশবসঙ্গীত।

কবিকাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এ কাব্য সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"

এটিকে ট্র্যাজিক রোম্যান্স আখ্যা দিয়েছেন সমালোচকবৃন্দ। কবির মতে "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে।"

'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা, তাঁর তেরো বছর বয়সে রচিত এ কাব্য অবশ্য গ্রন্থাকারে 'কবিকাহিনী'র পরে প্রকাশিত হয় (১৮৮০ খ্রিঃ)। এরও আগে কিশোর কবি রচনা করেছিলেন "পৃথ্বীরাজ পরাজয়"—যদিও নিজেই সেই রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করতে পরে অস্বীকার করেন। 'বনফুল' কাব্যে রচিত একটি গল্প, বিশ্বজীবন ও মানবজীবনের সুগভীর বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য কোরকেই সেইভাবে প্রকাশিত। প্রাথমিক পর্যায়ের এই রচনার মধ্যেই ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ লীরিক কবির রোমান্টিক মন্ময়তা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই আবেগধর্মী, গীতিময় ভাবনারই প্রকাশ পরবর্তী 'শৈশবসঙ্গীত'। হৃদয়-উচ্ছ্বাসের তীব্র মধুর রোম্যান্টিক বেদনাভরা এ গ্রন্থের গাথাগুলি

প্রায় সবই ট্র্যাজেডি। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের লীরিক রচনার প্রয়াস বলা যায়। বনফুল থেকেই শুরু করে এ পর্যায়ের সব রচনাতেই এই সুরের আভাস।

'বনফুল' কাব্যে দেখেছি বনপ্রকৃতিতে পালিতা কমলার প্রেমের বেদনাঘন পরিণতি। বনাঞ্চলের বালিকা লোকালয়ে নিজেকে মেলাতে না পেরে ব্যর্থ প্রণয় বেদনা বুকে নিয়ে বনপ্রকৃতিতে ফিরে এসেও জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল না। মৃত্যুতেই তার প্রেমের সমাপ্তি। কমলা, বিজয়, নীরদ, নীরজা ভালোবাসার আলো আঁধারিতে চারটি বেদনাম্লান চরিত্র। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের এই সংঘাত, যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনায় বহুবিচিত্ররূপে প্রকাশিত তার সূচনা 'বনফুল' কাব্যের কমলা চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন ও প্রকৃতি—সীমা ও অসীনের মিলন সাধনের এই পালাই রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের মূলসুর। এই সংযোগ সার্থকতা হওয়ার বিষাদমগ্ন এক তত্ত্বময়তা এ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে প্রকাশিত।

"নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই
কোলাহল নাইক দিবায়
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত
তৃপ্তি নাই মাধুর্য শোভায়"

বনফুলের মত 'কবিকাহিনী'র মধ্যেও রোম্যান্টিক বেদনার তীব্রতা অকারণ বিষাদ ও শূন্যতাবোধ, অতৃপ্তির যন্ত্রণাবোধ লক্ষ্য করি।

"এখনো কহিছে কবি 'আরো দাও ভালোবাসা
আরো ঢালো ভালোবাসা হৃদয়ে আমার'
প্রেমের অমৃত ধারা এত যে করেছ পান
তবু মিটিল না কেন প্রণয় পিপাসা?"

'কবিকাহিনী'র কবি যেন রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ পরিবর্তিত ছায়াভাস। একাব্যের নায়িকা নলিনীর মৃত্যুতে কবির মনে এসেছে সংশয়। এই সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে রবীন্দ্রমানসে, জীবনের ট্র্যাজেডি ও দুঃখবোধের জিজ্ঞাসা জেগেছে মৃত্যুতেই কি শেষ না দুঃখ উত্তীর্ণ এক অতীন্দ্রিয় চেতনার বিকাশ সম্ভব—এই দোলাচল প্রশ্ন প্রেমিকার মৃত্যুতে কবি উচ্চারণ করেছেন—

"গিয়াছে কি আছে বসে
জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর?"

'শৈশবসঙ্গীতের কবিতাগুলিতেও এই অকারণ বিষাদ অনুত্তর প্রশ্ন Ramantic Agony-র সুর ধ্বনিত,

"ওগো দেবী, ওগো বনদেবী
বল মোরে কি হয়েছে মোর
কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুম ঘোর"

শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের অনুজ হলেও রচনাকালের দিক দিয়ে অগ্রজ। এর অধিকাংশ কবিতাই ১২৮৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭৮-৮৯) ভারতীতে মুদ্রিত হয়েছিল।

১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসংগীত'। এই কাব্যটিকে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা বলা যেতে পারে। 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> "আমার কাব্য রচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব, সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।"

এ কাব্যের কবিতাতেও বিষাদের সুর ধ্বনিত। কবিতাগুলির নামকরণেই বেদনা ও দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে—সন্ধ্যা, আত্মহারা, আশার নৈরাশ্য, পরিত্যক্ত দুঃখ আবাহন, তারকার আত্মহত্যা ইত্যাদি। এই সময়কার অস্থির বেদনাই কবিতাতে ধ্বনিত। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে রোম্যান্টিক বিষাদের ভাবোচ্ছ্বাস ও বেদনাব্যাকুল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পথহারা পথিকের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন হৃদয় অরণ্যে।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রভাতসংগীত' যেন সন্ধ্যাসংগীতের পরিপূরক। এক দুর্লভ প্রভাতীক্ষণে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো—সন্ধ্যার ছায়াম্লান হৃদয়ের বেদনার আঁধার থেকে আনন্দের দিব্যবিভায় কবির মুক্তি ঘটলো। প্রভাতসংগীতের জ্যোতির্ময় প্রভাতে সন্ধ্যায় ম্লানিমা দূর হলো। বাহির ও অন্তর যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে কবির অন্তরে ছিল, ততদিন তাঁর উপলব্ধি পূর্ণ ও সার্থক হয়নি। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই কবিচিত্তে বিষাদ ও বেদনা ঘনীভূত হয়েছিল। যতদিন না নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো, ততদিন এই বেদনার আঁধার তাঁর চিত্তের সংশয় মোচন করতে দেয়নি। যে আঁধার আলোর অধিক,সেই বেদনার অন্ধকারে সন্ধ্যাসংগীতের সৃষ্টি আর সেই বেদনার আঁধার থেকে যে আলোর জন্ম সেই দিব্য প্রভাতের পরম প্রজ্ঞায় প্রত্যয়দৃঢ় 'প্রভাতসংগীতে'র প্রকাশ। সন্ধ্যাসংগীতের হৃদয়-অরণ্য থেকে প্রভাতসংগীতে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আপনসত্তার অনুভব উচ্চারিত হল।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও এটি কবির ষোলো বছর বয়সের রচনা। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের রোম্যান্টিক মন্ময়তা অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন। তাঁর কথায় বিহারীলালের আত্মগত লীরিক ধর্মিতা প্রকাশিত—

> "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ
> সহচস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই।"

এই রোম্যান্টিক ভাবগত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণবপদাবলীর-ও সুগভীর প্রভাব ছিল। তারই প্রকাশ—ভানুসিংহের পদাবলী। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে ব্রজবুলির অনুসারী এক কবিভাষায় এই কাব্যের পদগুলি রচিত। এর কয়েকটি পদ কিশোর কবির অনুপম সৃষ্টি, যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে উত্তরকালে এর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

> "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'ছবি ও গান'। শৈশব ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে রচিত এই কবিতাবলীতে কবির নিজের কথায়—"ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে দিন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না,রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে।" তাই 'ছবি ও গান'-এ আছে চিত্রধর্মিতা ও গীতিধর্মিতা। এতে আছে যৌবনচাঞ্চল্যের ছবি, আছে যৌবনবেদনার গান, রূপ নিয়ে ছবির সৃষ্টি আর ভাব নিয়ে সৃষ্টি হয় গান। যৌবনের রক্মি কামনার সঙ্গে মিশে যায় সুরের মুর্ছনা। তাই 'ছবি ও গানে'র কয়েকটি কবিতা যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত ছবি—

'সুখস্বপ্ন', 'পূর্ণিমায়', 'সুখের স্মৃতি' তার বিশিষ্ট নিদর্শন। আবার 'জাগ্রতস্বপ্ন', 'স্মৃতিপ্রতিমা' কবিতায় অস্ফুট গীতিমূর্ছনার বেদনা আভাসিত। দূর থেকে দেখা ছবি আর দূর থেকে শোনা গানকে তিনি ব্যাকুল ভাষায় বাঁধার প্রয়াসী হয়েছেন—

"কেহ কি আমারে চাহিবে না
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?"

স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে এ কাব্যের কবিতাগুলি ললিত মধুর। এরগ মধ্যে নবযৌবনের উল্লাস যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম—আমি তখন দিনরাত পাগল হয়েছিলুম। সত্য কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"

'বনফুল', 'কবিকাহিনী' থেকে ছবি ও গান পর্যন্ত কাব্যরচনার ইতিহসকে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্য। প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা তখন এক আত্মগতভাবে লীন হয়েছিল। প্রেম কেবল যেন এক আত্মিক অনুভূতি। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা তাত্ত্বিক আবরণ দেবার প্রয়াস এই প্রথম পর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্বময়তা অবশ্যই বিহারীলালের প্রভাবসঞ্জাত। প্রথম পর্বের এই একান্ত আত্মগত ভাবের শেষে 'কড়ি ও কোমলে' কবি যেন আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ উপলব্ধি করলেন।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হজ্ময়। এর একদিকে আছে সন্ধ্যাসংগীত পর্বের আধো আলোছায়া, অন্যদিকে আছে 'মানসী'র স্বচ্ছ অরুণাভা। একদিকে নবযৌবনের উন্মেষ অন্যদিকে প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ—তাই প্রথম পর্যায়ের শেষ অথবা নবপর্যায়ের সূচনা হিসেবে 'কড়ি ও কোমল' বিশিষ্ট এক মিশ্ররসের কাব্য। কবির নিজের ভাষায় 'আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেগ' আর 'বহির্দৃষ্টিপ্রবমতা' এই প্রথম তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। এই প্রবল আবেগ থেকেই তীব্র বাসনা রঙীন সনেটগুচ্ছ লেখা হয়েছে। নারীদেহ-সৌন্দর্যকেন্দ্রিক কবিতাগুলি রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্ভভারে এক নতুন সংযোজন। অনুভূতির তীব্রতার উষ্ম আবেগচঞ্চল এই দেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও কিন্তু দেহাতীত গভীরতরে স্পর্শ অনুভব করা যায়। প্রকৃতির বিশালতায় ব্যক্তিমানসের মুক্তি আভাসিত 'যৌবনস্বপ্ন' কবিতায়—

"আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ" সৌন্দর্যকে এভাবেই কবি বিশ্বলীলার ছন্দে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নবযৌবনের স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছলতায় নারীদেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও এই মুক্তির কথা প্রচ্ছন্ন। প্রেমের তীব্রতাকে তিনি 'পূর্ণিমা রাত্রি' বলে তারগ থেকে মুক্তি চাইছেন ঊষার আলোকে মুক্তির আকাশে—

"কোথায় ঊষার আলো, কোথায় আকাশ
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক অবসান"

'কড়ি ও কোমলে' এই যৌবন চাঞ্চল্যের সঙ্গে আর একটি বিষয় ধরা পড়েছে—সেটি জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। কবি বলেছেন—"যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

মৃত্যুর আঘাতে কবিচিত্তের বেদনা উৎসারিত, কিন্তু তাঁর ভাবনার বৈশিষ্ট্যই জীবনের সচলছন্দে তাল মেলানো। তাই দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি অন্তত প্রাণপ্রবাহে জীবনের স্পন্দন উপলব্ধি করতে চান। 'কড়ি ও কোমলে' মর্ত্যপ্রীতি, জীবনবোধ ও যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।

এতদিনকার কাব্যে যে অকারণ বেদনার আভাস ছিল—এবার তাই খুঁজে পেয়েছে উৎসমুখ। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি যেন জীবনের পাত্রকে পূর্ণ উপলব্ধি করলেন। তাই মৃত্যুর তরঙ্গাঘাতে যে কবিতার জন্ম, তার নাম দেন 'প্রাণ'।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার"

১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম সার্থক সৃষ্টি' বলে সমালোচকবৃন্দ বন্দিত করেছেন 'মানসী'-কে ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এর কবিতাগুছ গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। গাজিপুরের নির্জনবাসে এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচিত। এছাড়া কলকাতা, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর ও লণ্ডনে রচিত একটি কবিতাও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'মানসী' বাংলাকাব্যের আনন্দ বিস্ময়। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ এ কাব্যেই স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। 'মানসী'-কে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিণতির প্রথম সার্থক প্রকাশ বলা যায়। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলভাব মানসীতেই প্রথম প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

'মানসী' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবি মানসের প্রেমকল্পনাই মানসপ্রতিমা। তার অধিষ্ঠান কবির মনোলোকে। ভাবকল্পনায় গড়া সেই মানসী সীমার বন্ধন-উত্তীর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুরী। সীমার মধ্যে অসীমের প্রতিভাস 'মানসী' কাব্যের মর্মবাণী। কবি বলেছেন—

"আমি ভালোবাসি অনেককে, কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে,
সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কী?"

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের"—এই পরম উপলব্ধি 'মানসী' কাব্যের প্রেমকবিতাকে ঘিরে আছে প্রেমের রূপ নয়, তার আত্মার অনুসন্ধান মানসী মূল কথা। তাই বাস্তবের সঙ্গে আদর্শায়িত প্রেমকল্পনার বিরোধাভাসের চকিত চমক—

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস
একী দুঃসাহস
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে
আছে কি অনন্ত প্রেম?"

'মানসী'র 'নিষ্ফলকামনা' কবিতাটিতে সমগ্র কাব্যের ভাব বিধৃত বলে মনে হয়। আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর বাণীরূপ 'নিষ্ফলকামনা'। দেহাতীত প্রেমভাবার মুক্ত মাধুরী এ সময়কার বিভিন্ন রচনায় ধরা পড়েছে।

প্রেমের এই কামনাহীন অনুভবের গান— 'সুরদাসের প্রার্থনা'। এ কবিতার পূর্ব নাম ছিল 'আঁখির অপরাধ'। মোহময় দৃষ্টি দিয়ে প্রেমের রূপারতি যথার্থ প্রেম নয়, তাতে আছে ভোগের স্থূলতা। সেই অপরাধ থেকে মোহমুক্ত উদার দৃষ্টিতে প্রেমের প্রকাশ ঘটুক এই প্রার্থনাই কবিতাটিতে ধ্বনিত।

"আঁখির সহিত আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে"

—স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি ও ভাবনা সঞ্জাত কিছু কবিতাও 'মানসী'তে আছে। 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'গুরু গোবিন্দ, 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমলাপ' ইত্যাদি কবিতাগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

'মানসী'র নিসর্গ কবিতাগুলিতে কবিমানসের সার্থক সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় পুরাণ প্রতিমা থেকে কালিদাসের কাল ফিরে এসেছে পাঠকের মনোলোকে।

অন্তরঙ্গ কাব্যভাবনার সঙ্গে 'মানসী'তে বহিরঙ্গ প্রসাধনাও নবরূপে প্রকাশিত। কবির নিজের কথায়—"মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল"।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে "সোনারতরী" কাব্যের স্মরণীয় প্রকাশ। এই কাব্য থেকেই শুরু হলো তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য সোনারতরী। এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।.....আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

জমিদারির কাজে পদ্মাবিধৌত বঙ্গে শিলাইদহ-পতিসর-পাবনা অঞ্চলে কবি এসময় বোটে করে ভ্রাম্যমান।

বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, অসীম অম্বর, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বরণচাতুরী—তাঁর এসময়ের লেখায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে যে নিসর্গ মাধুরী মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ, সমকালীন গল্পগুচ্ছে মানুষের নিবিড় পরিচয়ের আভাস—তারই ছায়াপাত 'সোনারতরী' কাব্যের কবিতাবলীতে।

প্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধনের কথা, আত্মিক যোগের কথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধ্বনিত। এছাড়া একাব্যেই একাধারে রয়েছে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব', সীমা-অসীমের তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখী', চিরঅন্বেষাময় জীবনসাধনা 'পরশপাথর' অসামান্য মৃত্যুচেতনা ঋদ্ধ 'প্রতীক্ষা' ও 'ঝুলন' এবং কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় 'সোনারতরী' ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা'। এই সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা 'দুর্বোধ', 'লজ্জা', 'হৃদয়যমুনা' এবং কবির আজন্মসাধনার ধন—'মানসসুন্দরী'। সমালোচকের ভাষায়—"মানসীতে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী, মানসসুন্দরীতে তারই প্রতিমা রচিত হল।" বিশ্বপ্রকৃতির অন্তত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির মানসসুন্দরী। এই মানস প্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষী। তাঁর আজন্মসাধনার ধন। একে কেউ বলেছেন সৌন্দর্য দেবতা, কেউ বা কাব্য দেবী, কেউ বা মানস প্রতিমা। এ কবিতা কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী। কবিতাকে উদ্দেশ করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। শেলীর 'হিম টু ইনটেলেকেচুয়াল বিউটি'-র কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসবে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' এ-ও এই অন্তরতমা আপন মানসলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কথোপকথন।

'সোনারতরী' কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম-কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় 'তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় বলেছেন—

> "সোনারতরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করে চলেছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত। ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফসল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু মানুষ যখন বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো—তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা

কোথায়? প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চাইছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।"

এর প্রথম কবিতা 'সোনারতরী' রচিত হয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশযাত্রা' রচিত হয় ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দুটিতেই তরণীর নেয়ে আছে, তবে 'সোনারতরী'-তে সে আড়ালে আর 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় সে কবির পথ নির্দেশিকা—অজানা সুন্দরী। রোম্যান্টিক কবিমানসের অকুলযাত্রাই এখানে সূচিত।

'সোনারতরী' লৌকিক প্রেমের কাব্য বলে পরিচিত। কবি সুগভীর প্রীতির বন্ধনে ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করছেন। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'আকাশের চাঁদ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দরিদ্রা' প্রভৃতি কবিতায় নানাভাবে এই মর্ত্যপ্রীতি সঞ্চারিত, 'বসুন্ধরা' কবিতায় একদিকে বসুন্ধরা, অন্যদিকে মানুষের মুখপাত্র কবি। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার একদিকে বিদায়কামী পিতা, অন্যদিকে তাঁর শিশুকন্যা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও এদের অন্তর্লীন সুর একই। দুটিতেই লৌকিক প্রেম, মর্ত্যপ্রেমের অমলিন মাধুরী প্রকাশিত। লৌলিক জীবনের চরমতম সত্য—বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীরকথা 'যেতে নাহি দিব'। এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে করুণ লাবণ্যের মত ছড়িয়ে আছে।

মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে 'আকাশের চাঁদ' কবিতায়। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা, ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথরের সন্ধানে ঘুরে মরে—জীবনের মধ্যে লুকোনো অমৃতপরশের সন্ধান পায়না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্ত্যমাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিক্রমায় শেষ হয়ে যায়।

'সোনারতরী' পর 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে প্রেমের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশিত। 'সবুজপাত্র' রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনা আমার মনে সুখদুঃখ বিরহ-মিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী"

—এই নিরাকার সৌন্দর্যতত্ত্বই রূপ পেয়েছে 'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতায়। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব সৌন্দর্যের অখণ্ড অনন্ত সতার প্রতীকিত বাণীমূর্তি উর্বশী।

চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের স্মরণীয় প্রকাশ। কবি সমগ্র কাব্যযুগ ধরে যে অন্তরতমের সন্ধান করেছেন, কবির সেই অন্তরতম সত্তাই তাঁর জীবনদেবতা। 'সোনারতরী' থেকে যে নিগর্স অনুভূতি তাঁর চৈতন্যলোকে প্রবাহিত ছিল, তাকেই চিত্রায় এনে পরিপূর্ণরূপে কবি অনুভব করলেন। সেই প্রত্যয় তাঁর অন্তরকে ঐশ্বর্যদান করলো, সেই সত্যই তাঁর অন্তরতম জীবনদেবতা অন্তর্যামীর সন্ধানে তাঁর যে মানসযাত্রা তা-ই পরিণতিতে এসে পৌঁছলো জীবনদেবতা তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে কবি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"

নিজের জীবনের মধ্যে যে আবির্ভাবকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন, তিনিই তাঁর জীবনদেবতা। চিত্রাকাব্যের অন্তর্যামী, কৌতুকময়ী, অন্তরতম—সবই সেই জীবনদেবতার বিভিন্ন ও বিচিত্র লীলা। এই জীবনদেবতা ভাবনার সঙ্গে মিশে রয়েছে নিসর্গ প্রকৃতি। নিসর্গের অপার রহস্যময়তা জীবনদেবতা তত্ত্বে মিশে গেছে—তারই

প্রকাশ 'সিন্ধুপারে' কবিতা। 'সিন্ধু'—জীবনসমুদ্র, তারই পারে—অর্থাৎ জীবন উত্তীর্ণ মৃত্যুলোকে জীবনদেবতার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

চিত্রার সৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির অনুভবে বিচ্ছেদের বেদনাতেই প্রেমের মধুরিমা, প্রেমের পূর্ণতা। তাই স্বর্গীয় প্রেমে নয়, অলৌকিক সৌন্দর্যে নয়, দুঃখময় পার্থিব প্রেমে ও লৌকিক সৌন্দর্যে কবির অনুরক্তি। চিত্রা সেই লৌকিক সৌন্দর্যের কাব্য। এই সৌন্দর্যমূর্তি একাধারে বিচিত্ররূপিনী অথচ অন্তরব্যপিনী রূপে কবিমানসে লীন হয়ে আছে সৌন্দর্যকে কবি সকল মানব সম্বন্ধের বিকার থেকে সংকীর্ণ সীমার প্রয়োজন থেকে বিশুদ্ধ অখণ্ড মূর্তিতে দেখতে চান। উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতায় তার চরম প্রকাশ, ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য মুগ্ধতা ও ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যধ্যান একে দেহে মিলে গিয়ে পূর্ণ সৌন্দর্যের অখণ্ড মঙ্গলমূর্তি সৃষ্টি করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যেন Beauty mystic কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

'জ্যোৎস্নারাতে' ও পূর্ণিমা কবিতা দুটিও কবিচিত্তের সৌন্দর্য লীলাকেই বাঙ্ময় করেছে। অন্তর্জগতে অনুভূত সৌন্দর্যসত্তাকে জ্যোৎস্নারাতে কবিতায় করি আহ্বান করেছেন।

'বিজয়িনী' কবিতায় সৌন্দর্যানুভূতি রমণীমূর্তিতে আভাসিতা। এই মূর্তি যেন সৌন্দর্যের আদিসত্তা—Eternal Beauty। এই সৌন্দর্যসত্তা চিরদিনই অপ্রাপনীয়া, তাই সৌন্দর্যভাবনায় বেদনার ভাব মিশে আছে। আর এই অপ্রাপনীয় বেদনার অনুভব থেকেই দুর হয় ভোগবিলাস, দূর হয় কামনাবাসনার সংরাগ। তাই সেই আদি সৌন্দর্যের নগ্নমূর্তির মহিমার কাছে মদনদেবেরও পরাজয় ঘটে। অখণ্ড সৌন্দর্যের এই বিজয়িনী সত্তাকেই কবি প্রকাশ করেছেন।

'এবার ফিরাও মোরে' চিত্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা—যেখানে কবি বাইরের কর্মচঞ্চল প্রবাহে নিজেকে মেলাতে চাইছেন। শুধু কাব্যময়, আত্মমগ্ন কল্পনা-লালিত রোম্যান্টিক মানসের অন্তরলোকেই নয়—তিনি ফিরতে চাইছেন বিচিত্র কর্মময় পৃথিবীতে, দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে। সংসারের ব্যথাবেদনা পীড়িত মানুষের মাঝে তিনি একাত্মতা অনুভব করতে চান।

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়"

এভাবেই চত্রিাকাব্যে কবির নিভৃত অন্তর্লোক ও কর্মময় বহির্লোক সমন্বিত হয়েছে। তাই এ কব্যের নাম কবিতা সার্থক তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী"

১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব

চিত্রার পরবর্তী কাব্য—চৈতালি। বঙ্গাব্দে ১৩০২ সনে প্রকাশিত এ কাব্যে মানুষের হৃদয়কে বড়ো কাছাকাছি দেখার কথা কবি লিখেছেন। আবেগ উচ্ছ্বলতার পরিবর্তে তাঁর দেখার মধ্যে এখন এসেছে প্রশান্তি। অন্তর ও বাইরের মধ্যে একটা সমন্বয় যেন এ কাব্যের সনেটগুলিতে ক্ল্যাসিক সংযমে স্থিতি লাভ করেছে। 'চৈতালি'র ব্যক্তিগত প্রেম কবিতার মধ্যেও এক সুগভীর প্রশান্তির আভাস। সেকারণেই রোম্যান্টিক কবিকল্পনা ক্ল্যাসিক রীতিতে সনেটে সংহত হয়ে দেখা দিয়েছে। একাব্যে মানবমহিমা, মর্ত্যধূলির প্রতি আকর্ষণ প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুরক্তি প্রকাশিত। সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তর সমাহিত লাবণ্যে চৈতালির কবিতাগুলি উচ্ছ্বল।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হল ক্ষুদ্রায়তন কবিতার সংকলন—'কণিকা'। এক ধরনের নীতিমূলক কাব্যকণা কণিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

'চৈতালি'র পর উল্লেখযোগ্য কাব্য ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ। অতীতচারণা ও সুদূরের আকঙ্ক্ষা জনিত বেদনার আভাস বিজড়িত এ কাব্য রবীন্দ্রনাথের অতীত ভারতে মানসভ্রমণের রূপচিত্র। রোম্যান্টিক স্বপ্নাচারণার মধ্য দিয়ে প্রেমভাবনার প্রকাশে এ কাব্যের রূপ নির্মিতিতে এসেছে অসামান্য সৌন্দর্য। অতীতচারণার সূত্রেই এ কাব্যে ফিরে এসেছে কালিদাসের কাল। স্বপ্ন কল্পনা আশা আর অনুভূতির সমন্বয়ে এ কাব্য সার্থক নামা। রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন—

"It is the rewakening of middle ages"—অর্থাৎ মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ। তাই একাব্যে মধ্যযুগমুগ্ধতা ও কালিদাস প্রিয়তার প্রতিভাস। কালিদাস-প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে স্বপ্ন মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে ও বর্ষামঙ্গল কবিতায়। কুমারসম্ভব কাব্যের পঞ্চমসর্গে ধূর্জটির পদতলে পার্বতীর আত্মনিবেদনের অংশে কালিদাসের অসামান্য সৌন্দর্যলোক থেকে সূত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মদনভস্মের পূর্বে ও পরে' কবিতাদুটির রূপ নির্মাণ করেছেন।

আবার 'স্বপ্ন' কবিতায় উজ্জয়িনীর প্রসঙ্গ মহাকালের মন্দির, শিপ্রা নদী যেন কালিদাসের কালের মিথকে প্রত্নপ্রতিমায় চিত্রিত করেছেন। অতীত স্মৃতিবাহিত ঐতিহ্যকে কাব্যের ঐশ্বর্যে কল্পনার সৌন্দর্যে কবি বেঁধেছেন ছন্দবন্ধনে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'ভ্রষ্টলগ্নে'র মত কবিতাতেও পুরাণ প্রতিমাকে নতুন কল্পনায় উজ্জীবতি করেছেন।

কল্পনার সমকালে (১৯০০) প্রকাশিত 'ক্ষণিকা' বিস্ময়কর কাব্য। কল্পনা কাব্য থেকে পরবর্তী 'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে আছে এক ক্রমাভিব্যক্ত স্তর। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে 'ক্ষণিকা' যেন ক্ষণকালের দ্যুতি। শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাইবার আনন্দ এই কবিতাগুচ্ছে ধ্বনিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে

"ছোটখাটো সুখদুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা"—

অতীত চারণার মুগ্ধতা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্ভভাবনা নয়—বর্তমানের ক্ষণমুহূর্তের আনন্দ বেদনার সত্যরূপকে কবি মূর্ত করেছেন এ কাব্যে। ক্ষণকালের ছন্দে বাঁধা এই সহজ ভাবই ক্ষণিকার প্রাণ। বাস্তবজীবনে প্রেমের একটা সীমা আছে, সব কিছুর মধ্যেই তার স্থান—এই মানস পরিণতির কথা 'ক্ষণিকা'র প্রেমকবিতায় আভাসিত।

ক্ষণিকায় যেন ক্ষণকালের জন্য কবি নেমেছেন সহজ সাধনার লঘু পথে। হালকা ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমন্বয় দেখা দিল ক্ষণিকাতে। এর চটুল ছন্দের বাঁধনে জীবনের সুগভীর প্রত্যয় কৌতুক রসাস্নিগ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্মিত-কৌতুকের আড়ালে কখন যেন গভীর গোপন হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে মধুর বেদনা-ধারা।

"আমারে পাছে সহজে বোঝো
তাই কি এত লীলার ছল
বাইরে থাকি হাসির ছটা
ভিতরে তার আঁখির জল"

রবীন্দ্রকাব্য ধারায় প্রেরণাদাত্রী যে কাব্যলক্ষ্মীর দেখা বারবার মেলে কখন যেন তিনি মিশে যান জীবনদেতা তত্ত্বের মধ্যে 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'অন্তরতম' কবিতাটিতে এই প্রেরণাকেই বাণীমূর্তি দান করেন কবি। জীবনের ক্ষণকালের আঙিনা থেকে আসা বাস্তব নায়িকা চিত্র ও এই ভাবকল্পনায় মিশে আছে। ক্ষণকালের আভাস থেকে কখন যেন চিরকালের তার সেই রূপকল্পনা কবি হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেছে। এই অনুভবই 'সমাপ্তি' নামে কাব্যের শেষ কবিতাটিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জীবনের ক্ষণমুহূর্ত থেকে লীলাসঙ্গিনী যেন জীবনশেষের অচঞ্চল মুহূর্তেও কবির অন্তরের সাথী হয়ে রইলেন। যিনি প্রেরণা, তিনিই লীলাসঙ্গিনী, তিনিই অন্তরতমা আবার তিনিই

জীবনদেবতা। ক্ষণিকার ক্ষণকালের লীলার পরই কবি চিত্তে এক আধ্যাত্মিক ভাবনার, অলোকচারণার অস্ফুট পদসঞ্চার শোনা যায়, মধ্যবর্তী 'স্মরণ' ও 'শিশু'র পরই কবি বিরহপারের খেয়ায় ভেসে গিয়ে পৌঁছে যান 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'র অধ্যাত্মচেতনার উপকূলে।

কল্পনা, ক্ষণিকার সমকালে রচিত হয়েছিল কথা ও কাহিনীর নাট্যকাব্য ও কবিতাবলী। কাহনীতে সংকলিত নাট্যকাব্যগুলি নাটক পর্যায়ে আলোচিত। 'কথা' গ্রন্থের উপাদানও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আহরিত কথা ও কাহিনী গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথকৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করলে এর আন্তরধর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে,
যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তার"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি ঔৎসুক্য ও আনুগত্যের পরিচয়বাহী। এর প্রথম পর্বের কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতি বাণী পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু এর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভিন্ন স্বাদবাহী। উনিশ শতকের রক্তসন্ধ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর উন্মত্ততা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অত্যাচারিত মানবাত্মার বেদনায় বিদীর্ণ চিত্ত কবি এই সাম্রাজ্যবাদের চরম বিরোধিতা করেছেন।

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অবস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনা একসময় মিলে গেছে তাঁর অধ্যাত্মভাবনায়। এর চরণতম প্রকাশ ঘটেছে নৈবেদ্যর সনেটগুলিতে। প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শকে কবি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ভোগবাদী মানবসমাজে। একদা এ ভারতের কোন বনতলে যে উদাত্ত অমৃতবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তাকেই তিনি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মৃত আত্মায় সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন—

"রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ"।

আত্মশক্তিতে জাগ্রত হতে, উপনিষদের ভাবনায় প্রাণিত হতে প্রার্তনা জানিয়েছেন কবি—

"তবে কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর"

কবি পত্নী মৃণালিনীদেবীর অকাল প্রয়াণের স্মৃতিতে রচিত কাব্য 'স্মরণ' (১৯০৩)। এখানে যে শোক—তা তত্ত্বগত বা ভাবগত নয়—একান্ত ব্যক্তিগত। কবির ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের শূন্যতার উপলব্ধি 'স্মরণ' কাব্যে ধরা পড়েছে। মৃত্যু রবীন্দ্র প্রেমচেতনায় এক বিষ্টি স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যু জীবনের রসকে নিবিড়তর করে এবং যথার্থ প্রেম ও অনুভূতির প্রকাশে মৃত্যু আমাদের চিত্তে অমৃতের স্পর্শ এনে দেয়। তাই তিনি বলেন—"তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী"।

১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩) 'শিশু' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র ও কন্যাকে ঘিরে কবির যে জীবন তারই বাৎসল্য ধারা নিঃসৃত কাব্য রস উৎসারিত 'শিশু'-র কবিতাবলীতে। কিন্তু কেবল স্নেহ বাৎসল্যরসই 'শিশু' কাব্যের একমাত্র রস নয়, সমালোচক বলেছেন—"শিশুর কবিতা শিশুর মুখের কথা নয়,

শিশুমনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে, তাহার মুখের কথা, মনের কথা।"

'উৎসর্গ যদিও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল—এর অধিকাংশ কবিতাই ১৯০১ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে রচিত। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন তাতে কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী এক একটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল। প্রতিটি গুচ্ছের ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ একটি করে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। মুখবন্ধ স্বরূপ সেই কবিতাগুলিই একত্রে 'উৎসর্গ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

'খেয়া' কাব্য রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় এক বিশিষ্ট অধ্যায়। বহির্জীবনের সংঘাত ও অন্তর্জীবনের বেদনার অভিঘাতে 'খেয়ার' রচনাকাল কবি জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমাহিত চিত্তে ভাবগভীর প্রশান্তিতে অন্তর ও বাইরের আলোড়নকে আত্মস্থ করে কাব্য রচনা করে চলেছেন।

এই সময় বঙ্গদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এক প্রবল আবেগও আন্দালন ক্রিয়াশীল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে সারা দেশ চঞ্চল। প্রবল ভাববন্যায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রাণবন্যায় যোগ দিলেন উদাত্ত গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়। বহির্জগতের কর্মপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করলেন। 'খেয়া' সেই সময়ের সাহিত্যফল।

কিন্তু এই দেশব্যাপী উত্তেজনার কালে কবির ব্যক্তিজীবনেও নেমে এসেছিল মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাত। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কবি হারালেন তাঁর পিতা, স্ত্রী এবং দুই পুত্র-কন্যাকে। বাইরের কর্মপ্রবাহে সক্রিয় কবির অন্তর জীবনের এই বিরহবেদনা 'খেয়া' কাব্যে এক অন্যতর মাত্রা এনেছে।

এক অধ্যাত্মগভীর ভাবে 'খেয়ার' কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক হয়ে উঠেছে। কর্মজীবনের চাঞ্চল্য ও ব্যক্তিজীবনের একাদিত্বের মাঝে কবি যেন আলো আঁধারি প্রদোষ বেলায় উপনীত। বিরহপারের খেয়ায় ভেসে তিনি যেতে চান জীবন নদীর ওপারে। তাই তাঁর অকুল অপেক্ষার অনন্ত আহ্বান—

'ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়"

'খেয়া' পরবর্তী কালে রবীন্দ্রজীবনের যে অলোকচারণা পর্ব শুরু—তারই আভাস যেন এ কাব্যে শোনা গেল। 'আগমন' কবিতার মধ্যে ঝড়ের রাতে যে দুঃখরাতের রাজার দেখা পাই—তিনিই রবীন্দ্রজীবনের অসীম অরূপরতন রাজাধিরাজ, প্রভু।

"ওরে দুয়ার খুলে দেরে
বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা"

খেয়াতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক নবতর রূপের প্রকাশ ঘটলো। ভাষার সলতার সঙ্গে যুক্ত হল রহস্যময়তা ও অতীন্দ্রিয় সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। 'খেয়া' কাব্য থেকেই রবীন্দ্রমানসে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নবতর রূপের আভাস দেখা গিয়েছিল, তা পরিণতির পূর্ণতায় পৌঁছলো 'গীতাঞ্জলি' পর্বে। এসময়কার গীতাখ্য তিনটি কাব্য গ্রন্থ (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি) রবীন্দ্রনাথের অলোকচারণার পরিচয় বহন করে। এই তিনখানি কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই গান—এদের নামকরণেই সেই গীতিময়তা পরিস্ফুট।

১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব

গীতাঞ্জলি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—যদিও এর কবিতাগুলি তার আগেই কিছু কিছু রচিত হয়েছিল, অধ্যাত্মসাধনার বেদনা, তার বিভিন্ন স্তর ও বিরহের অস্ফুট ক্রন্দন গীতাঞ্জলিতে ধ্বনিত। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বর বিষয়ক কোনো তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির অনুভবকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রোম্যান্টিক প্রেমের এবং প্রকৃতি অনুরাগের গান আছে, যাতে লেগেছে ভক্তির ছোঁয়া—'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা'।

খেয়া এবং গীতাঞ্জলি পর্বের তিনটি কাব্যের অধিকাংশ কবিতার লগ্ন হয় গোধুলি, নয় আঁধার রাত্রি, নির্জন নদীতীর। কখনো ঝড়ের রাতে আসেন দুঃখ রাতের রজা, কখনো রাত্রি এসে দিনের পারাবারে মিশে যায় আবার কখনো করি অনুভব বেদনার গান হয়ে ওঠে—

"আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে"। গীতাঞ্জলিতে সাধনার এই মধুর বেদন ও বিরহের ব্যাকুল রোদন ধ্বনিত।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (Song offering) উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে নৈবেদ্য ও খেয়ার অনেক কবিতা, গীতিমাল্যর কিছু গান ও গীতাঞ্জলির অনেক গান অনূদিত হয়ে স্থান পেয়েছে।

"গীতাঞ্জলি'র অধ্যাত্ম অনুভূতি পূর্ণতার রূপে প্রকাশিত হয়েছে গীতিমাল্য ও গীতালিতে। গীতাঞ্জলির বিরহ বেদনার দহনজ্বালার শেষে গীতিমাল্য ও গীতালিতে জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ আলাপন।

"কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে"

১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বলাকা' কাব্যে এক নতুন সুর ধ্বনিত হল। রবীন্দ্রমানসে সঞ্চারিত উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্র এবং ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গতিতত্ত্ব মিলে এক সমন্বিত তত্ত্বের দেখা পাওয়া গেল। মানুষের অবিরাম গতিশীলতা ও জগতের প্রতিটি মুহূর্তের নবরূপে সৃষ্টি হওয়াকে বের্গসঁ তাঁর রচনায় তুলে ধরলেন।

"We change without ceasing and the state itself is nothing but change"

রবীন্দ্রমনোধর্মে এ সময় পরিবর্তনবাদের তত্ত্বটি নূতনরূপে উপলব্ধি হয়। তবে রবীন্দ্রচেতনা পুরোপুরি বের্গসঁর প্রভাব সঞ্জাত ছিল না। ছিল না বলেই পরিবর্তনবাদ ও গতিশীলতার মধ্যেও প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার শাশ্বত আবেদনকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। 'বলাকা'-র ছবি কবিতায় জীবনচাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রেমের অচঞ্চল স্মৃতি মহিমা আলোচিত।

জীবনচাঞ্চল্যের বৈশিষ্ট্য রূপেই 'বলাকা' কাব্যে এসেছে যৌবনবন্দনা। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় সেই নবীন প্রাণবন্যার প্রবাহকেই উপলব্ধি করা যায়। কবিতার এই যৌবনদীপ্ত চাঞ্চল্যকে যথাযথ প্রকাশ করবার জন্যই বলাকায় কবি নতুন ছন্দের প্রয়োগ ঘটালেন। এর মুক্তক ছন্দ কবিতার অন্তরধর্মের চাঞ্চল্যকে সার্থক প্রকাশ করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার মধ্যেকার দহনযজ্ঞর বীভৎস রূপ, বিশ্বসৃষ্টি ও গতিবাদের দার্শনিকতা, যৌবনের জয়গান, কবির ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি-ঈশ্বর উপলব্ধি নানা বিষয়ের কবিতা নিয়ে 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন।

পরবর্তী কাব্য 'পলাতকা' ১৯১৮-তে প্রকাশিত। গল্পরসের মিশ্রণ দিয়ে গড়া এ কাব্যের কবিতাগুচ্ছ। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম অনুভূতির পরমতম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু 'পলাতকা'-য় আবার তাঁর দৃষ্টি পড়লো মর্ত্য ধুলির দৈনন্দিন জীবনরঙ্গে। তাই মানবজীবনের সুখ-দুঃখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কবি গেঁথে তুলেছেন হাসি কান্নার হীরাপান্নার মালায়। তাই অতি তুচ্ছ রেল স্টেশনের কুলী বউয়ের বেদনা কিংবা মুক্তি ও নিষ্কৃতির দুই সাধারণ মেয়ের মধ্য দিয়ে চিরচেনা ঘরোয়া জীবনছবি অনুভবগভীরতায় সুমুদ্রিত হয়ে যায়। নারীর মূল্য সম্বন্ধে সমাজদৃষ্টির সমালোচনা এ কাব্যের অনেক কবিতাতে রূপ নিয়েছে।

'শিশুভোলানাথ' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা ভ্রমণের পর মানসিক শান্তি পেতেই যেন শিশুর স্বপ্নরাজ্যে ফিরতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ।

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।
.....শিশুলীলার মধ্যে ডুবদিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে
স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্য"

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে যেন রবীন্দ্র কাব্যধারায় লেগেছে শেষবেলাকার সুর। এর নামকরণেই প্রদোষ বেলার রাগিনীর ছোঁয়া। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সরকারের আমন্ত্রণে কবি তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করে চারমাস পরে দেশে ফেরেন। পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই সেসময়ের রচনা আগের লেখা কবিতাগুচ্ছ 'পূরবী' নামে ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রবাসকালের কবিতাগুচ্ছ 'পথিক' নামে সংকলিত।

এই কাব্যগ্রন্থটি 'বিজয়ার করকমলে' উৎসর্গীকৃত। আর্জেন্টিনা বসবাসকালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে যে বিদূষী মহিলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল তাঁকেই কবি 'বিজয়া' নামকরণে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

একাব্যের কবিতায় এক ব্যথাম্লান করুণতার আভাস। জীবনের শেষ বেলাকার স্মৃতিচিহ্নিত বেদনার ভাবে কবিতাগুলি অপরূপ স্নিগ্ধকরুণ।

"দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায় সারা হয়ে এলো দিন
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ"

জীবনের সাঁঝবেলাতে কবি চিত্তে দোলা দিয়ে যায় ফেলে আসা যৌবনবাসনার স্মৃতিলগ্ন দিন। অতীতের সৌন্দর্যরসভরা দিনগুলোকে একমাত্র স্মৃতির মধ্য দিয়েই ফিরে পাওয়া যায়। তাই 'খেলা', 'কৃতজ্ঞ', 'কিশোর প্রেম', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় লেগে আছে সেই বেদনমধুরিমা।

এই বেদনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়। 'পূরবী' কাব্যকে কবির ' দ্বিতীয় যৌবনের' কাব্য বলা যায়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির হাতের লেখা কবিতা 'কণিকা' প্রকাশিত হয়েছিল 'লেখন' নামে। যখন চীন-জাপানে গিয়েছিলেন কবি, তখন প্রায় প্রতিদিন স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে গিয়ে রচিত হয়েছিল এই 'কবিতিকা'।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহুয়া' রবীন্দ্র কাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন। কবি চিত্তে যে নববসন্তের আবির্ভাব দেখা গিয়ছিল 'পূরবী' রচনাকালে, 'মহুয়া' যেন সেই বসন্তের অনুচর হয়ে নবপ্রেম উন্মাদনার রস সঞ্চারে যুক্ত হল। বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের চরমতম প্রকাশ মহুয়া। প্রেমের মধ্যে যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল, সাধারণ মানুষকে অসামান্য করে দেখার মায়াঞ্জন আছে সেই মায়ালোক কেই 'মহুয়া কাব্যে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রেমের বহিরঙ্গ প্রসাধনকলা ও অন্তরঙ্গ সাধনার সমন্বিত প্রকাশে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি অপরূপ। 'মহুয়া' কাব্যে সংকলিত কয়েকটি কবিতা লেখা হয়েছিল 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জন্য। ভাবের সাযুজ্য থাকায় সেগুলি 'মহুয়া'তে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলিতে একটি তত্ত্বের ছোঁয়া আছে। যে প্রেম বন্ধ করে না, মুক্তির মাঝেই খুঁজে পায় সার্থকতা, গতিময় প্রেমের সেই সক্রিয়তাই 'শেষের কবিতায়' ব্যক্ত। এর কবিতাতেই তাই জীবনবেগের স্পন্দনের সঙ্গে জীবনাবেগের সার্থক যোগ ঘটেছে।

'মহুয়া'র পর প্রকাশিত হয় 'বনবাণী' (১৯৩১) বৃক্ষলতায় এক প্রাণের লীলার সৌন্দর্য এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত। কবি বলেছেন—

"ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের ডালে
ডালে পাতায় পাতায় এক ছন্দের নাচন।"

রবীন্দ্রমানসে নিসর্গচেতনার যে বোধ আবাল্যযুক্ত—তাই নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় বন্দিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—তাদের ডাক তাঁর মনের মধ্যে পৌঁছে এক মিতালির বন্ধনে জড়িয়েছে। বনবাণী বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে কবি চিত্তের সেই মিতালীর গান। পরিশেষ কাব্য ১৯৩২ সালে প্রকাশিত। এর নামকরণেই কবি এক সমাপ্তির আভাস দিতে চেয়েছেন। এ কাব্যের কিছু কবিতা কলকাতার উপকণ্ঠে রচিত। অবশিষ্টগুলি জাভা-বালীদ্বীপে ভ্রমণকালে লিখিত।

সমালোচক এ কাব্যকে বলেছেন কবির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয়ের কাব্য। সত্তর বছরের প্রান্তে এসে কবি যেন তাঁর সারাজীবনের ক্রমাভিব্যক্ত স্তরকে নিজেরই দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে উপলব্ধি করছেন—

"দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের
নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম"

১.৩.৭ সপ্তম পর্ব

কিন্তু দিনান্তের পরেও আবার নতুন প্রভাত আসে। রবীন্দ্রকাব্য তাই পরিশেষ হয়েও সমাপ্ত হয় না—তাই ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়—'পুনশ্চ'। রবীন্দ্র কাব্যধারায় যে ভাবপ্রবাহ 'পরিশেষ' পর্যন্ত বহমান সেই ধারায় নতুন সংযোজন 'পুনশ্চ'। এই নতুনত্ব ধরা পড়েছে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে। তাই পুনশ্চ রবীন্দ্রকাব্যে পালাবদলের কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ সর্ব অর্থেই আধুনিক মানুষ, সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুগলক্ষণকে স্বীকার করে সাহিত্যে সমকালীন বাস্তবকে মেনে নেন। রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পপ্নময়তা সত্ত্বেও জীবনকে দেখার গভীর সত্য দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই মনন কল্পনার নবীকরণ তাঁর পক্ষেই করা সম্ভভব। মননের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রীতি পরিবর্তনও ঘটেছে এই কাব্যে।

'লিপিকার'ও আগে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে মুক্তক ছন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। 'লিপিকা'য় গদ্য কবিতা লেখার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তার সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্তি ঘটলো 'পুনশ্চ'তে এসে, দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বকে রূপ দেবার মাধ্যম হিসাবে এখানে এলো গদ্যছন্দ পূর্ণরূপে।

ভাষা পরিবর্তন ছাড়া কবিতার রস বিচারেও পরিবর্তন এসেছে। এর গদ্যভাষা সহজ, আটপৌরে, ছন্দোরীতি বাঁধনভাঙা আর মনোভঙ্গীতে ধরা পড়েছে আধুনিককালের ভঙ্গুরতার ছবি। বিড়ম্বিত তুচ্ছ মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কবিতা যেমন আছে (ছেলেটা, সহযাত্রী, বালক, সাধারণ মেয়ে) আছে কীটের সংসার-এর মতো তুচ্ছ বিষয়ও। সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা আন্দোলন বিষয়ক কয়েকটি কবিতার রূপায়ণে সমসাময়িককালে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের প্রভাব মুদ্রিত। অবশ্যই রবীন্দ্রচেতনার অন্তর্লোকে এই মানবতাবাদী চেতনা পূর্বেই ছিল। 'পুনশ্চ'তে যে প্রেমের কবিতার দেখা মেলে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব। প্রেমের উর্ধায়ন বা Sublimation কিংবা বিরহতত্ত্ব নয়—পরিবর্তে বস্তবের নির্মম সত্যকে যথাযথ উপস্থিত করা হয়েছে। মানুষী প্রেমের দুর্বলতার বাস্তব ছবি বর্ণরিক্ততায় চিত্রিত এ কাব্যে।

আবার বিদেশী প্রভাবজাত কিছু কবিতাও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে অবস্থানকালে The Child নামে কবিতার অনুবাদ করেন 'শিশুতীর্থ'। এছাড়া টি. এস. এলিয়টের "Journey of the Magi" কবিতার অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী', 'পুনশ্চ' কাব্যতেই স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী দুটি কাব্য 'শেষসপ্তক' ও 'বীথিকা' ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষসপ্তকে বিচিত্রধর্মী কবিতার দেখা পাই—অতীত স্মৃতি মৃত্যুরহস্য, জীবন সম্পর্কে তত্ত্বভাবনা ও অসামান্য কিছু, প্রেকবিতা। 'পুনশ্চ'র ভেঙে যাওয়া প্রেমের নির্মমতা এখানে নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনের শূন্যতাবোধে রিক্ত অথচ স্মৃতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ অসামান্য প্রেমানুভব আছে। তারই অনবদ্য স্বীকারোক্তি মেলে এর ৪৫নং কবিতায়—

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে
পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে....
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা
.....
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
—শেষ কথা বলে যাব
'দুঃখ পেয়েছি অনেক
কিন্তু ভালো লেগেছে
ভালো বেসেছি।'

'বীথিকা' কাব্যেও বিস্মৃত-চিরস্মৃত প্রেমের দুইরূপ ধরা পড়েছে। 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় কৌতুকস্নিগ্ধ সংলাপে আমন্ত্রণী পত্রটি কবির ব্যক্তিগত গৃহস্মৃতির মাধুর্যে মনকে ভরিয়ে দেয়।

আবার 'পোড়ো বাড়ি' কবিতাতে স্মৃতির সুখাবেশ নয়—দেখি অন্যতর রূপের আভাস।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পত্রপুট' গদ্যছন্দে রচিত। কবির আত্মভাবমূলক নানা কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত কাব্যরূপ। 'পৃথিবী', 'ওরা অন্ত্যজ' প্রভৃতি এ কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা।

কবির শেষবেলাকার বাসার নাম 'শ্যামলী'। "এই যে কালো মাটির বাসা, শ্যামল সুখে ভরা"—সেই বেলাশেষের মাটির ঘরের নামেই তাঁর বেলাশেষের এক কাব্য 'শ্যামলী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।

গদ্যছন্দে রচিত এ কাব্যের কয়েকটি কবিতা কথিকাধর্মী। এগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশের ছবি দেখা যায়। 'হঠাৎ দেখা', 'কণি', 'অমৃত'—তিনটি অসামান্য প্রেমকবিতা যার মধ্যে প্রেমের সহজ আলো বিকীর্ণ অথচ কোনো তত্ত্ব বা দার্শকিতার প্রলেপ নেই।

উদ্ভট কল্পনা ও কৌতুকরসের মিশ্রণে রচিত ছোট কবিতার সংকলন 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। কবির স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদ বহন করে।

একই বছরে প্রকাশ পায় 'ছড়ার ছবি'—নন্দলাল বসুর কিছু স্কেচ অবলম্বনে এর কবিতাগুলি রচিত। অনেক কবিতাই গল্পধর্মী।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ কবিজীবনের শেষ পর্যায়। এই গোধূলিবেলার কাব্যে ধরা আছে তাঁর শেষবেলাকার ভাবনা, চেতনা, বোধ, প্রত্যয় ও অনুভব।

প্রথম কাব্য—প্রান্তিক। অসুস্থতাজনিত আকস্মিক চৈতন্যলুপ্তি ও আরোগ্যলাভের পর এর কবিতাগুচ্ছ রচিত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে' প্রাণ শক্তির সংগ্রাম—অধিকাংশ কবিতার বিষয়। চেতন-অচেতনের প্রান্তে এসে যে কবিতার জন্ম তার নাম সঙ্গত কারণেই কবি দিয়েছেন 'প্রান্তিক'।

আত্মার চরম মুক্তি আস্বাদনের জন্য কবি যেন মহা অনন্তের মধ্যে লীন হতে চান। এই গভীর আত্মমগ্ন প্রশান্তির কালে যখন বিশ্বজুড়ে রণদামামার হুঙ্কার তখন মানুষের অপমানে ক্ষুব্ধ করি লিখনের প্রান্তিকের শেষ দুটি কবিতা—অন্যতর ভাবনাবাহী।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'—ঈর্ষাকতর, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব কবলিত পৃথিবীর বিকৃতরূপে বিক্ষুব্ধ কবি চিত্তের যন্ত্রণা এখানে মূর্ত।

১.৩.৮ অষ্টম পর্ব

সেঁজুতি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি নিজের জীবনসন্ধ্যায় যেন নিজ হাতে জ্বেলেছেন সাঁজের বাতি। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে যেন জীবনের দিবাবসানের হিসেব মেলাতে চায় কবিরহৃদয়। যাবার মুখে, পরিচয়, জন্মদিন—সব কবিতাতেই বিদায়বেলার সুর লেগেছে। এই আত্মভাবনামূলক জীবনশেষের বোধে উজ্জ্বল সেঁজুতির কবিতাগুচ্ছ—যেখান পড়েছে অস্তগামী রবির বিদায় বেলার বিষণ্ণ ছায়া।

'প্রহাসিনী' ভিন্ন স্বাদের কাব্যগ্রন্থ। "সেজুঁতি'র পরেই প্রকাশিত (১৯৩৯) এই কবিতাগুচ্ছ হাস্যরসাত্মক। কবির জবানিতে বলা হয়েছে—"আমার জীবনকক্ষে জানি না কি হেতু/মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু"

কবির শেষ বেলার গান—আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি বলেছেন—এর কবিতাগুলি "স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা"। শেষ বয়সে মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায়। ঘরের মাঝে যখন চেনামুখের মেলা সাঙ্গ হয়ে আসে, ঘনিয়ে আসে সাঁঝের বেলা—তখন স্মৃতিই মানুষের আশ্রয়। এই অতীত স্মৃতি স্বপ্নের আলোছায়ার মায়া ঘেরা 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য। এ আকাশ কবির মনের আকাশ যেখানে সাঁঝবেলায় স্মৃতির নক্ষত্র খচিত।

স্মৃতিসুরভিত অসামান্য কয়েকটি কবিতায় গভীর অনুভবের বাণী উচ্চারিত। 'শ্যামা', 'কাঁচাআম', 'বধূ', 'সময়হারা' প্রতি কবিতাই স্মৃতি মাধুরী ঘেরা। অতীতের স্মৃতিস্বর্ণিমা আজ ধূসর জীবনের গোধূলিতে ফেলেছে ছায়ামাধুরী। এই বেদনা বিধূর অনুভবেই শেষ হয়েছে 'আকাশপ্রদীপ', তবে কবির স্থির প্রত্যয় মিলনদিনে সাক্ষী ছিল যারা—"আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা"। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন ধরনের কাব্য 'নবজাতকের' সূচনায় কবি বলেছেন—

> "আমার কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।.... এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা
> হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মনভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য"

কবি জীবনের প্রৌঢ় ঋতুর এই নবজাত কবিতায় ধরা পড়েছে নতুন সমাজ চেতনা, ইতাহস চেতনা। দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব এ কাব্যের নামকরণের সার্থকতাকে প্রমাণ করে। কবি নিজের মনন কল্পনাকে বিস্তৃত করে বর্তমানযুগের নতুন বিষয়কে কাব্যের উপাদান করেছেন—এরোপ্লেন, রেডিও, রেলগাড়ি।

পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বর্তমান সভ্যতার আত্মক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক রূপের নিষ্ঠুর ছবি। এই সভ্যতার ধ্বংসকামনা করে কবি নতুন জীবনের আশায় জাগ্রত থাকতে চান। বর্তমানের ধ্বংসকামনা ও নবসৃষ্টিতে বিশ্বাসই 'নবজাতকে'র কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।

একই বছরে প্রকাশিত হয়—'সানাই' কাব্যগ্রন্থ। গীতিকাব্য হিসেবে 'সানাই' সম্ভবত এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্যে ভালোবাসার রাগিনী যেন ধরা পড়েছে সানাই-এর সুরে। এর নামের মধ্যে যে মিলন দিনের প্রতীকদ্যোতনা তার মধ্যেই ধরা আছে এর ভাবকল্পনা। 'সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত'—কবির এই উচ্চারণের অনিবার্য স্বাক্ষর 'সানাই'।

এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতা পরে সঙ্গীত রূপান্তরিত হয়েছে—অনেক গান থেকে আবার ছোটো কবিতা রচিত হয়েছে। বিশেষভাবে রোম্যান্টিক মন ও প্রেমানুভব এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত।

দীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় স্মৃতিবেদনার যে মালা গাঁধা হয় মনের নিভৃতে, তারই সৌরভ যেন কবির মনে রচনা করে এক মানসী মায়া, যুগান্তরের প্রিয়াকে লোকান্তরের নির্বাসন থেকে হৃদয়ে অনুভব করেন তিনি।

"আজ এ মনের কোন সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া
দূরে উড়ে যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া"

এভাবেই সানাই কাব্যের গানের সুর লেখা কবিতাতে তাঁর বাসনা ও বেদনাকে অনুভব করতে পারি। প্রণয়স্মৃতির সঙ্গে এতখানি বেদনা এমনভাবে কবিকে আগে ঘিরে ধরেনি। সানাই সেই প্রেমবেদনার মধুরতম উচ্চারণ।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত হল 'রোগশয্যায়'। নামকরণের মধ্যেই এর সুরটি ধরা পড়েছে। কালিম্পঙে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কবি ফিরে আসেন কলকাতায়। রোগ যন্ত্রণার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে আরোগ্য লাভের প্রাণশক্তির অনুভব। এজন্যই এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থর নাম 'আরোগ্য'। মাত্র দুমাসের ব্যবধানে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-এর শেষে 'রোগশয্যায়' ও রোগমুক্তির পর ১৯৪১-এর প্রথমে 'আরোগ্য।'

'রোগশয্যায়' জীবন-মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির এক তত্ত্ব বা দর্শন যেন কবিচিত্তকে অধিকার করেছে। ফলে রোগজর্জর যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি নয়, নির্ভীক সহিষ্ণু মননশক্তির প্রকাশে কবিতাগুলি উদ্দীপ্ত। দেহ যন্ত্রণা যত তীব্র, যত সত্যই হোক—তা প্রাণেরই সঙ্গী। তাই কবির রচনায় মানুষের দুঃখবিজয়ী প্রাণসত্তার জয়গানই ধ্বনিত।

"অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান"

একই সঙ্গে ব্যক্তিগত দুঃখ ও রোগের প্রসঙ্গ কবিকে বৃহত্তর জনগণের বিচিত্র দুঃখবেদনার সহমর্মী করে তুলেছে। সর্বজনের দুঃখ যন্ত্রণা যেন নিজের রোগ যন্ত্রণার উর্ধে উঠে তাঁকে করে তুলেছে সর্বমানবের ব্যথাবেদনার অংশীদার। 'আরোগ্য'-র কবিতাগুলিতে 'রোগশয্যার' কবিতার সুর ধ্বনিত। তবে এখানে আরোগ্যোত্তর চিত্তে ধরা পড়েছে সত্যের অমৃতরূপ। তাই তাঁর আত্মসমাহিত প্রশান্ত চিত্তের নিবেদন—

"শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি"

মর্তধূলির তিলক মানুষের ভালোবাসার প্রতীক। তাই যাবার আগে ধূলার ধরণীর প্রীতস্নিগ্ধ দান সর্ব অঙ্গে ধারণ করতে চান কবি। মৃত্যুর পটভূমিকার অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করে কবি জীবন ও সৃষ্টির অনিঃশেষ প্রবাহে মিলতে চান।

'জন্মদিনে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (ইং-১৯৪১)। জন্মমৃত্যুর সন্ধিলগ্নে উপনীত হ'য়ে কবি রচনা করেন যে কাব্য তার নাম দিলেন 'জন্মদিনে'। আসন্ন মৃত্যুর পদসঞ্চারে তাঁর জীবন ভাবনা শান্ত-সমাহিত, প্রশান্ত।

"যে রহস্যসূত্রে এসেছিনু আশি বর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে'

মৃত্যুর করাল ছায়া নয় যেন তার অমৃত স্পর্শই কবি জীবনে অনুভব করতে চাইছেন। তাই জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মুখোমুখি বসে তিনি সত্য সুন্দরের অমৃতময় মূর্তিকে উপলব্ধি করতে চান।

যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিদ্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্ভবন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৈশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় াবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে নানা উপলক্ষে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে—আনন্দে, অনুষ্ঠানে, উৎসবে, শোকে, দুঃখে বেদনায়, বিরহে, স্মরণে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরিহার্য। তাঁর গানে স্বদেশচেতনার উদ্দীপনা আছে, আছে প্রকৃতির রূপবিভোরতার মুগ্ধতা, আছে প্রেমের মাধুরী, আছে পূজার নিবিড় নিবেদন। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধন—যা রবীন্দ্রসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য—তা তাঁর গানের বাণীতেই সার্থকভাবে উচ্চারিত। তাই তিনিই বলতে পারেন—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাবো
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো"

১.৫ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্র কাব্যের আদিপর্বের বৈশিষ্ট্য কী?
২। রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয়পর্বের অন্তর্গত কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩। 'সোনারতরী' কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার পরিচয় দিয়ে এই পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪। 'চিতার' কাব্যের জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতাগুলির তাৎপর্য নির্দেশ করুন।
৫। 'খেয়া' কাব্য থেকে শুরু হয়ে গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাগুলির অধ্যাত্মভাবনার পরিচয় দিন।
৬। 'বলাকা' কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
৭। 'কবির শেষ রাগিণীর বীণ' পুরবী কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে তার পরিচয় দিন।
৮। 'পুনশ্চ'কে রবীন্দ্রসাহিত্যে পালাবদলের কাব্য বলার কারণ কী?
৯। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
১০। রবীন্দ্রকাব্য ধারায় মৃত্যুচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১১। রবীন্দ্রকাব্য কালিদাসের প্রভাব প্রসঙ্গে 'কল্পনা' কাব্যের কয়েকটি কবিতার পরিচয় দিন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—১৩৯২।
২. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়—প্রকাশকাল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস।
৪. পান্থজনের সখা—আবু সয়ীদ আইয়ুব (দে'জ)।
৫. কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু (দে'জ)—১৯৮০।
৬. রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।
৭. রবীন্দ্র কবিতালোক—জ্যোতির্ময় ঘোষ (দেজ পাবলিশিং)।
৮. রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ঃ মানবিক প্রেম বনাম তাত্ত্বিকতা—মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তক বিপনি)১৯৯৫।
৯. রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
১০. রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিবদ্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৈশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় আবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ২ □ রবীন্দ্রনাটক

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

২.৩ অনুশীলনী

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে নাট্যরচনার প্রচেষ্টা প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। প্রথমযুগের নাট্যপ্রয়াস ছিল এই ধারার অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের আগে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধুমিত্র, গিরিশিচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়র নাটকে সেই পথ ধরেই বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত বহুল প্রকাশধর্মিতা দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃত ঐতিহ্যের ভাবানুসরণ ও পশ্চাত্য নাটকের আদর্শের সমন্বয়ে বাংলা নাটক বিকাশের পথে এগোচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে উন্মোচিত করলেন অন্তর্জগৎ। তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত বৈশিষ্ট্যে নাটক হ'য়ে উঠলো নতুনতর এক সাহিত্যমাধ্যম, যেখানে অনুভূতির গভীরতা ও ভাবের প্রাধান্য। এজন্যেই এডওয়ার্ড টমসনের মন্তব্যটি যথাযথ বলেই আমাদের মনে হয়—

"His dramatic work is the vehicle of
ideas, rather than the expression of action"

রবীন্দ্রনাটকে এই ভাবময়তারই প্রাধান্য, তাঁর কবিসত্তার অনির্বাণ আলোতে তাঁর নাটকগুলিও আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠার কালে পারিবারিক নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ তাঁর হ'য়েছিল এবং অলক্ষ্যে সেই ধারা তাঁর মনে সঞ্চারিত হ'য়ে পরবর্তীকালে সার্থক প্রকাশগৌরবে অভিনন্দিত হ'য়েছিল।

রবীন্দ্রনাটক পর্ব থেকে পর্বান্তরে নবরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবু সামগ্রিকভাবে তাঁর নাটকে এক গীতময়তা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়র উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে।

—"রবীন্দ্রমানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীত ধর্মী মানস যে কাব্যেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে সর্বত্রই ইহার প্রকাশ দেখা যায়, নাটকেও তাহাই।"

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকে এই লীরিক্যাল বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা—এই পর্বের রচনা। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক—'রুদ্রচণ্ড'। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রুদ্রচণ্ড' তারই নাট্যরূপ বলে অনুমিত।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও ১৮৮৮ তে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' অনেকটাই পাশ্চাত্য-অপেরাধর্মী নাট্যপ্রয়াস। কবির নিজের ভাষায় 'বাল্মীকি প্রতিভা' গানের সূত্রে নাট্যের মালা' এবং মায়ার খেলকা 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা।' ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'কালমৃগয়া'-র অনেকখানি অংশ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই গীতিনাটিকার বিষয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় দস্যুরত্নাকরের মানস উত্তরণের দিকটি প্রকাশিত। তার হৃদয়দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম ও ভাবময়। বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অভিনয়ের কারণেও নাটকটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী সরস্বতীর ভূমিকায় ছিলে। বাল্মীকি প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে।

সখীসমিতির অনুরোধে 'মায়ার খেলা' রচিত হয় এবং বেথুন কলেজে প্রথম অভিনীত হয়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য প্রয়াস যা গানের ছাঁচে চালা নয়। বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ মৌলিক। এখানেই আমরা প্রথম একটি বিশিষ্ট নাটকীয় রসের আস্বাদন লাভ করি। টমসন সাহেবের মতে এটিই রবীন্দ্রনাথের "first important drama".

এই নাটিকার নায়ক একজন সন্ন্যাসী। তিতিন সমস্ত আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে নির্জন গুহায় সাধনরত। একদিন এক পিতৃমাতৃহীন সর্বজনঘৃণিত অসহায় বালিকার প্রতি মমতাবশত তিনি তাকে আপনার কাছে আশ্রয় দেন। সর্ববন্ধনরিক্ত এই সন্ন্যাসীকে ক্ষুদ্র বালিকা তার ভালবাসা দিয়ে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে কিভাবে ফিরিয়ে আনলো—তাই নাটকের বিষয়। শেষপর্যন্ত কন্যাটিকে হারিয়ে সন্ন্যাসী বিশ্বচরাচরে তাকেই অনুভব করলেন, সীমা ও অসীম একাকার হ'য়ে গেল।

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্রনাট্য ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০) ও মালিনী (১৮৯৬) এই পর্বের প্রখ্যাত কাব্যনাট্যত্রয়ী। ভাবকল্পনার ধারায় এই তিনটি নাটক সমধর্মী তিনটি নাটকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আঙ্গিক রচনায় মিলেছে পাশ্চাত্য ধারা। গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির প্রভাব তিনটি নাটকেই লক্ষ্য করা যায়।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র সমকালে রচিত কাব্য 'মানসী' (১৮৯০)। মানসীর নিষ্ফল কামনা কবিতাটিতে আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর প্রকাশ। প্রেমের এই সীমা-অসীম তত্ত্বই প্রধানত 'রাজা ও রাণী' নাটকে রূপ লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা,
সমগ্র মানবকে পাইতে চাহিবার দুঃসাহস
রাজা ও রাণীর ট্র্যাজেডি।"

এই নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কাঠামোয় একটি কল্পিত কাহিনী। রাজা বিক্রমদের ও রাণী সুমিত্রার যুগল প্রাধান্য নামকরণে প্রকাশিত। তাদের উভয়ের রাজা ও রাণী সত্তার সংঘর্ষ ও সংঘাতে দ্বন্দ্ব জর্জর ক্ষতবিক্ষত আত্মানুসন্ধান নাটকটির প্রতিপাদ্য।

এ নাটকে শেক্সপীরীয় প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় পাই। 'জীবনস্মৃতি'র ভগ্নহৃদয় পর্বে নিজেই বলেছেন—শেক্সপীয়র ছিলেন তখনকার আদর্শ। পরবর্তীকালেও 'মালিনী' নাটকের ভূমিকাতে লিখেছেন—

"শেক্সপীয়র -এর নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। এর বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকে আমাদের মনকে অধিকার করেছে"

'রাজা ও রাণী' নাটকের প্রদান চরিত্রে প্রবৃত্তির প্রবল আলোড়ন শেক্সপীয়রকেই মনে করায়। বিক্রমদেব একটি অসামান্য নাটকীয় চরিত্র। ঈর্ষা ও আত্মদানে কিছুটা 'ওথেলো'র ও প্যাশনের তীব্রতায় অ্যান্টনীর (অ্যান্টনী এ্যন্ড ক্লিওপেট্রা) সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাই। তার তীব্র আবেগপ্রবণ, প্রবৃত্তি পরায়ণ চিত্তদাহ শেক্সপীরীয় আবেগের আতিশয্যকে মনে করায়। প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বিক্রম চরিত্র যথার্থই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে দীর্ণ এক নাটকীয় চরিত্র। তবে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বোধের মহিমাও এ চরিত্রে প্রকাশিত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে নাটকীয় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অনেক সময়ই গীতি ধর্মী আবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় নাটকটি মাঝে মাঝে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে।

পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচক টমসন বলেছেন—

"Sacrifice is the greatest drama in Bengali literature"

এই নাটকের বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন—"বিসর্জন নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ।" তিনি দেখিয়েছেন প্রথা প্রেমকে বিনাশ করতে চাইলে প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই প্রথার অভ্যাস থেকে রঘুপতি চরিত্রে এসেছে প্রতাপের অহংকার। সেই প্রতাপ চূর্ণ হ'ল প্রেমের শক্তির কাছে—এটিই নাটকের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সব দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী 'রাজা ও রাণী'-তে আসক্তির বিরুদ্ধে প্রেমের জয় ঘোষিত—এ নাটকে প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের সংগ্রাম চিত্রিত, যেখানে শেষপর্যন্ত প্রেমই জয়ী হ'য়েছে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের প্রেক্ষিতে দেবী মন্দিরে জীব বলিদানের বিরুদ্ধে নাট্যকারের মানবতাবাদী মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। রাজা গোবিন্দ মাণিক্য প্রেমের ধ্রুব আদর্শে অবিচল এক চরিত্র। রাজপুরোহিত রঘুপতি প্রথা ও আচার-সর্বস্ব ধর্ম আচরণের অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী। এই দু'জনের দ্বন্দ্ব সংকটের মাঝখানে জয়সিংহ যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক আবার দোলাচল আত্মসংকটের আবর্তে সে যেন শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শ প্রতিভূ।

এই দু'টি পঞ্চাঙ্ক নাটকের পর রচিত হয় 'মালিনী' ক্ষুদ্র নাটিকা—যার মধ্যে নাট্যকার ট্রেভেলিয়ন খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রীক নাটকের প্রতিরূপ—"সংযত, সংহত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন"।

এ নাটকেও সনাতন প্রথা ও ধর্মের সঙ্গে নবধর্মের বিরোধ চিত্রিত। 'বিসর্জন' নাটকের বলিদান প্রথা বন্ধের সঙ্গে কোথাও যেন বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ব্রত জড়িত। আবার মালিনীতেও দেখেছি নবধর্মে এই অহিংসার তির্যক প্রতিফলন, এই নাটিকাতে—প্রধান তিনটি চরিত্র—ক্ষেমংকর, সুপ্রিয় ও মালিনী। মাত্র চারটি দৃশ্য সম্বলিত এ নাটিকাটি সত্যই সংহত ও সংযত—যা ক্ল্যাসিক গ্রীক নাট্য পদ্ধতিকে মনে করায়।

তিনটি নাটকই ট্র্যাজেডির সার্থক নিদর্শন। চরিত্র চিত্রণে ও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা লক্ষণীয়।

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

পরবর্তী চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও বিদায় অভিশাপ নাট্যরূপের আশ্রয়ে কাব্য। সমালোচক বলেন "ইহাদের ভাববস্তু একটা নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মূলত ইহারা নাট্য নহে।" এগুলি বিশেষ ধরনের শ্রুতিনাটক বা Reading drama-র সমপর্যায়ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র কাহিনী অংশের অন্তর্গত বিখ্যাত কয়েকটি কাব্য-নাট্য হ'ল—গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষীর পরীক্ষা ও কর্ণকুন্তী সংবাদ।

এগুলির কাব্যমূল্য অসাধারণ, তবে এদের নাট্যগুণ ও বৈশিষ্ট্যও উল্লেখের দাবি রাখে। 'সতী' কাব্যনাট্য-তে সমাজ, ধর্ম ও চিরাচরিত সস্কারের সঙ্গে বাৎসল্য রসের সংঘাতে নাটকীয়তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকাওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ থেকে এর কাহিনী গৃহীত।

'নরকবাস' পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। রাজা সোমকের পিতৃধর্ম ক্ষাত্রধর্মের গর্বের নিকট আহত ও অবমানিত। তবে এ পর্যায়ে নাটকীয় শ্রেষ্ঠত্ব তার চরম সীমা স্পর্শ করেছে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্য নাট্য দুটিতে। মহাভারতের চরিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এ দু'টিতে অসামান্য নাট্যমুহূর্ত' রচনা করেছেন। গান্ধারী চরিত্রে নারীর স্বামীভক্তি ও পুত্রস্নেহের সঙ্গে শাশ্বত নিত্য মানবধর্মের সংঘাতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এদু'টি চরিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জর ট্র্যাজিক মহিমাদীপ্ত। বিশেষত কর্ণ চরিত্রে মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সত্তার সঙ্গে মানবধর্মের সংঘাতে যে দোলাচলতা সৃষ্ট তা তাকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের মহিমা দান করেছে। কুন্তী চরিত্রের অকথিত বেদনাকেও রবীন্দ্রনাথ মরমী দৃষ্টি প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে উদ্ভাসিত করেছেন।

উনিশশতকের রেনেসাঁসের দীপ্ত চেতনালোকে নবমানবতা-বাদের স্পর্শে চরিত্রগুলি নব রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে।

এদের মধ্যে 'লক্ষীর পরীক্ষা' কিছুটা স্বতন্ত্র। লঘু সুর তালে ছন্দে ঘেরা এই কাব্যনাট্যে অনাবিল হাসির স্রোত প্রবাহিত। তাই মধ্যে মানবমনের নিগূঢ় রহস্য আভাসিত।

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র নাট্য ধারায় কৌতুকস্নিগ্ধ সরসতার ছায়া পড়েছে। 'ব্যঙ্গ কৌতুক' ও হাস্যকৌতুক (১৯০৭), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষরক্ষা (১৯২৮) ও তাসের দেশ (১৯৩০) এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

হাস্যকৌতুকের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"এই ক্ষুদ্র কৌতুক নাট্যগুলি হেঁয়ালি নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'-তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (Charade) নামক একপ্রকার নাট্য খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়"।

এর সবকটি নাটকই অতি ক্ষুদ্রকায়। কৌতুকাবহ বিষয় ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এগুলি অনাবিল হাসির রস সঞ্চার করে। 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গ কৌতুকের অন্তর্গত দুটি নাট্য—'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'বশীকরণে'র মধ্যে শেষোক্তটি সাহিত্যবিচারে অতি উচ্চমানের।

'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক, প্রথম প্রহসন—সুতরাং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার্য। এর

কৌতুকের মূলে আছে ভ্রান্তিবিলাস—যাকে বলতে পারি 'Comedy of errors'। এটিকে প্রহসন বলা চলে না, পুরোপুরি রোম্যান্টিক কমেডি। নামের ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে ঘটনাবর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটিত হ'য়েছে এবং নির্ভেজাল কৌতুকস্নিগ্ধ নির্মল হাস্যরসে নাটকটি দীপ্ত উজ্জ্বল। অনেক পরে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এর পরিমার্জিত অভিনয়োপযোগী রূপ দেন, সেটি 'শেষরক্ষা' নামে জনপ্রিয় ও পরিচিত।

চিরকুমার সভা প্রথমে উপন্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এর নাম হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', কিন্তু শেষপর্যন্ত কবি উপন্যাসটির পরিমার্জিত নাট্যরূপ দেন—তখন এটি 'চিরকুমার সভা' নামেই পরিচিতি লাভ করে। 'ভারতী'র সম্পাদিকা ভাগিনেয়ী সরলাদেবীর অনুরোধে সামাজিক প্রহসন হিসাবে কবি এটি রচনা করেন। সেসময় বিবেকানন্দের আদর্শে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ এই সংসার বীতস্পৃহ সন্ন্যাসের আদর্শকে মন থেকে মাতে পারেননি। সমসাময়িক কাব্য 'ক্ষণিকা'র কবিতাতেও লঘু কৌতুকের চালে বলেছেন—

"আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না
যেমনি বলুন যিনি
আমি হবো না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী"

অসামান্য রস মধুর সংলাপ, কৌতুকাবহ পরিস্থিতি ও অনবদ্য সঙ্গীত সহযোগে 'চিরকুমার সভা' বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' অন্য দু'টি প্রহসনের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। তিনটি দৃশ্য সম্ভবলিত ক্ষুদ্র এই নাটিকা হাসি অশ্রুধারায় অনবদ্য প্রহসন। এর বিশুদ্ধ 'হিউমার' একে high comedy-তে উত্তীর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ নাটকে কেদার চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৈকুণ্ঠ চরিত্রে যে সকরুণ মাধুর্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তা' সাধারণ লঘু স্তরের প্রহসনে নয়, অতি উচ্চমানের কমেডিতেই সৃষ্টি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পুরোনো গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। বহুদিন পরে এই গল্পকেই কবি রূপান্তরিত করেন 'তাসের দেশ' নাটকে। আপাত ব্যঙ্গরসাত্মক এই নাটকে আছে এক অন্তর্লীন তত্ত্ব। আমাদের সমাজের জড় প্রাচীনপন্থী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে নূতন প্রাণের বন্যাধারা আনার কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ তাসের দেশের অচালয়তনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র নিয়ে এল মুক্তির গান, অনিয়মের কূল ছাপানো আনন্দ হিল্লোল। নতুন প্রাণের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে কবি এই নাটক উৎসর্গ করে প্রাণময় চাঞ্চল্যের জয়গান করলেন। এই নাটকটি অনেকাংশেই রূপক নাট্যকে স্পর্শ করেছে।

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় রূপক-সাংকেতিক নাটক এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এগুলিকে সামগ্রিক ভাবে তত্ত্বনাটক বলা যুক্তিসঙ্গত। রবীন্দ্রমনোলোকের এক গভীর পরিচয় এই নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। সমালোচক টমসন যে রবীন্দ্রনাটক সমূহকে আইডিয়া বা ভাবের প্রকাশক বলেছেন, তা এজাতীয় নাটকগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্যধারায় ক্রম পর্যায়ে এসেছে—শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১১), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), রথের রশি (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

বাংলা সাংকেতিক নাটকের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে অবশ্য রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের। সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে রূপকের নিবিড় যোগ থাকলেও দুটি ভিন্ন প্রকরণ। কিন্তু দুটিতেই প্রতীকের ব্যবহার এবং তত্ত্বের প্রাধান্য থাকায় অনেক সময় রূপক সাংকেতিক একই সঙ্গে উচ্চারিত ও আলোচিত হ'য়ে থাকে। পাশ্চাত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই সাংকেতিক নাটকের জন্ম সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় নাটকে ভারতীয়

অধ্যাত্মদর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদ মিলেছে। সীমার সঙ্গে অসীমর রূপের সঙ্গে অরূপের মিলন সাধনের মধ্যেই আছে লীলারহস্য প্রকাশের সংকেত। সেই লীলাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার অক্ষমতাই সংকেতের জন্ম দিয়েছে। অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতীকী আভাসই সংকেতের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অলোকচারী মানসে অরূপতত্ত্ব যখন প্রকাশের পথ খুঁজছে, তখনই সংকেতের মাধ্যমে তা' খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রজীবনে আলোকচারণার যুগে এই শ্রেণীর নাটকের আত্মপ্রকাশ।

এই শ্রেণীর প্রথম নাটক-শারদোৎসব (১৯০৮)। শরৎ ঋতুর আনন্দাৎসবের মধ্য দিয়ে প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির অকৃপণ দানের ঋণশোধ করার কথা এ নাটকে আভাসিত।

বৌদ্ধ আখ্যান 'কুশজাতক' থেকে গৃহীত কাহিনীকে নবরূপ দান করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন নাটক 'রাজা' যা পরে (বঙ্গাব্দ ১৩২৬) 'অরূপরতন' নামে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত। গীতাঞ্জলির আলোকচারিতার যুগে রবীন্দ্রনাথের অরূপতত্ত্ববিষয়ক নাটক রাজার আত্মপ্রকাশ। রাজার মধ্যে দুটি তত্ত্ব—এক, অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত। দুই, দুর্গম পথ পেরিয়েই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া যায়।

'অচলায়তন' নাটকে প্রথাগত আচার সর্বস্বতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রমানসের প্রতিবাদ ধ্বনিত। মহাপঞ্চক যে অচলায়তন গড়ে তুলেছে সত্যবোধের আঘাতে তার প্রাচীর খসে পড়ে। আচারের মরুবালুরাশিতে ঢাকা পড়া অচলায়তনে গানের ঝর্ণাধারা ভেসে আসে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যধারার শ্রেষ্ঠতম ও জনপ্রিয়তম নাটক—ডাকঘর (১৯১২)। নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির সংকেত এ নাটকে দ্যোতিত। এখানে বালক অমলের আসন্ন মৃত্যুছায়ার প্রেক্ষিতে প্রতীক ও সংকেত আভাসের মাধ্যমে মানবাত্মার মুক্তির বাণী ঘোষিত। পার্থিব জীবন শত নিষেধের বেড়াজালে বন্দী করে রাখে মানবাত্মাকে, যার থেকে মুক্তি মেলে মৃত্যুতে। তাই ঈশ্বরের অমৃতবার্তা। এই অনুভবকে 'ডাকঘর' নাটকে রাজার চিঠির প্রতীকে বোঝানো হ'য়েছে। এ নাটকে অমলের ঘুমিয়ে পড়াকে অনেকে মৃত্যু বলতে চান। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার ইহজীবন অতিক্রম করে আলোকতীর্থে উত্তরণের সাংকেতিক কাহিনীই 'ডাকঘর' নাটক।

'বলাকা' কাব্যের যুগে 'ফাল্গুনী' রূপক নাটকের সৃষ্টি। কবি দেখাতে চান যে মানবজীবন ও প্রকৃতিতে গতিময়তাই প্রাণস্বরূপ। প্রাণশক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারবার নিজেকে নবরূপে আবিষ্কার করছে।

যান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্তির ইশারা ধ্বনিত হ'য়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। যুবরাজ অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভেঙে ফেলেছে, মুক্তধারাকে করেছে মুক্ত।

'রক্তকরবী' আর একটি বহু আলোচিত নাট্য নাম। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রচিত এই নাটকে পাশ্চাত্য যান্ত্রিকতা জড়বাদ ও বিজ্ঞানশক্তির অপপ্রয়োগ মানবজীবনে কেমন করে অকল্যাণ বয়ে আনে, রবীন্দ্রনাথ তাই দেখাতে চেয়েছেন।

এর প্রধান চরিত্র 'নন্দিনী' একটি প্রতীকী চরিত্র। তার ভূষণ রক্তকরবী, যা প্রাণের প্রতীক, তার মনের মানুষ-রঞ্জন, যে মনকে রাঙায়। এভাবেই যজ্ঞপুরীর প্রাচীরে কোন ফাঁকে আসে প্রাণের হাওয়া, কাঁপিয়ে দেয় মকররাজার যজ্ঞপুরীর জালকে। রক্তকরবী মুক্ত প্রাণের মুক্তির গান।

'কালের যাত্রা'র মধ্যে সংকলিত দুটি রচনা—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। 'রথের রশি' সম্পর্কে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—"আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের ম্যানিফেস্টা"। সমাজে উপেক্ষিত মানুষের অধিকার বঞ্চিত শূদ্রের উত্থান এ নাটকে দেখানো হ'য়েছে। এ নাটিকার পূর্ব নাম ছিল 'রথযাত্রা'। পরিবর্তিত 'রথের রশি' নামকরণে এরগ অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা অধিকতর দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসাংকেতিক নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বারবার এসেছে। এ প্রসঙ্গে ইয়েটস্, সিঞ্জ, মেটারলিংক হাউপ্ট ম্যানের নাম মনে পড়ে। এসব প্রভাব ও আত্মীকরণ অতিরিক্ত এক অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র তত্ত্ব নাটকে পাই যা তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভাবের প্রাধান্য, অনুভূতির গভীরতা তাঁকে নিয়ে গেছে অতীন্দ্রিয়

লোকে যা আভাসে, সংকেতে প্রকাশ করেছে জীবনের সত্য। তাঁর সাংকেতিক নাটক তাই মূলত ভাবের বাহন, তাদের আবেদন বোধের কাছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের ভিত্তিতে যে রবীন্দ্রমানসের অধিষ্ঠান তার প্রকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের চেয়ে স্বভাবতই ভিন্নতর। কিশোর কবির যে দীক্ষা হিমলায়ের কোলে উপনিষদের দর্শনের আলোয় উজ্জীবিত হয়েছিল— তাঁর সমগ্র জীবন ছিল তারই সাধনা। সেই অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিত প্রথম ধরা দিল ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'খেয়া' কাব্যে। কবি যেন রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে যাত্রা করলেন 'খেয়া' কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর মানসসংকট ও বেদনার অভিঘাতে কবি অন্তর্লোকে মগ্ন হলেন। তখন থেকেই শুরু হল মনে মনে অসীম অরূপলোকে মানসাভিসার। তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি'র কাল (১৯১০-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

'খেয়া' কাব্যে "ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা" বলে যাকে আবাহন করেন, 'গীতালি' কাব্যে তাঁকে উদ্দেশ করেই গানের মালা গাঁথেন রবীন্দ্রনাথ—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো-"

আবার এই ইন্দ্রিয়াতীত অন্তরতমকে অনুভব করেছেন 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালায়—

> "মানুষের একটি অন্তরতম ইন্দ্রিয় আছে। চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্য একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।"

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রাজার মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াতীত প্রাপ্তির কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

"আমার মনে হচ্ছে, যা পাবার জিনিস, তাকে হাতে পাবার জো নেই। যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা' ছুঁয়ে পাওয়া নয়"—এই অধরা মাধুরীর উপলব্ধিই সংকেতের মাধ্যমে প্রতিভাত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিক্রমার প্রকাশ সাংকেতিক নাট্যগুচ্ছে। সেই সময় থেকেই কবি খুঁজে ফিরেছেন রূপাতীত, সীমাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত এক সত্তাকে। রূপকে রূপান্তরে প্রকাশ করা রূপক নাট্যের বৈশিষ্ট্য, আর অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার প্রয়াস সংকেতের বৈশিষ্ট্য। বর্ণনায় অবর্ণনীয় এই ভাবই সাংকেতিকতার বৈশিষ্ট্য যা দৃশ্যত প্রতীকে আভাসিত হয়েও অধরা থেকেই যায়। এই সাংকেতিক রহস্যময়তার অতীন্দ্রিয় প্রকাশে তাঁর নাটকগুলি বিশিষ্ট ভাববাহী হ'য়ে উটেছে। তাঁর প্রথম তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"

—রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক সীমার সঙ্গে অসীমের সেই প্রেমমুক্তির গান।

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আছে—গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬), পরিত্রাণ (১৯২৯), তপতী (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও বাঁশরি (১৯৩৩)।

এর আগে চিরকুমার সভার অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে কবি তাঁর আরো কয়েকটি গল্প ও নাটককে নতুনভাবে নাট্যরূপ দিতে আগ্রহী হ'লেন। তারই ফলস্বরূপ দেখা গেল পূর্ব প্রকাশিত 'কর্মফল' নাটকের রূপান্তরিত নাট্যরূপ 'শোধবোধ' এবং 'শেষের রাত্রি' গল্পের নবনাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশ'।

'শোধবোধ' একটি সামাজিক নাটিকা। নগরনির্ভর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রায়ণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে ও তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংকটে কাহিনী পরিণতির দিকে পৌঁছে যায়। তবে এ নাটকে মহত্তর কোনো জীবনবোধ বা দার্শনিক তত্ত্বের অবরতারণা নেই, বরং নাগরিক জীবনের বাস্তব চিত্রকে উপযুক্ত সংলাপের সাহায্যে একটি মিলনান্ত কাহিনীতে পৌঁছে দেওয়া হ'য়েছে।

তুলনায় 'গৃহপ্রবেশ' নাট্যগুণ বর্জিত। গল্প হিসাবে 'শেষের রাত্রি'তে যে করুণ মাধুরী ছিল তার লীরিক গুঞ্জন ও বিষাদ বেদনা পাঠকের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এতে নাটকীয়তার অবকাশ কম। মৃত্যুপথযাত্রী বেদনাম্লান প্রেমবঞ্চিত যতীনের দুঃখের ভার যেন পাঠকচিত্তে পাষাণ ভার হ'য়ে থাকে। কেবল মাসীর অন্তর্লীন হাহাকার ও হিমির গানের সুর গীতি মূর্ছনায় নাট্য পরিবেশকে ঘিরে থাকে। ফলে দর্শক চিত্তে কোনো নাটকীয় আলোড়ন সাড়া জাগায় না। ছোটগল্পের করুণ মাধুরীই নাটকটিকে ঘিরে থাকে।

এই দু'টি নাট্যরচনার পর পুরোণো নাটকের নব নির্মিতিতে মন দেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৯২৯ সালে নবরূপে 'পরিত্রাণ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৯ সালে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকটিও 'তপতী' নাম নিয়ে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালেই। গল্পবস্তু অভিন্ন হলেও 'তপতী' 'রাজা ও রাণী'র থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা ও রাণীর গঠন শৈথিল্য, অকারণ শাখায়িত বিস্তারকে সংহত ও সংযত করে 'তপতী' রচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

> "অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।....এটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে এক অভিনয় যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম।"
>
> এই ইচ্ছা থেকেই নাটকটি আগাগোড়া পুনর্লিখিত হয়েছিল।

কালের যাত্রা (রথের রশি ও কবির দীক্ষা) নিয়ে আগেই আলোচনা হ'য়েছে তত্ত্বনাটক ধারায়। প্রায় সমকালে রচিত 'চণ্ডালিকা' (১৯৩০) নাটকেও একটি বিশেষ ভাব ও তত্ত্বকে কবি রূপ দিতে চেয়েছেন। মানবিকতার উষ্ম আলোকে রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার বিশিষ্ট বোধ এখানে সঞ্চারিত।

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় 'বাঁশরি' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নাগরিক চেতনাঋদ্ধ এই সামাজিক নাটক তার সংলাপ ও শাণিত বাক্যে মাঝে মাঝেই 'শেষের কবিতা' কে মনে করায়। তবে নাটক হিসাবে 'বাঁশরি' কিছুটা দুর্বল। পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক রহস্য জটিলতা অনেক সময়ই প্রত্যাশিত তীব্রতা লাভ করেনা, ফলে নাটকীয়তা তেমতন দানা বাঁধে না। তবে বাঁশরিতে যে প্রেমতত্ত্ব আরোপিত তা' অকেটাই 'শেষের কবি'র মুক্তি-বন্ধন তত্ত্বকে মনে করায়। নায়ক সোমশংকর বাঁশরিকে ভালোবেসেও বিয়ে করে সুষমাকে। কিন্তু বাঁশরির হৃদয়ে তার চির অধিষ্ঠান। প্রাত্যহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমকে অসীমে মুক্তিদানের তত্ত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

প্রচলিত রীতি আশ্রয়ী নাটক হিসাবে 'বাঁশরি'ই শেষতম বলা যেতে পারে। এর পর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা সবই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। এই নতুন বর্গ (Genre) বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। এই পর্যায়ে বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ থেকে ১৩৪৩ (ইং ১৯২৬-৩৬) পর্যন্ত বিস্তৃত দশবছরে লেখা হয়—

শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর, নটীর পূজা (১৯২৬), নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩০), শাপমোচন (১৯৩১), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৫) ও পরিশোধ (১৯৩৬)।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বলেছিলেন—"বাক্যের সৃষ্টির ওপর আমার সংশয় জন্মে গেছে"—তাই বাক্য রচনার প্রয়াস থামিয়ে মেতে উঠেছিলেন ছবি আঁকার বিমূর্ত শিল্পকলায়। নাটকেও তাই কেবল সংলাপ ব্যবহার না করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন গানের বন্যাধারায়। তিনি বলেছিলেন—"গান জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটা প্রধান উপাদান"। সত্যিই তাঁর এই অভিনব নাট্যপ্রয়াস গানের ঝরণাধারায় সঞ্চিত। আবার এদের মধ্যে অধিকাংশই ঋতুনাটক হওয়াতে গান সেখানে আলাদা ভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। শেষবর্ষণ, নাটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নবীন প্রভৃতি নাট্যে গান এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর 'নটরাজ' ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। নটরাজের নৃত্যরূপকে তিনি দেখেছেন মহাকালের বিরাট নৃত্যছন্দ হিসেবে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা যেন বিশ্ববীণার ছন্দে অবিরাম স্পন্দিত হ'য়ে চলেছে। তাঁর নিজের উক্তির মধ্যে দিয়েই এই প্রকৃতি তন্ময়তা সার্থক প্রকাশিত।

—"হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়" 'শাপমোচন' গদ্য ছন্দে রচিত কথিকা—বৌদ্ধ আখ্যায়িকা কুশজাতক থেকে সংগৃহীত। এই আখ্যানই 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকের উৎস। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের নৃত্যগীতময় নূতন রূপান্তর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য নাট্য। 'পরিশোধ' কথা ও কাহিনীর একটি কবিতার নাট্যরূপ, যা পরে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যরূপে প্রকাশিত।

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা—নটীর পূজা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির শ্রদ্ধার মধুর প্রকাশ এই নাট্য। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব দিনটিকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবর্ত সেখানে শ্রীমতীর তনুত্যাগ এর প্রধান বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নাট্যধারায় নবনব প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক্য, রোম্যান্টিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রূপকাশ্রয়ী, সাংকেতিক—বিভিন্ন বিষয় য়িে তাঁর নাট্য-কাহিনী রচিত। আবার কাব্য নাট্য ও গদ্য নাট্য দু'য়েরই শিল্পিত প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছি। দেখেছি প্রহসন বা কমেডি রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা, দেখেছি ট্র্যাজিক রস সংবেদনায় তাঁর নিবিড় চরিতার্থতা। এমন সামগ্রিক প্রয়াস সত্যই সুদুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুকোণিক হীরকখণ্ড সদৃশ প্রতিভার পক্ষেই এমন বিচিত্র ও সর্বত্র প্রসারী শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল।

২.৩ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২। "শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে রবীন্দ্রনাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাবের পরিচয় দিন।
৩। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে অন্তত একটি প্রহসনের পূর্ণ পরিচয় দিন।
৪। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাঁর এ জাতীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৫। রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধপ্রভাব ও প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৬। 'ডাকঘর গদ্যে লীরিক' এ বিষয়ে আলোচনা করুন।
৭। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
৮। 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
৯। সাংকেতিক নাটকে গানের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।
১০। রবীন্দ্রনাথকে 'রাজা' ও 'ঠাকুরদা' চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
২. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—অশোক সেন
৩. কালের মাত্রা ঃ রবীন্দ্রনাটক—শঙ্খ ঘোষ
৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ
৫. মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ—পুলিন দাস
৬. কবির অভিনয়—অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৯৬ (রবীন্দ্রভারতী)
৭. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ১৯৯৮-সুকুমার সেন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৩ □ রবীন্দ্র উপন্যাস

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)

৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)

৩.৫ নৌকাডুবি (১৯০৫)

৩.৬ গোরা (১৯১০)

৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)

৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)

৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)

৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)

৩.১১ দুইবোন (১৯৩০)

৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)

৩.১৩ চার অধ্যায় (১৯৩৪)

৩.১৪ অনুশীলনী

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সূচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমের স্থান ও মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার সূত্রপাত। সেই সময় ঐতিহাসিক ও সামাজিক—দুধরনের উপন্যাসরচনতেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান শীর্ষে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন। উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্রভেদী অবস্থান সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং প্রথম দুটি উপন্যাস রচনাকালে হয়তো আপন অগোচরেই বঙ্কিমপ্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসাবে করুণাকে মেনে নিলেও তাকে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুত্ব দিতে চাননি। তাই বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষিকেই (১৮৮৭) তাঁর প্রথম পর্বের যুগল উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হয়। ইতিহাস-আশ্রিত এই দুই উপন্যাসের মধ্যেই অলক্ষ্যে ছায়া ফেলে গেছে বঙ্কিমীপ্রভাব। ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত এই দুই উপন্যাসেই বঙ্কিমী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনুসৃত হ'য়েছে, যদিও তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবনা ও ভঙ্গির চকিত কিরণ চোখে পড়ে। তারই অনিবার্য ফসল রাজর্ষির

ষোলো বছর পরে লোখা 'চোখের বালি' উপন্যাস যার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা গেল এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা ঘটালো চিত্ত মুক্তি। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ধারায় উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন, বঙ্কিমী প্রভাবের নির্মোক ভেদ করে স্বকীয় স্বরূপ ও মহিমায় প্রোজ্জ্বল হলেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর তেরোটি (করুণা সহ) উপন্যাসের কালানুক্রমিক সূচি ঃ-

১। করুণা (১৮৭৭-৭৮)
২। বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)
৩। রাজর্ষি (১৮৮৭)
৪। চোখের বালি (১৯০২)
৫। নৌকাডুবি (১৯০৬)
৬। গোরা (১৯১০)
৭। চতুরঙ্গ (১৯১৬)
৮। ঘরে বাইরে (১৯১৬)
৯। যোগাযোগ (১৯২৯)
১০। শেষের কবিতা (১৯২৯)
১১। দুই বোন (১৯৩৩)
১২। মালঞ্চ (১৯৩৩)
১৩। চার অধ্যায় (১৯৩৪)

এই তালিকায় দৃষ্টি দিলে এটা স্পষ্ট হ'বে যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মাঝেমাঝেই সাময়িক বিরতি দিয়েছেন। অথচ কাব্য, কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ রচনায় একটি ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় ছিল।

রাজর্ষির ১৬ বছর পরে 'চোখের বালির' প্রকাশ। এই দীর্ঘ সময় সম্ভবত ছিল তাঁর মানস প্রস্তুতির কাল বঙ্কিমী ধারা থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আপন পথে খুঁজে নিতে তিনি এই সময়টুকু নিয়েছিলেন। তাই রাজর্ষির পর 'চোখের বালি' এক নতুন ধারার সৃষ্টি—রবীন্দ্র সৃষ্টিতে এবং বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও। রোমান্স ধর্মী, ইতহাসাশ্রয়ী কাহিনীর ছত্রছায়া থেকে সমাজবাস্তবতার কঠিন পথে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পরিক্রমা শুরু হলো, বাংলাসাহিত্যও আধুনিক উপন্যাসের ধারার সঙ্গে পরিচিত হলো। উপন্যাসের চলার পথে আবারও সাময়িক বিরতি এসেছিল একই বছরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' রচনার পর। ১৯১৬-তে যুগল উপন্যাস প্রকাশ হবার পর দীর্ঘ বিরতির পর আবার ১৩ বছরের নীরবতার শেষে ১৯২৯-তে প্রকাশিত' হল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'। শেষ উপন্যাস 'চারঅধ্যায়' প্রকাশ পেলো ১৯৩৪-এ। এবং এখানেই থামলো রবীন্দ্রউপন্যাসের যাত্রা। আশ্চর্য এই যে ১৯৪১-এ মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত তাঁর কবিতা রচনার ধারা ছিল অব্যাহত। প্রবন্ধও রচিত হ'য়েছিল ১৯৪১-তে। দীর্ঘ গল্প হিসাবে তিনসঙ্গীর তিনটি বিখ্যাত গল্প শেষ বছরেই রচিত হ'য়েছিল, কিন্তু উপন্যস রচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণযতি টেনে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ১৫ বছর বয়সে। শেষ প্রবন্ধ লিখেছেন আশি বছরেও। কবিতা তো তাঁর 'চিরকালের প্রেয়সী'—শৈশব থেকে অস্তমিত যৌবন বেলা পেরিয়ে প্রাহ্ন প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যেও ছিল তাঁর নবীন কাব্য-সৃষ্টির আন্তর প্রেরণা, কিন্তু দীর্ঘ মাপের উপন্যাস রচনায় তিনি শেষপর্যন্ত কোনো আগ্রহ বোধ করেননি, যদিও বাংলা উপন্যাসকে আধুনিক যুগচেতনার সিঞ্চিত করে তিনিই প্রথম তাকে যুগোপযোগী মনস্তাত্বিক করায় সার্থক হ'য়েছিলেন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর প্রযুক্ত এই রীতি ছিল সরাসরি, কিংবা নাটকীয় রীতির সঙ্গে যুক্ত। কখনো বা অলৌকিকতার সাহায্যেও এগিয়েছেন, ফলে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ অনেকাংশেই সরলীকৃত হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি ছিল অন্যতর। বিশিষ্ট সমালোচক ড. ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি থেকে প্রত্যক্ষ অ্যানলিটিক রীতির পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল ঘটনার সুর চড়াননি, বাইরে উত্তেজনাকে তীব্র করে তোলেন নি। প্রতিদিনের ছোটখাট ঘটনার একেবারে মামুলি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে চিত্তলোকের বৃহৎ আলোড়ন ও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।"

ফলে বঙ্কিমের উপন্যাস যেখানে অনেকটাই নাটকের মত চমকপ্রদ ও উত্তেজক—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সেখানে অনুগ্র, অনাটকীয় এবং নাট্য আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাধীন রীতির। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাংলার সামাজিক যে বিবর্তন ঘটেছিল, তা-ই তাঁদের রচনার রীতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে—উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্রনাথের মনোদর্পণে যথার্থ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় সমারোহের অবসান ঘটলো এবং প্রাত্যহিক জীবনের সমাজ বাস্তবতা উপন্যাসে নিজস্ব জায়গা খুঁজে পেলো। ফলে বঙ্কিমযুগের রোমান্স অনেকটাই স্তিমিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হ'ল। রবীন্দ্র মানস রোম্যান্টিক হ'য়েও একান্তভাবেই অন্তর্মুখী, ফলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে তীব্র গভীর হ'য়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বাস্তব ও বিশ্বাস্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা, বিরোধ-মিলন, কর্মপ্রবাহ একান্ত বাস্তবনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্র উপন্যাসে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ উপন্যাসেই তৎকালীন পরিবার জীবনের ছবি আছে। আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনও সেখানে অনিবার্য ছায়া ফেলে গেছে। তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দেশের রাজনীতি প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং তার প্রকাশ তাঁর উপন্যাসগুলিতে অনেক সময়ই দেখা গেছে। তবে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা প্রায়ই প্রথাসিদ্ধ পথে না গিয়ে নিজস্ব এক রূপ নিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ 'বউঠাকুরানীর হাট' বা 'রাজর্ষি'র মত প্রথম যুগের উপন্যাস ছাড়াও পরবর্তী 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' বা 'চারঅধ্যায়ে' তাঁর নিজস্ব প্রত্যয়দীপ্ত জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের মতে তাঁর উপন্যাসকেও অনেকে তত্ত্বের বাহক বলতে চান। একথা সত্য যে তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে, হয়তো কিছুটা সচেতনভাবেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর উপন্যাসে জীবনের রহস্যজটিল গভীরতা ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয়ই প্রকাশিত। বাংলা উপন্যাসে যথার্থ আধুনিকতা, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই প্রথম এলো। শরৎচন্দ্রের উক্তিতে এর পরিচয় মিলবে।

> "তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়—নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"

করুণা ঃ (১৮৭৭-৭৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা'। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ছোট আকারের এই উপন্যসটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চাননি বলেই এটি রচনাবলীতে গ্রন্থিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের

লেখা প্রথম উপন্যাস বলেই সাহিত্যের ইতিহাসে এর আলোচনা হয়ে থাকে—না হলে এর কোনো মূল্য নেই। কাহিনীর সূত্রে অবশ্য ক্ষীণভাবে 'চোখের বালি'-র কথা মনে আসে। একারণে অনেকে বলেন 'করুণা'-র মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল 'চোখের বালি'-র বীজ যা পঁচিশ বছর পরে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মহেন্দ্র দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমবাসনার জটিলতায় আকৃষ্ট হয়েছে বিধবা মোহিনীর প্রতি—কাহিনীর এই অংশটুকু 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-বিনোদিনীর কথা মনে পড়ায়। কিন্তু 'চোখের বালির' পরিণতমনস্ক ভাবনা ও মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ কিছুই এই অপরিণত রচনায় প্রকাশ পায়নি। বরং 'করুণা'র কাহিনী ও চরিত্র বয়নে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

'বউঠাকুরাণীর হাট'-কেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেকালের বারভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে এই কাহিনীর বিস্তার। স্বভাবতই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এখানে আছে। ১৮৬৯-তে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকেই 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের উৎস বলে মনে হয়। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে ধারা প্রবহমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে সেই ধারারই সংযোজন। তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে স্বাধীনতা স্থাপনে আগ্রহী প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্তার চেয়ে প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর রূপে পরিচয়ই তাঁর রচনায় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> "আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম
> তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে
> উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না"

ইতিহাসের এই তথ্যকে গুরত্ব দিয়েছিলেন বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের প্রচলিত দেশাভিমানী সত্তাকে উজ্জ্বল করে দেখাননি।

এ উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক দিল্লীর বাদশাহের বিরোধিতা, পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা, জামাই রামচন্দ্রকে হত্যার পরিকল্পনা ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা। অন্যদিকে বউঠাকুরানী বিভা, উদয়াদিত্য, সুরমা ইত্যাদি চরিত্র ও কাহিনী লেখকের কল্পনাসঞ্জাত। সর্বোপরি প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের বিরোধের মধ্যে প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের মধ্যে সংসার সীমায় আবদ্ধ এক পারিবারিক কাহিনী চিত্রণই ঘটেছে। সাধারণ বাঙালি জীবনের অন্দরমহলের রূপটি এখানে প্রকট। শাশুড়ীর বধূ নির্যাতন থেকে ভাইবোনে প্রীতি, ননদ-বৌদিতে মধুর সম্পর্ক, দাসীদের ষড়যন্ত্র সবই পরিচিত ছকের ছবি। সেইসঙ্গে উদয়-বিভার দাদামশাই বসন্ত রায়ের স্নেহ-মধুর রসিক ভূমিকাটিও উপভোগ্য। পাশাপাশি প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে পুত্র উদয়াদিত্য ও জামাই রামচন্দ্রের বিরোধ ঘনিয়ে তুলেছে পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ। শ্বশুর-জামাইয়ের বিরোধের মধ্যে দুই জমিদার বংশের মর্যাদার লড়াই পারিবারিক সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক স্তরে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে প্রতাপাদিত্যর দিল্লীর বাদশাহের প্রতি আক্রোশ ও বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক আন্দোলনের চেহারা নেয়। ফলে সাধারণ পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে উপন্যাসটি ইতিহাসের আশ্রয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। তবে আন্তরধর্মে রচনাটিকে সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস বলাই সঙ্গত।

বাঙ্গালি পারিবারিক ছবিটি এখানে পুরোপুরি উপস্থিত। শাশুড়ির পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষা, পুত্রবধূর পিত্রালয়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকে শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধু সুরমার উপর ক্রোধ বাঙালি পরিবারের পরিচিত চিত্র। বাড়িতে দীর্ঘদিন পর জামাই আসার আনন্দ উৎসবের ছবিটিও স্বাভাবিক।

পাশাপাশি বঙ্কিমী রোম্যানস রচনার সূত্রে কাহিনীতে এসেছে রুক্মিনী-মঙ্গলার প্রসঙ্গ, যেটি পাঠককে মনে পড়ায় বিষবৃক্ষর হীরা-কাহিনী। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা হীরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু কামনা করেছিল, এখানে উদয়াদিত্যের কাছে প্রত্যাখ্যাত প্রতিহিংসাপরায়ণা রুক্মিনী সুরমার মৃত্যু ঘটিয়েছে। উদয়-রুক্মিনীর প্রথম যৌবনের ক্ষণিক সম্পর্ক উপন্যাসে আভাসিত, কিন্তু তারই জন্য সুরমাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রথম যৌবনের কামনাদগ্ধ অপরাধে অনুতপ্ত উদয়াদিত্যের কাছে সুরমার মৃত্যু প্রবল আঘাত। কিন্তু উদয়াদিত্য চরিত্র হিসাবে অনেকটাই নিষ্প্রাণ। তাই স্ত্রীর প্রতি প্রেমে নিষ্ঠ অবিচল থেকেও সে নিজের মার বধু নির্যাতনের কোনো তীব্র প্রতিবাদ করেনি। লেখক অবশ্য তার চরিত্রে অন্যভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। বিভার স্বামী রামচন্দ্র এবং দাদামশাই বসন্ত রায়কে পিতার ক্রোধের কোপ থেকে বাঁচাতে সে চেষ্টা করেছে। দরিদ্র প্রজাদের হিতসাধন কার্যে পিতার বিরাগ ভাজন হয়েছে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে তাঁর মুক্তিতত্ত্বের বাহন করে নির্লিপ্ত রাজ্যত্যাগী করে দেখিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের উগ্র ভোগবিলাসী নিষ্ঠুর বিবেকহীন প্রজাপীড়ক চরিত্রের পাশে পুত্র উদয়ের বীর প্রশান্ত চরিত্র যেন বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্যই রচিত। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব হিসাবে পিতাপুত্রের এই বিরোধকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বসন্ত রায় চরিত্রটি রবীন্দ্রভাবনার বাণীমূর্তি। তার মধ্যে কবিত্ব, সঙ্গীত ও সহজ সারল্য রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পিত 'ঠাকুরদা' চরিত্রকে মনে করায়।

প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার নামেই 'বউঠাকুরাণীর হাট' নামাঙ্কিত। কিন্তু উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে প্রত্যাশিত গুরুত্ব তার চরিত্রে নেই। সব মিলিয়ে কোমল স্বপ্নমধুর এক চরিত্র যা শেষ পর্যন্ত স্বামী প্রেমবঞ্চিত বেদনায় এক ত্যাগব্রতী মহিমা লাভ করেছে।

উপন্যাসটিতে অবশ্য রোম্যান্সধর্মিতার জন্যই মাঝে মাঝেই নাট্যরস প্রযুক্ত। বিষপ্রয়োগ, কারাদণ্ড, প্রাণনাশ গুপ্তহত্যা, অগ্নিসংযোগ—ঘটনার ঘনঘটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে রোম্যান্স রস সৃষ্টি করেছে।

৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)

এটিও ইতিহাসশ্রিত উপন্যাস এবং বঙ্কিমী পরিমণ্ডলের ছত্রছায়ায় লিখিত, যদিও এর মধ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতির আভাস মেলে। এ উপন্যাসেও তাঁর বিশিষ্ট তত্ত্বভাবনা রূপায়িত, তাকে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই গ্রন্থ রচনায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'ত্রিপুরার ইতিহাস' এবং 'স্টুয়ার্ট কৃত বাংলার ইতিহাস' থেকে উপাদান সংগ্রহের কথা বলেছেন। উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজপরিবার, মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার উপপ্রসঙ্গ ইতিহাসের অনুমোদনপুষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু আসলে, 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের প্রেমপ্রীতিপূর্ণ মঙ্গল ভাবনারই আদশায়িত প্রকাশ। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের মধ্য দিয় আপন আদর্শবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করত চেয়েছেন।

ধর্মসম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট প্রত্যয় গোবিন্দমাণিক্যের মধ্য দিয়ে আভাসিত। ইতিহাসে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য ধর্মপ্রাণ হিন্দুনৃপতি বলে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্রে মানবিক প্রেমধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দেবী মন্দিরে জীব বলিদান প্রথা বন্ধ করার জন্য রাজার ঘোষণার মধ্য দিয়ে অহিংস ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রমননে বৌদ্ধধর্মের প্রেম মৈত্রী অহিংসার প্রতি যে সশ্রদ্ধ অনুরক্তি ছিল, তার প্রকাশ তাঁর নানা রচনায় প্রতিবিম্বিত। রাজর্ষি-তেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। এই ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে ধর্মাদর্শের বিরোধকে কেন্দ্র করে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজ পুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের সংঘাতই এই মূল বিষয়। এটি আরো সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গাব্দ ১২৯৬-এ রচিত 'বিসর্জন' নাটকে। রাজর্ষি উপন্যাসে ধর্মাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা। মুঘল বাদশাজাদা সুজার কাহিনী পুষ্ট করেছে এর ইতিহাস অংশকে, সুজার প্রসঙ্গে ইতিহাসের হাত ধরে কিছু রোম্যান্সধর্মী কল্পনাও এসেছে, তবে ইতিহাসের আনুগত্যও স্বীকার করতে হয়।

বিদেশী সৈন্যের আক্রমণে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ করে নির্বসনে যাত্রার অংশও ইতিহাস সমর্থিত। তবে সেখানে তাঁর ভীরুতাকেই দেখানো হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিরাসক্তি ও আদর্শবাদ বলে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রমননে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগের কথা সবিদিত। সেই আদর্শ বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র রচনায় সেই শান্ত, সমাহিত, অহিংস, স্থিতপ্রজ্ঞ, সর্বত্যাগী আদর্শকে তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর গোবিন্দমাণিক্য রাজা থেকে 'রাজর্ষি' হয়ে উঠেছেন। রাজারর শক্তিসত্তা ও অধিকারবোধের চেয়ে তাঁর হাসি-তাতা-কেন্দ্রিক বাৎসল্য, নক্ষত্রের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম ও রাজ্যত্যাগের মহিমাই উপন্যাসে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পাঠশালা স্থাপন ও পরিবর্তিত হৃদয় রঘুপতির সেই কার্যে যোগদানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহতী ভাবাদর্শকে জয়ী করেছেন। প্রতাপের চেয়ে প্রেমের শক্তি বেশি—এই মানবিক বোধ উপন্যাসটিতে সঞ্চারিত।

প্রতিনায়ক রঘুপতি লেখকের সৃষ্টিকুলশলতার নিদর্শন। এই চরিত্রটিকে বৃত্তাকার চরিত্র বলা যায়, যার মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন আছে। গোবিন্দমাণিক্য আদর্শে অবিচল ধ্রুব চরিত্র। রঘুপতি কিন্তু প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, উগ্র ধর্মান্ধতায়, প্রতিহিংসায় ক্ষতবিক্ষত এক চরিত্র। রাজার প্রতি তার বিরূপ ক্রোধোন্মত্ততার পাশাপাশি পালিত পুত্র জয়সিংহের প্রতি আন্তরিক স্নেহ তার চরিত্রে এক আলাদা মাত্রা এনেছে। সেইসঙ্গে দেবীমন্দিরে ধর্মাচরণে তার অদিকারবোধ ও ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র ধর্মান্ধতা। পুরোহিত তন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার সংঘাত অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নিপুণতার চিত্রিত হয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্যর সৎ বিবেকী মানবতাবাদী আদর্শায়িত চরিত্রের বিপরীতে রঘুপতির উগ্র ধর্মান্ধ ষড়যন্ত্রপ্রবণ চরিত্র উপস্থাপিত। এমনকি পুরোহিত ধর্মাশ্রয়ী রঘুপতির ধর্মবিশ্বাসও সেই অর্থে হৃদয়ের বস্তু নয়। তাই অধিকার রক্ষার জন্য সে মিথ্যাচারণ করেছে, রাজা ও ধ্রুবকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা করেছে, স্বভাবদুর্বল রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজ্যলোভ দেখিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। এর কোনোটিই রাজপুরোহিতের আদর্শ ধর্মবোধের পরিচয়বাহী নয়। তার চরিত্রের সদর্থক দিক—জয়সিংহের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহ বাৎসল্য। তবু, জয়সিংহের আত্মদানেও তার চরিত্রে পরিবর্তন আসেনি—এসেছে অনেক পরে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে জয়সিংহের মৃত্যুতে যে ট্র্যাজিক রূপান্তর রঘুপতি চরিত্রে প্রত্যাশিত ছিল—তা এসেছে চল্লিশ অধ্যায়ে। সম্ভবত পত্রিকার চাহিদানুযায়ী এই দীর্ঘ বিস্তার সম্ভব হয়েছে। কারণ একই বিষয়াশ্রয়ী 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুতেই নাটক শেষ হয়েছে এবং রঘুপতি চরিত্রে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর ও ট্যাজিক পরিণতি। এই উপন্যাসে কিছুটা চেষ্টাকৃত ভাবে রঘুপতির গোবিন্দমাণিক্যের কাছে মঙ্গলবোধে আশ্রয় নেবার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

জয়সিংহ একটি সুপরিকল্পিত চরিত্র। নাটক 'বিসর্জন'-এ তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবু 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও তার ট্র্যাজিক পরিণতি বেদনাদায়ক। পিতৃসম রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা কিন্তু রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তিকে টলাতে পারেনি। গোবিন্দমাণিক্য তার জীবনে ধ্রুব আদর্শ। তাই রাজহত্যার চক্রান্ত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তার অন্তরের সংকটে দ্বিধাজর্জর জয়সিংহ আত্মহনন ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়নি। 'বিসর্জন' নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এই চরিত্রের আত্মিক অবক্ষয়ের দ্বন্দ্বজটিল মানসিকতা সম্পূর্ণ প্রকাশিত নয়। তবে এই চরিত্রকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রমনোধর্মে এই সহজ প্রাণের সৌন্দর্য, আবেগ ও কোমলবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। তাই সমালোচক ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

> "রঘুপতি, নক্ষত্র রায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমলহৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার মুক্ত উদার জীবনপ্রবাহই রবীন্দ্র কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে"

নক্ষত্র চরিত্রসৃষ্টি হিসেবে সফল। ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল স্বভাবের নক্ষত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্বসঙ্কুল আবর্তে সংকটাপন্ন। দুই ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে তার ভীরুতা অধিকতর প্রকটিত। রাজা হবার লোভে সে রঘুপতির চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে আবার দাদা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তার অন্তর্লীন শ্রদ্ধাবশত মন থেকে তাকে পুরোপুরি মানতে পারেনি। কিন্তু সে মানুষ হিসেবে অতি বাস্তব ও সাধারণ। তাই রাজা হবার পর তার চরিত্রে এলো পরিবর্তন এমনকি রঘুপতির কর্তৃত্বকেও সে অস্বীকার করলো।

বিল্বন চরিত্রটিও আদর্শবাদের প্রতীক। তবে রবীন্দ্রনাথ তাকে সক্রিয় দেখিয়েছেন, তাই সে রাজাকে বলেছে প্রয়োজনে বিদ্রোহী নক্ষত্রকে বধ করতে। বিপন্ন রাজ্য বাঁচাতে সে সৈন্য সংগ্রহ করেছে। তার চরিত্রে সেবাধর্ম মানবিকবোধে উজ্জ্বল, কিন্তু সে গোবিন্দমাণিক্যের মত প্রতীকিত আদর্শবাদ নয়—তার চরিত্রে প্রতিবাদ আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের শক্তিও আছে। হাসি ও তাতা—দুটি শিশুচরিত্র উপন্যাসে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে। যে অহিংস আদর্শবাদ ছিল ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য তাকে স্বপ্নে দেখা কাহিনীর আদলে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথ হাসি ও তাতাকে উপস্থাপিত করেছেন।

> "স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়। কী বেদনা। বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন!"

এই স্বপ্নকে কাজে লাগালেন রবীন্দ্রনাথ—ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির বিরোধের অদৃশ্য হাতিয়ার হয়ে উঠে এলো বলিদান প্রথা বন্ধের আদেশ। স্বপ্নে দেখা বালিকা হাসি ও তার ভাই তাতা—উপন্যাসে দেখা দিল রাজার স্নেহবাৎসল্য ও আদর্শের প্রতীক রূপে।

উপন্যাসটি আয়তনে বিশাল। মোট চুয়াল্লিশটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিন্যস্ত কাহিনী অকারণেই দীর্ঘায়িত। 'বিসর্জন' রচনার সময় এই বহুশাখায়িত ব্যাপ্তি কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সংহত রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে নাটক মূলত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার স্ফুরণ, কিন্তু উপন্যাসে একটি ক্রমাভিব্যক্ত ধারাবাহিকতা থাকে। ফলে 'রাজর্ষি' সেই দৈর্ঘ লাভ করেছে এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করায় কাহিনী এক বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছে। তবে ইতিহাস নয় আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠাই এই উপন্যাসের লক্ষ্য।

৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'চোখের বালি' এক স্মরণীয় ও বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে এই আধুনিক উপন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণ সহজ হবে।

> "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধইত হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তার আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার পথ উন্মুক্ত করে দিল। নর-নারীর প্রেম-অপ্রেম, বাসনা-বিভ্রম, চিত্তের দহন ও দীপ্তির যে জটিল দুরধিগম্য রূপায়ণ চোখের বালিতে ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ অপরিচিত ও অভাবনীয় ছিল। নৈতিকতার প্রশ্নে উত্তাল নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বাস্তব করে তুলেছেন। চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আরোপও এমনভাবে প্রথম দেখা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ছিল। 'চন্দ্রশেখরের' শৈবলিনী ও 'রজনীর' লবঙ্গলতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোরহস্য নিঃসন্দেহে বঙ্কিম দেখিয়েছিলেন। 'বিষবৃক্ষের হীরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'

রোহিনী ও ভ্রমর—সকলেই জীবনানুরাগ ও বিষামৃত জ্বালার শিকার। তবু বিনোদিনী এদের সকলকে অতিক্রম করে গেছে, সে আদ্যন্ত আধুনিক নারী। একবিংশ শতকেও এই নারী বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যজটিল প্রেমানুভবের নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই এ উপন্যাসের অন্দরমহলকে স্পষ্ট আলোকিত করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন চোখের বালিতে তিনি প্রবেশ করেছেন—

> "মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।....যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে"

মানবপ্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা চোখের বালিতেই প্রথম এমন আবরণহীন বাস্তবতায় দেখা দিল। বঙ্কিমী রোম্যান্সের আড়াল ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথের নর-নারী প্রত্যক্ষ বাস্তবমূর্তিকে উপস্থিত হল।

বাংলা উপন্যাসের ঘটনা নির্ভর কাঠামোর পরিবর্তে চরিত্র নির্ভর কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটলো এই উপন্যাসে। শুধু তাই নয় চরিত্রের রহস্য জটিল অন্তর্লোক উদঘাটিত হল নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র নগ্নরূপ সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হল। প্রকৃত অর্থেই বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠলো আধুনিক ও প্রাপ্তবয়স্ক।

এর প্রধান চরিত্র নায়িকা বিনোদিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমস্যার কেন্দ্রে ছিল পুরুষ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ নারীকে আনলেন সমস্যার কেন্দ্রে। ফলে 'চোখের বালিতে' মহেন্দ্রর চেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠলো বিনোদিনী। এবং নারীর সমস্যা বলেই তা হল জটিলতর। বিধবা নারীর মনোজগতের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে হলো বিনোদীনী চরিত্রে, বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যথাক্রমে কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীকে এনেছিলেন—বিধবার হৃদয়গত জটিল সমস্যা সেখানেও ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রদীপ্তিতে আলাদা জাতের। তাঁর আত্ম আবিষ্কার আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতি। নরনারীর হৃদয়ঘটিত সমস্যা এখানে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে এবং চতুষ্কোণ প্রেম জটিলতা কাহিনীতে এনেছে অন্যমাত্রা। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় ও মোহপাশের পাশাপাশি এসেছে আশা ও বিহারী চরিত্র। চারটি চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র লীলা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, প্রেম, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, ঈর্ষা আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে।

বিবাহিত মহেন্দ্রর সুখী দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজাকারে প্রকাশ ঘটে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষীর ঈর্ষায়। সেই বীজ ধীরে ধীরে মহীরুহ-তে পরিণত হয় সংসারে বিধবা বিনোদিনীর আগমনে। বহ্নিময়ী বিনোদিনীর কামনাবহ্নিতে আকৃষ্ট পতঙ্গ মহেন্দ্রর সংরাগ রক্তিম বিহ্বলতায় সুখের সংসার হয়ে ওঠে উত্তাল অশান্ত। পুত্রবধু আশার প্রতি বিরূপ জননী রাজলক্ষী সেই অনলে ইন্ধন জোগায়। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের মন্তব্য আমাদের ধারণাকেই অনুমোদন করে।

"'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা" কামনা ও ঈর্ষার অনলে জ্বলে ওঠা সংসারের ছবিটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধবা বিনোদিনী তার প্রতিকূল ভাগ্যের বঞ্চনাকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাতেই নিরপরাধ আশাকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে মহেন্দ্র বিজয়ের খেলাতে মত্ত হয়। আশা তার সখী—তার 'চোখের বালি'। দুই সখীর এই পাতানো নামকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতায় কাহিনীর নামকরণে ব্যবহার করেছেন। শেষপর্যন্ত দেখা যায় প্রধান চারটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে একে অপরের চোখের বালি।

মহেন্দ্রর বন্ধু বিহারী এ কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র যাকে ঘিরে উপন্যাসের চতুর্ভুজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মহেন্দ্রর অসংযমী, অস্থিরচিত্ততার পাশাপাশি বিহারী শান্ত-সমাহিত আদর্শায়িত চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর তত্ত্বাদর্শকে প্রকাশ করেছেন। আশার সঙ্গে বিহারীর বিবাহ স্থির হবার পর মহেন্দ্রর জেদের প্রাবল্যে তা ভেঙে যায়—স্বয়ং মহেন্দ্র আশাকে বিয়ে করে। দুই বন্ধুর অন্তর্বিরোধ সম্ভবত তখনই শুরু হয়েছিল, তবে লেখক কখনো সে বিষয়ে সোচ্চার হননি। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে এ ঘটনা কোনো সমস্যাও সৃষ্টি করেনি। যদিও বিহারীর অন্তরে আশা সম্বন্ধে এক কোমল অনুভূতি ছিল অন্তর্লীন, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যা প্রকাশ পেয়েছে। বিহারী

চরিত্রের সদর্থক ভূমিকা উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রর দাম্পত্য জটিলতাকেও বিহারী সরল করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে সে বিনোদিনীর প্রতি বিরূপ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেই বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। এই আকর্ষণের প্রকৃতি মহেন্দ্রর কামনা থেকে অন্যতর। বিনোদিনী শেষপর্যন্ত বিহারীর মধ্যেই খুঁজে পায় প্রকৃত প্রেমকে। আসলে মহেন্দ্র ছিল তার আতপ্ত প্রেমের বহিরঙ্গ কামনা। কিন্তু বিহারী তার অন্তরঙ্গ প্রেমানুভবের প্রেরণা। কামনার অগ্নিতে দগ্ধ বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিহারী আপন অন্তরের সত্য উপলব্ধি করেও বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রত্যাখানে বিনোদিনীর প্রেম আরো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্র পরিক্রমায় কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ দেখিয়েছেন। মহেন্দ্রকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার পিছনে ছিল তার প্রতিহিংসার মনোভাব। মহেন্দ্র যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আশাকে বিয়ে করেছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই তার এই ধ্বংসলীলা। আশার প্রতি তীব্র ঈর্ষায় সে তার সংসারকে দগ্ধ করতে চেয়েছে এবং মহেন্দ্রকে অতি সহজেই তার কামনা-রক্তিম প্রবৃত্তির দাস করতে পেরেছে। মহেন্দ্র আশার নষ্টনীড়ের ছবি দেখে আশ্বস্ত, তৃপ্ত বিনোদিনী এবার তাকিয়ে দেখলো নিজের অন্তরে—সেখানে বিহারী অধিষ্ঠিত পূজামূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ কামনা তাড়িত বিনোদিনকে উত্তীর্ণ করলেন প্রেমের তপস্যায়। তাই বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণ অন্তরে সে ছেড়ে গেল বিহারীকে। বিহারীকে চাওয়া তার কাছে যতখানি সত্য ছিল, তাকে ছেড়ে যাওয়াও ততখানি সত্য হয়ে তার অন্তরকে উদ্ভাসিত করলো।

বিনোদিনীর ভাষায় 'ননীর পুতুল' আশা লেখকের মমতা দিয়ে সৃষ্টি। উপন্যাসের শুরুতে যে সরল অনভিজ্ঞ কিশোরী বধূকে দেখি, কাহিনীর পরিণতিতে সে দুঃখ দহনের তাপে ও সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণা এক নারী রূপে বিকশিত। তার সারল্যের সুযোগে বিনোদিনী সুকৌশলে তার স্বামীকে মোহমুগ্ধ করেছে, সংসারে তীব্র অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছে। তার শাশুড়ীও তার দাম্পত্যসুখে মনস্তাত্ত্বিক ঈর্ষা ভোগ করে তারই ওপর নিষ্ঠুর হয়েছেন এবং একদা পত্নী প্রেমে উন্মত্ত তার স্বামী মহেন্দ্র শেষপর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে বিনোদিনীকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছে। তার মাসি অন্নপূর্ণা ও বিহারীর কাছে সে সান্ত্বনা ও সমবেদনা লাভ করেছে। স্বামীর অনাদর ও প্রেমের লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এই বালিকা বধূ কখন যে ধীরে ধীরে পরিণতমনস্কতায় পৌঁছে গেছে তার বিশ্লেষণ লেখক করেননি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে অবিচলিত ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে সে যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। বিহারী এবং মহেন্দ্রও তার এই পরিণত মানসিকতা লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে।

উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর কাশী গমন এবং মহেন্দ্র আশার পুনর্মিলন সূচিত হয়েছে। আপাত মিলনান্ত এই কাহিনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিক সুর পাঠকের মনে থেকে যায়।

'নষ্টনীড়' গল্পকে রবীন্দ্রনাথ নির্মম সাহিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'চোখের বালি'ও সেই পর্যায়ই পড়ে। লেখক বর্ণিত 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র প্রতিফলন এখানে পাই। চোখের বালি ৫৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত দীর্ঘ উপন্যাস। এর গঠন কৌশল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের উপযুক্ত। দীর্ঘ পরিসরে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত এসেছে, কিন্তু লেখক সুকৌশলে নাটকীয়তা পরিহার করে সহজ সরল বর্ণনায় সেই মুহূর্তের চমককে অপ্রকাশ রেখেছেন। বিধবা বিনোদিনীর প্রেমবঞ্চিত হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার বিস্ফোরণকেও রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে উপন্যাসের অবয়বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার অবরুদ্ধ কামনার তৃষাগ্নিতে মহেন্দ্র গন্ধ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে তাদের দাম্পত্যনীড়, কিন্তু সেই কামনার আগুন থেকে প্রেমের দহনে পরিশুদ্ধ বিনোদিনী শেষপর্যন্ত আলোর সন্ধান পেয়েছে। বিহারীর প্রেমে নিজেকে আবিষ্কার করে সে দহন থেকে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রের অভিব্যক্তি সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিবিম্ভব। তাকে আমাদের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্য দিয়েই নারীব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন দেখা গেল। সমগ্র উপন্যাসের বয়ন ও নির্মাণে এই আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। একারণেই ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

"কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত দর্ম ও প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'।"

৩.৫ নৌকাডুবি

চোখের বালির পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরবর্তী রচনা 'গোরা'। দুটি প্রধান উপন্যাস রচনার মধ্যবর্তী সময়টুকু যেন রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিশ্রাম নিয়েছেন মনে হয়। চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাজটিল আধুনিক রূপায়ণের পরবর্তী প্রয়াস হিসাবে 'নৌকাডুবি'-কে অত্যন্ত লঘু ও সরলীকৃত বলে মনে হয়। চোখের বালিতে যে অন্তর্মুখী দৃষ্টি, দুঃসাহসিক বিশ্লেষণ দেখেছি, 'নৌকাডুবি'তে তার চিহ্নমাত্র নেই। এর উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এসব কথা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদে।.....প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তাছাড়া বলব কী?"

এই কৈফিয়ৎ থেকে বোঝা যায় নৌকাডুবি রচনার জন্য লেখকের অন্তরের কোনো তাগিদ ছিল না। ফলে 'চোখের বালির' আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পর এ কাহিনীতে ফিরে এলো রোম্যান্স প্রবণ কল্পনা দৃষ্টি। যেজন্য মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশা চতুরঙ্গের জটিল ছক এখানে রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষ-হেমনলিনী চতুর্ভুজের সাদামাটা সমন্বয়ে পর্যবসিত। শুধু তাই নয় বঙ্কিমী পর্বের যে ঘটনা বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ পিছনে ফেলে এসেছিলেন নৌকাডুবিতে তাকেই ফিরিয়ে আনলেন, যেজন্য উপন্যাসের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ালো চরিত্র নয়—নৌকাডুবির ঘটনা। এই মূল ঘটনা-বিপর্যয়ের সূত্র ধরেই উপন্যাসে বারবার চমকপ্রদ নাট্যমুহূর্ত এসেছে। রমেশ যখন জানল কমলা তা স্ত্রী নয়, তখন এক চমক, হেনলিনী যখন জানল রমেশ-কমলা বিবাহিত দম্পতি নয় তখন আর এক চমক, কমল যখন জানল রমেশ তার স্বামী নয় তখন আরও এক চমক এবং নলিনাক্ষ যখন জানতে পারলো কমলাই তার হারানো স্ত্রী তখন শেষ চমক। এতগুলি নাটকীয় মুহূর্ত কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি, সবটাই আপন আপন পথে সরলীকৃত সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে। নলিনাক্ষকে স্বামী জানার পর কমলার চিত্তে রমেশকে নিয়ে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আলোড়ন জাগলো না—এটা কি আধুনিক মননে বিশ্বাস্য বলে মনে হয়?

রমেশ হেমনলিনীকে ভালোবাসে। বাবার আদেশে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েও সে হেমকে ভোলেনি। পরে কমলা আসলে পরস্ত্রী জেনে সে হেমের কাছে মনের দিক থেকে খাঁটি থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় কমলার কাছাকাছি এসে গেছে এবং তাকে ঘিরে রমেশের মনে এক অন্তর্লীন অনুরাগের জন্ম হয়েছে। ঠিক তখনি ঘটনাচক্রে কমলা জানতে পারে রমেশ তার স্বামী নয়। এই ঘটনা তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এক দুর্যোগের ঘনঘটায় নৌকাডুবির ফলে দুটি চরিত্র অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিল—অন্যতর ঘটনায় তারা আবার কক্ষচ্যুত উল্কার মত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কমলা শেষপর্যন্ত তার স্বামী নলিনাক্ষর কাছে আশ্রয় ও প্রেম খুঁজে পেল। রমেশ হেমনলিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এমন সম্ভাবনার পথও হয়তো খোলা রইল। তার আগে রমেশ ও কমলার শেষ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিল হতে পারতো—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে গেলেন না। রমেশের জন্য একুট বেদনা করুণ ছোঁয়া পাঠক মনে লাগতে পারে হয়তো, তবু বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনী কিংবা 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথ-লবঙ্গলতার শেষ সাক্ষাৎকারে মত অনবদ্য রূপায়ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

কমলা ও হেমনলিনী-প্রধন দুই নারী চরিত্র লেখকের সযত্ন সৃষ্টি। একটি সরলা গ্রাম্য বালিকা ও একটি আধুনিক শিক্ষিতা তরুণীর পরিচয় ও প্রকৃতি স্পষ্ট রেখায় প্রকাশ পেয়েছে। হেমনলিনী পরিশীলিত অভিজাত রবীন্দ্র নায়িকা যার মধ্যে কলকাতার নব্যরুচির অলোকপ্রাপ্তা নারীর দেখা পাই, পরবর্তী সুচরিতা, লাবণ্যের মধ্যে যার পূর্ণতার বিকাশ।

সমকালীন কলকাতার সম্পন্ন ব্রাহ্মপরিবারের নিদর্শন হিসাবে অন্নদাবাবুর পরিবারকে উপন্যাসে আনা হয়েছে। পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর পরিবারে যে চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে—যেন তারই আভাস নৌকাডুবিতে দেখা গেল।

৩.৬ গোরা (১৯১০)

মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র খ্যাতি-পরিচিতি। স্বজাত্যবোধের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে গোরা উত্তীর্ণ হয় বিশ্বাত্মবোধে। এত ব্যাপক প্রসার ও ভাবকল্পনার ব্যাপ্তি, জীবনদর্শনের গভীর সামগ্রিক দৃষ্টি আর কোনো বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি। এই উপন্যাসে যে সমগ্রতার ধর্ম ও বৃহত্তর ঐক্যের কথা প্রকাশিত তারই মহিমময় ব্যাপ্তিতে এ কাহিনীর মর্যাদা ও তাৎপর্য।

'মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষ আপন-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে,
> তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা"

—'গোরা' উপন্যাসে বৃহতের বোধেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতার এই উপলব্ধিকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার আদর্শই এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। লেখক গোরা চরিত্রে ভারত বোধ থেকে বিশ্ববোধ, জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতার উত্তরণ দেখিয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেই সময় ও পটভূমিতে এই কাহিনী রচিত হয়েছিল। ঐ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া গোরা রচনার উৎসে কাজ করেছে, যদিও গোরার রচনাকাল থেকে বেশ কিছু বছর আগে কাহিনীটি স্থাপিত। লেখক গোরার জন্ম সিপাহী বিদ্রোহকালে অর্থাৎ ১৮৫৭-তে বলেছেন এবং কাহিনীতে গোরার বয়স ২২/২৩। সে হিসাবে ১৮৮০ সাল নাগাদ সময় কাহিনীর কাল। সেসময়ের শিক্ষিত যুবক গোরার মধ্যে স্বাদেশিকতা ও ইংরেজবিরোধিতা যেমন সতেজ ছিল, তেমনি প্রবল ছিল হিন্দুত্ব ও ভারতচেতনা।

নায়ক গোরা ও তার বন্ধু বিনয় হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ভারত হিতৈষণা তাদের জীবনের ব্রত। বিনয় ঘটনাচক্রে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুচরিতার পরিশীলিত স্বভাব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ। গোঁড়া উগ্র হিন্দু গোরা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মানুষদের সঙ্গে বিনয়ের মেলামেশা পছন্দ করে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোরাও ঐ ব্রাহ্মপরিবারে যাতায়াত করে এবং সুচরিতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সে পরিচয় হৃদয় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুটি চরিত্রকেই বিকশিত করে।

দেশকাল ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গভীরতর জীবনসত্যের অন্বেষণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম কেন্দ্রিক বিরোধ দুটি পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রধানত গোরা চরিত্রে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুয়ানীর প্রকাশ দেখি তার আবরণ ছিন্ন হয় গোরার জন্মপরিচয় উদঘাটনে। মা আনন্দময়ীর মুখে তার বিদেশী উত্তরাধিকারের বৃত্তান্ত শোনার মুহূর্তে গোরা অনুভব করেছে তার দেশানুরাগ সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহারের আজন্ম বিশ্বাস্য ভিত্তি ভূমি মিথ্যা অলীক। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতই তীব্র এবং স্বাভাবিক—"মা তুমি আমার মা নও?"

—কিন্তু পরক্ষণেই সংযত, অন্তর্মুখী তার আচরণ। সে সুচরিতার উদ্দেশ্যে পরেশবাবুর কাছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিশেষ সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে গোরাকে আবদ্ধ রাখলে তার মধ্যে তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবীমানসের ধর্মাদর্শ সঞ্চারিত করা সম্ভভব নয়। হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে তাকে সরিয়ে এনেই সেই গোঁড়ামির বিলুপ্তি সম্ভভব। গোরাকে জন্মসূত্রে বিদেশি করে তার মোহমুক্তি ঘটিয়ে উদারবিশ্বে তাকে মুক্তি দেওয়া সহজ হয়েছিল। তাই জননী আনন্দময়ীর মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বমানবতার মূর্তি, বলেছে "মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

এই ঘটনাবহুল উপন্যাসে মুখ্যত উনিশশতকের শেষার্ধের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনার উপস্থাপনা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে মানবতাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে গোরা-সুচরিতা, বিনয়-ললিতা যুগ্ম প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানবহৃদয়ের প্রেমের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিলন শুধু বিবাহমাত্র নয়, তা বৃহত্তর জীবনাদর্শের মধ্যে মুক্তি। গোরা উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেই এই বৃহত্তর জীবন বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। গোরা, সুচরিতা, বিনয়, ললিতা ছাড়া যে দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পেয়েছে। তারা হলেন আনন্দময়ী ও পরেশবাবু—গোরার মা ও সুচরিতার পিতা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে কোনো সম্বন্ধই রক্তের বন্ধন নয়। গোরার জন্মদাত্রী জননী আইরিশ মহিলা, গোরার জন্মকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। আনন্দময়ী গোরাকে প্রকৃত মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন। অনুরূপভাবে পরেশবাবুও সুচরিতার পিতা নন, কিন্তু স্নেহে পিতারও অধিক। দুটি চরিত্রের মধ্যেই লেখকের বিশিষ্ট আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশবাবুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন ধর্মোপলব্ধির মুখপাত্র হিসেবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

আনন্দময়ীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি ও চিত্তমুক্তির আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। ইউরোপীয় দম্পতির সদ্যোজাত সন্তান গোরাকে নিজের বলে গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর উদার হৃদয় প্রকাশিত। সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে যে বিশ্বমানবতার অসীম মুক্তি তারই প্রতীকিত বাণীমূর্তি যেন আনন্দময়ী। তাই গোরার চরম উপলব্ধি ঘটেছে তাঁরই মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে—যখন মা-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মাতৃভূমিকে, যখন আনন্দময়ী তার কাছে ভারতবর্ষের প্রতিমা রূপে অনুভূত হয়েছেন। গোরার চিত্তমুক্তিতে আনন্দময়ীর জীবনভাবনা ও সত্যদৃষ্টির অবদানত আছে।

৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)

'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এটি 'চতুরঙ্গ' নামে বিজ্ঞাপিত হয়নি। পরপর সাতটি অনবদ্য ছোট গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার পর 'জ্যাঠামশায়' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যায় 'শচীশ' প্রকাশের পর বোঝা যায় এটির পূর্বাপর অংশ আছে এবং ক্রমান্বয়ে 'দামিনী' ও শ্রীবিলাস' পর্ব প্রকাশে চারটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থাকারে চারটি অংশ সমন্বিত হয়ে 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। এটির উল্লেখযোগ্য বিষয় এর ভাষা ও বাকরীতি। 'চতুরঙ্গ'-ই সাধুভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। একই বছরে রচিত 'ঘরে-বাইরে' রবীন্দ্রনাথের লেখা চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ'-র ভাষা সাধুভাষা হলেও এর রীতিও ভঙ্গিতে চলিতভাষার মুক্তি অনুভব করা যায়।

'চতুরঙ্গ' নায়ক শচীশের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। সে তার নাস্তিক জ্যাঠামশায় জগমোহনের শিষ্য। ম্যালথাস ও বেন্থামের ভাবশিষ্য জ্যাঠামশায় 'পজিটিভিস্ট'। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন'ই তাঁর জীবনের আদর্শ।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুতে শচীশের কর্মবাদের ধারা শুকিয়ে গেল। সে আশ্রয় নিল লীলানন্দস্বামীর রসসমুদ্রে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেখান থেকেও তার বিদায় গ্রহণ। অতিরিক্ত কর্ম মানুষকে শুষ্ক করে তোলে আর অতিমাত্রায় রসে মানুষের মন রস স্রোতে ডুবে যায়। কোনোটাই সত্য আশ্রয় নয়। লীলানন্দর আশ্রয়েই শচীশ দেখা পায় 'দামিনী'র। 'দামিনী' রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সৃষ্টি। 'চোখের বালির' বিনোদিনীরই অন্যতর, পরিণততর প্রকাশ দামিনী—

বিনোদিনীর দ্বিধামুক্তি যেন তার মধ্যে দেখি। শচীশের প্রতি দামিনীর আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ উপন্যাসে গতি সঞ্চার করেছে। শচীশ তার সাধনার বিঘ্ন হবে বলে দামিনীর আকর্ষণে সাড়া দেয়নি। কিন্তু দামিনীকে অস্বীকার করতেও পারেনি। জ্যাঠামশায়ের নির্দেশে বিধবা ননীবালাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে সে তাকে বিবাহে রাজী হলেও ননীবালা আত্মহত্যা করে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। দামিনী কিন্তু অন্য ধাতুর। শচীশের উপলব্ধি " সে মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।"

শচীশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। মানুষের আসল আশ্রয় কর্মবাদ বা রসবাদে নয়, তার আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ই তার শক্তি। শচীশের সাধনায় দামিনী যেন বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ। তাই শচীশ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়েছে।

গুহার দৃশ্যে নিদ্রিত শচীশ নিবেদিতা দামিনীকে আঘাত করেছে। তার সেই আঘাতই দামিনীর কাছ গোপন ঐশ্বর্য—পরশমণি। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে কিন্তু শচীশের দেওয়া আঘাতের বেদনাকে নিঃশব্দে বহন করে গেছে। আমরণ।

অনেকেই মনে করেন 'শচীশ' রবীন্দ্রতত্ত্বের বাহন। শচীশের নিজেরই উক্তিতে এর স্বপক্ষে সমর্থন মেলে। শচীশ বলেছে—"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচিনা, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

শচীশের এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকজাতীয় এজন্য অনেকে 'চতুরঙ্গ'-কে রূপক বলতে চেয়েচেন। শচীশের মানস পরিক্রমা এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু শেষাংশে দামিনীও প্রধান হয়ে উঠেছে। ড. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত চতুরঙ্গকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"নানা শচীশের একখানি মালা" এবং এ মালা দামিনীর প্রাপ্য বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

শ্রীবিলাস এ কাহিনীর কথক। তারই কতকতার সূত্রে শচীশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার আইডিয়ার তত্ত্ব থেকে দামিনী প্রকাশিত হয়েছে পূর্ণ মানবী মূর্তিতে। জ্যাঠামশায়কেও পাঠক চিনেছে শ্রীবিলাসের উপলব্ধিতেই।

চতুরঙ্গের রচনাশৈলী অভিনব। এটি আত্মকাহিনী নয়, নয় ডায়েরি বা দিনলিপি। আবার পাত্রপাত্রীরা নিজের নিজের বক্তব্য নিজেরা বলেনি, যেমনটি দেখবো পরবর্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরে অথবা পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনীতে'। এখানে শ্রীবিলাস একাই কথক। শচীশ, দামিনী, জ্যাঠামশায় এবং নিজের কথা সে একাই বলেছে। মাঝে মাঝে অন্য চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটন করতে গিয়ে তাকে ডায়েরির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

"চতুরঙ্গ' নামকরণটিও নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। চারটি চরিত্র নামাঙ্কিত বলে এর এহেন নামকরণ। আবার শচীশের চারটি মানসিক অবস্থা—(কর্মবাদ, রসবাদ, নারীপ্রেম ও সর্বউত্তীর্ণ অবস্থা) ভেবেও এ নামকরণ হতে পারে 'চতুরঙ্গ' বা 'সতরঞ্জ' জাতীয় খেলার ছকের প্রতীক হিসেবেও এই জীবনধর্মী কাহিনীকে ধরে নেওয়া যায়। এ কাহিনীতে চারটি 'মৃত্যু'-র উল্লেখ আছে, যাদের অভিঘাত নায়ক শচীশের আত্মসমীক্ষা ও আত্মউপলব্ধির সহায়ক। জ্যাঠামশায়, ননীবালা, নবীনের স্ত্রী এবং সবশেষে দামিনীর মৃত্যু সবই শচীশের জীবনপথে এক একটি স্তর চিহ্নিত করেছে।

বিষয়বস্তু, গল্পাঙ্গিক, ভাষারীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সবের সমন্বিত রূপ হিসাবে 'চতুরঙ্গ' অন্যন্য উপন্যাস। অনেকে এর ক্রমভঙ্গ রীতির জন্য একে আংশিকের লক্ষণাক্রান্ত বলতে চান কিন্তু এর রূপ-অরূপ তত্ত্বের মানবিক প্রয়োগের অসাধারণত্ব স্বীকার করতেই হয়। অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরাও সহমত হতে পারি যে—

"রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো লেখাগুলির একটি চতুরঙ্গ। আকাশের মুক্তি এবং শোকসুখমিশ্র মাটির অমৃতকে তিনি একটি মানবিক কাহিনীতে অভিনব শিল্পাঙ্গিকে ধরে রেখেছেন।"

৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)

'চতুরঙ্গ' সমকালে লিখিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আগাগোড়া চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রচনারীতির দিক থেকেও নতুনতর আঙ্গিক প্রয়োগ করেছেন। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস নিয়েছিল কথকের দায়িত্ব। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি নিজেরাই বলেছে নিজেদের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রজনী' উপন্যাসে এই পদ্ধতি আগেই প্রয়োগ করেছিলেন।

'ঘরে-বাইরে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির আভাস। এর আগে 'গোরা' উপন্যাসের বিশাল মহাকাব্যিক ক্যানভাসে রাজনীতি এসেছিল। পরবর্তী 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই প্রয়োগ সচেতন ও সোচ্চার। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'ঘরে-বাইরে' কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আলোচনা বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ বিশেষত সন্দীপ চরিত্রায়ণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গঘাতে এ উপন্যাসের পটভূমি উত্তাল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও ভাবাকুলতাকে এ কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সন্ত্রাসবাদের উত্তেজনা তাঁর কাছে হুজুগ বলে মনে হয়েছিল। ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য অগ্নি সংযোগের প্রবণতাকে তিনি অকারণ ধ্বংসের নেশা বলে মনে করেছিলেন।

নিখিলেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুভকামী, প্রশান্ত, স্থির আদর্শ এক মানুষকে এঁকেছেন—যার দাম্পত্য প্রেম ও দেশপ্রেম মঙ্গল ও শুভবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশধর্ম ও মানবিক ধর্মের বিরোধে রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়কেই স্বীকার করেছেন। এখানেই সন্দীপের দেশপ্রেমের থেকে তার বোধ স্বতন্ত্র।

এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষের বিপরীতমুখী আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলায়িত ভাবনায় বিমলার চিত্তসংকট ঘনিয়ে এসেছে। স্বামীর প্রতি বিমলার মনে প্রথমাবধি ছিল ভক্তি মিশ্রিত প্রেমানুরাগ। সে বলেছে—

"আমার স্বামী বলে এসেছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ" নিখিলেশ তার স্ত্রীকে ঘরের চার দেওয়াল থেকে মুক্ত করে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তার বিশ্বাস বাইরে এসেই স্বামী স্ত্রীর যথার্থ আত্মআবিষ্কার সম্ভব। বাইরে এসে বিমলা সন্দীপকে প্রথম দেখায় পছন্দ করেনি। কিন্তু তার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় তার ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বীরপূজার গৌরব ও উত্তেজনায় তার আবেগ হয়েছে বাঁধনহারা।

> "সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ ও অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল"

সন্দীপের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসের তুলনায় বিমলার মনে হয়েছে নিখিলেশ নিরত্তাপ ও দুর্বল। সন্দীপের স্তুতিবাদে সে মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে এবং আপন অজ্ঞাতেই সন্দীপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছুটে গেছে। নিখিলেশের কাছ থেকে কখন যে সে অনেক দূরে সরে গেছে—সে নিজেও বোঝেনি। অথচ একসময় সন্দীপের বিকৃত রূপের পরিচয় বুঝেও সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি। পতঙ্গের মত সন্দীপের বহ্নিময় উত্তাপে দগ্ধ হয়েছে। তার এই আত্মসংকট ও তার আবর্তে ঘুরে ফেরাই উপন্যাসের উপজীব্য। এই সংকটের বীজ তার চরিত্রেই ছিল। তাই নিখিলেশ বলেছে—

> "ধৈর্যের পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।"

কিন্তু সন্দীপকে ঘিরে বিমলার মোহভঙ্গ তার চরিত্রেরই অন্য দিক। আকস্মিক ঝড়ের মত সন্দীপ তার চিত্তাকাশ আলোড়িত করলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ সে নিজের মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছে তখনই অমূল্যের আবির্ভাবে সে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে সন্দীপের অর্থলোলুপতা ও অসংযমী চিত্তের নিরাবরণ প্রকাশে তার মোহাবেশ ছিন্ন হয়েছে। অমূল্যকে কেন্দ্র করে তার স্নেহ ও শুভবোধতাকে পুরাতন পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। স্বামীর সিন্দুক থেকে সন্দীপের জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে তার মন যে ন্যায়নীতির বোধ ও অনুশোচনার দংশন হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত ছিল তার মোহভঙ্গের বীজ।

গৌণ চরিত্রে মধ্যে মেজরানী, চন্দ্রনাথবাবু ও অনূল্য লেখকের সৃষ্টিকুশলতার নিদর্শন।

বিমলার সন্দীপকেন্দ্রিক মোহভঙ্গে কোনো না কোনোভাবে এদের প্রভাব কাজ করেছে। অমূল্য চরিত্র এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, অবশ্যই বিমলার আত্মবীক্ষণ তাকে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। অপরাধবোধে পীড়িত হৃদয় নিয়ে সে ফিরতে চেয়েছেন' বছর আগেকার দিনে—যেদিন চন্দন চেলি পরে এক নবভধূ এসে দাঁড়িয়েছিল নিখিলেশের পাশে। সে যখন আপনমনে বলে—

> "আজ আমি এই যে টাকা চুরি আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালরে আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।"

—তখনই মনে মনে তার আত্মদহন শুরু, শুরু মানসিকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত বিমলার অনুতাপ ও বেদনার আঁখিজলে নিখিলেশের উদার প্রশান্ত প্রেমের শুভবোধে ওদের মিলন ঘটেছে।

৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)

'চোখের বালি' রচনার আগে ছিল দীর্ঘ ১৬ বছরের নীরবতা। রাজর্ষির (দ্বিতীয় উপন্যাসের) পর তৃতীয়টি রচিত হয়েছিল এই দীর্ঘ ব্যবধানে। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরের পর আবার দীর্ঘ বিরতি। তেরো বছর পর 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হয়।

রবীনদ্র উপন্যাসও তাঁর কাব্য কবিতার মত তত্ত্বাশ্রয়ী এমন ইঙ্গিত অনেকেই করে থাকেন। বিশেষত তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাস দুই বোন, মালঞ্চ, শেষের কবিতায় এই তত্ত্বভাবনা স্পষ্ট প্রকাশিত। এই মন্তব্যের যোগ্য উত্তর—যোগাযোগ।

১৯২৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে তত্ত্ববিনির্মুক্ত সমাজচিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। এর চরিত্রগুলি বিশিষ্ট সমাজজীবনের আদর্শে গড়ে উঠেছে। সমাজজীবনের সন্ধিলগ্নের এই উপন্যাসে এই নৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ছবিটি স্পষ্ট।

গল্পটির অন্তরঙ্গ জীবনভাবনায় আছে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সংকট। কুমুদিনী ও মধুসূদনের অন্তর্বিরোধ এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু কুমু ও মধুসূদনের বিরোধ অকেটাই বিপ্রদাস ও মধুসূদনের বিরোধ—আরো বিশদভাবে বলতে গেলে দুটি শ্রেণীর বিরোধ। সেই শ্রেণী বিরোধের উৎস দুই পরিবারের বংশগত বিরোধ।

তাই দাম্পত্য সমকট যা একটি পরিবারের ঘটনা তার প্রেক্ষিত পরিবার ছাড়িয়ে সমাজকে ছুঁয়েছে, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব ব্যাপ্তি পেয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাকে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

নূরনগরের চাটুয্যে পরিবার অর্থ প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শীর্ষে ছিল—আজ তাদের পতনোন্মুখ অবস্থা। অন্যদিকে বাণিজ্য লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদে সদ্য ফেঁপে ওঠা নব্য ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মধুসূদন। নূরনগরের অভিজাত বিপ্রদাসের সঙ্গে তার সংঘর্ষ।

মধুসূদন ঘোষাল কিছুটা জেদের বশে নূরনগরের চাটুয্যে পরিবারে বিবাহ করেছে—অর্থের কৌলীন্যে আভিজাতকে ক্রয় করতে চেয়েছে। কিন্তু মন তো বাজর দরের হিসেবে চলে না। তাই কুমু তার ঘরে এলেও মনেতে প্রবেশ করেনি। দুজনের অন্তর্বিরোধের প্রকৃতি এমনই যে তাদের মেলা সম্ভব ছিল না, বণিকবুদ্ধি বস্তুলোভী মধুসূদনের কাছে কুমুদিনী তার নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্রের মত। নব্য ঐশ্বর্যমদমত্ত মধুসূদন কুমুকে স্ত্রী হিসাবে চেয়েছ শুধু তার বংশ গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে হৃদয়বৃত্তির কোনা আলোড়ন বা উচ্ছ্বাস ছিলনা, শুধু ছিল উদ্ধ্যত প্রভুত্ব স্পৃহা। স্বামী সম্বন্ধে কুমুদিনী বাল্যকাল থেকে যে ধরাণা পোষণ করে এসেছে তার সঙ্গে মধুসূদনের আচার-আচরণের কোনও মিলই ছিল না। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধের প্রকৃত ইতিহাস এই। বংশগৌরব প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার নির্মম ক্রুরতা ও ধনগর্ব এবং প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপতা মধুসূদন চরিত্রকে ঘিরে আছে। নারী সম্পর্কে তার ধারণায় কোনো মোহ বা মাধুর্য ছিল না। তাঁর চরিত্রের মধ্যেই বিবাহোত্তর জীবনের বিপর্যয়ের বীজ নিহিত। কুমুদিনীর সূক্ষ্ম হৃদয়বোধ মধুসূদনের স্থূল বোধের কাছে বারবার আঘাত পেয়েছে। তাদের দুজনের মানস বিচ্ছিন্নতা দাম্পত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিশাপ ও অনতিক্রম্য ব্যবধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জটিলতা অবশ্য শেষাংশে কুমুর সন্তানসম্ভভাবনায় অনেকটাই সরলীকৃত সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

এ উপন্যাসের নামকরণ লক্ষণীয়—এ কারণে যে পত্রিকায় ধারাবাহিকতা প্রকাশকালে এর নাম প্রথমে ছিল 'তিনপুরুষ', পরে 'যোগাযোগ' নামে ঘটলো পরিণতি। আসলে 'তিনপুরুষ' থেকে 'যোগাযোগ' নাম পরিবর্তনের মধ্যে গল্পের বস্তুর চেয়ে রূপের আকর্ষণই প্রবল হয়েছিল। এই নাম বদলের মধ্যেই উপন্যাসটির আন্তরধর্মের এক বড় পরিচয় বয়ে গেছে। 'তিনপুরুষ'-এ যে কাহিনীর বিস্তার 'যোগাযোগ' তা সংহত। আবার 'তিনপুরষ' নামকরণে যে ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস—যোগাযোগ নামকরণে সেই বহিরঙ্গ ক্রমের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ সেতুর আভাস। এ প্রসঙ্গে 'নামান্তর' নামে একটি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

> "গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট।..... তিনপুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে, এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এ চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্য নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যই।"

এ কাহিনীর প্রধান তিনটি চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতি প্রয়োগ করেছেন। মূলত দাম্পত্য সংকটের কাহিনী হলেও বিপ্রদাস এর অন্যতম প্রধান চরিত্র। রুচিবোধ ও আভিজাত্যে মহিমময় বিপ্রদাস চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের প্রতিরূপ দেখি। বনেদী জমিদারকুলের আভিজাত্য গর্বের পরাজিত বেদনার পাশে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের আর্থিক কৌলীন্যের শক্তিমত্তা দেকালেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত যে ছিল ঐতিহ্যবাহী পরাজিত ভূস্বামীদের প্রতি তা বোঝা যায়। তাই উপন্যাসে নব্য ধনী ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষালের পাশে অস্তমিত অভিজাত গরিমার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মমতা প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি অনভিজাত নব্য ধনী মদুসূদন ঘোষালকে তিনি যেন সচেতনভাবে স্থূল, অহংকারী, মদমত্তরূপে চিত্রিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনী মধুর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক। তার সঙ্গে পূর্ববর্তী হেমনলিনী, সুচরিতা ও পরবর্তী লাবণ্য চরিত্রের আত্মিক সম্পর্ক আছে। তবু কুমুদিনী আপন স্বরূপে অনন্যা।

গৌণ চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নবীন, মোতির মা এবং অবশ্যই হাবুল। ঘোষাল বাড়ির বদ্ধ পরিবেশে নবীন ও তার স্ত্রী ছিল কুমুর মনের খোলা জানলা আর হাবুল ছিল সে মুক্ত বাতায়ন দিয়ে দেখা একটুকরো নীলাকাশ। কুমুর মানসমুক্তির ক্ষেত্রে এদের অবদান স্মরণীয়। এর বিপরীতে স্থাপিত শ্যামা উল্লেখ্য এক নেগেটিভ চরিত্র।

'যোগাযোগ' একটি বৃহৎ সাগা জাতীয় রচনা হয়ে ওঠার সম্ভভাবনা ছিল। 'তিনপুরুষ' নামকরণ ও সূচনায় তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের বর্ণনার মধ্যে সেই দীর্ঘায়িত বিশাল ক্যানভাসের সম্ভাব্য আভাস মেলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসম্পূর্ণতার লক্ষণ নিয়ে যেন উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে। শোনা যায় এর পরবর্তী একটি খণ্ড লেখার অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথের, যদিও সেটি সম্ভব হয়নি, সুতরাং এক বৃহৎ অলিখিত উপন্যাসের প্রথমার্ধ বলে একে মনে হয়, যদিও রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না, তবে এর আকস্মিক সমাপ্তি নিয়ে মনে একটা অতৃপ্তজনিত বেদনাবোধ হয়।

৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)

যোগাযোগের সমকালে রচিত 'শেষের কবিতা' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা। বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে এটি 'যোগাযোগ' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক সমকালীন আভিজাত্যের একটি স্তরকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমালোচকের মতে 'শেষের কবিতার' বৈশিষ্ট্য "এর অপূর্ব মধুর কাব্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাকভঙ্গি, ভাষার উজ্জ্বল ও তির্যক গতি, অপূর্ব বর্ণবিলাসময় ভাব পরিবেশ।"

অমিত-লাবণ্যর অসামান্য প্রেমকাহিনী শিলং-এর পাহাড়ী পাথর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। এই কাব্যধর্মী উপন্যাস তার অবয়বে ও আত্মার ধরে রেখেছ চরম রোম্যান্টিকতা।

নায়ক অমিত অতি আধুনিক ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের একজন। এরা কলকাতার অভিজাত বংশীয়, বিলেতে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, ধনাঢ্য বংশের সন্তান, মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষায় সহজ। এদের দিকেই রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য আধুনিকতার নির্মোক সরিয়ে হৃদয়বত্তার পরিচয়ও রাখলেন—কেটির চরিত্রে তারই প্রমাণ মেলে।

শেষের কবিতার কাহিনী গড়ে উঠেছে অমিত-লাবণ্যর প্রেমকে কেন্দ্র করে। শৈলশহর শিলং-এর পথ তাদের বেঁধেছিল বন্ধনীর গ্রন্থিতে। তাদের প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য রোম্যান্টিক মাধুর্য প্রকাশ করেছেন। তাই ঘটনার ঘনঘটা নয় কবিতার ছন্দোময়তায় কাহিনী এগিয়ে চলেছে। অমিত লাবণ্যর প্রেম যখন পরপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান তখন তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে কেটি মিত্রের অশ্রুজল, শোভনলালের বেদনা। অমিতের অতীত প্রেম কেটি আর লাবণ্যর অতীত স্মৃতি শোভনলাল—দুজনেই শেষ বর্তমানে উদ্ভাসিত হয়। তবে সেই অদূর অতীত নয়-শিলঙের পথে অমিত লাবণ্যর বর্তমানের প্রেমই কাহিনীর মূল বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমে রেখে গেলেন এক মুক্তির বার্তা। প্রেমের বন্ধনেও বাঁধা নয় যে হৃদয়, সেই স্বাধীন মুক্ত হৃদয়ের কথাই শোনা গেল এ উপন্যাসে। তাই সমালোচক যথার্তই মন্তব্য করেন—

> "একই পুরুষ বা নারীর একজনকে ভালোবাসা, অন্যকে বিয়ে করা, অতবা একই পুরুষ বা নারীর একজনের সঙ্গে গভীর প্রেমে আত্মহারা অবস্থায় আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্যের প্রতি প্রেম অন্তরে পোষণ করার যে- ছবি লেখক শেষের কবিতায় এঁকেছেন, তার চেয়ে মুক্ত হৃদয়ের বার্তা আর কি হতে পারে?"

এর থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার মুক্তি-বন্ধন তত্ত্ব এসেছে। অমিতের কাছে কেটি বন্ধন আর লাবণ্যমুক্ত প্রেমের বন্যাধারা। একেই স্পষ্ট করতে লেখক 'ঘড়ার জল আর দীঘির জলের' তত্ত্ব বার করেছেন। অমিত লাবণ্যর বিচ্চেদের পর অমিত তাই বলেছে—

> "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি, কিন্তু আমার আকাশও রইলো।"

অমিত ও লাবণ্যই এ কাহিনীর প্রাণ। সঙ্গে আছে 'কেটি' ও শোভনলাল। গৌণ চরিত্রে মধ্যে যোগমায়া বিশেষ উল্লেখ্য। লাবণ্যর বাবা অবনীশের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া আছে সিসি, লিসি, বিমি বোস, নরেন কুমার-মুখো প্রভৃতি দল যাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিশশতকের বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের বিশিষ্ট পরিশীলিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। এরা পুরোপুরি ইঙ্গবঙ্গ অনুকরণজাত আধুনিক ধনী সম্প্রদায়। এদের প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন 'ফ্যাশনটা হল মুখোস'। শিলং এর শৈলাবাসেই বাঙালি পাঠক সম্ভভবত প্রথম দেখলেন বাংলাসাহিত্যের প্রথম গভর্নেসকে, দেখলেন অভিজাত বর্ষিয়সী যোগমায়ার আন্তরিক অথচ স্মার্ট উপস্থিতি, দেখলেন বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেটি মিত্তিরকে যে স্বচ্ছন্দে প্রথম আলাপেই ধূমপান করার জন্য এক বালিকার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে বসে।

নাগরিক চেতনাঋদ্ধ আধুনিকতার অনন্য নিদর্শন শেষের কবিতা-তেই মেলে যেখানে নরনারীর প্রণয় ও পরিণয় সম্পর্কিত মুক্ত চিন্তার অভিনব প্রকাশদীপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্য সব উপন্যাস থেকে এ গ্রন্থ শিল্পরূপে স্বতন্ত্র। এই ছোট উপন্যাসে কুড়িটিরও বেশি কবিতা স্থান পেয়েছে। ফলে একে 'কাব্যোপন্যাস' বলা সঙ্গত। তবে কাব্যিক আবেদন সত্ত্বেও এটি মূলত উপন্যাস এবং পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণও এতে যথাযথ চিত্রিত হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়—

> "প্রেমের স্বরূপধর্ম, তার বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ, মানবমনের সূক্ষ্ম ভাববৃত্তির ওপর তার বিচিত্রবর্ণের কলাপ বিস্তার, কবিত্বময় বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।"

৩.১১ দুইবোন (১৯৩৩)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শেষ পর্বের যুগলগ্রন্থর অন্যতম 'দুইবোন'। সমকালে রচিত 'মালঞ্চ'র সঙ্গে এর সম্পর্ক নিগূঢ়। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত দুইবোন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকাতেই বঙ্গাব্দ ১৩৪০-এর আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল 'মালঞ্চ'। কাহিনীগত দিক থেকেও এদের মধ্যে মিল আছে। উভয়ক্ষেত্রেই বিবাহিত পুরুষের জীবনে স্ত্রীর অসুস্থতার কালে সামাজিক সম্পর্কে আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে প্রণয় সঞ্চারিত হয়েছে এবং ফলে ঘনিয়ে উঠেছে দাম্পত্য সংকট। দু'টি উপন্যাসের পরিণতি অবশ্য ভিন্নমুখী।

রবীন্দ্র উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বভাবনা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিলেন। কিন্তু 'দুইবোনে' আবার সচেতনভাবেই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয় 'দুইবোন' উপন্যাসের শুরুই হয়েছে তত্ত্ব দিয়ে।

> "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি, একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।"

—এই দুই নারীতত্ত্বের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে উপন্যাসের কাহিনী। এর দুই বোন শর্মিলা আর ঊর্মিমালা যথাক্রমে মা ও প্রিয়ার জাতের মেয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাদের কাব্যিক উপমায় বেঁধেছেন—মা হল বর্ষা ঋতু আর প্রিয়া হল বসন্ত ঋতু।

পুরুষের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে দুই নারীরই হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষিতা, অভীপ্সিতা। এই চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে জীবন হয়ে ওঠে জটিল, সংঘাত হয় জটিলতর।

'দুইবোন' উপন্যাসে শশাঙ্ক-শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে ঊর্মির আবির্ভাবে যে তরঙ্গ হিল্লোল দেখা দিল, তাতে ঘনিয়ে এলো সংকটের কাল। এই সংকট উভয়পক্ষেই তীব্র হয়ে উঠলো, কারণ শশাঙ্কের জীবনের দুই নারী—আসলে দুই বোন। নামকরণের এই সচেতন ব্যঞ্জনই গড়ে তুলেছে নাট্য অভিঘাত। অসুস্থ শর্মিলার সঙ্গী হবার কারণে ঊর্মিমালার আবির্ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিদির জীবনে মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠলে সে-ই। আসলে শর্মিলার অতিরিক্ত সেবা যত্ন ও মমতায় শশাঙ্কর পৌরুষ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চাইত। তার রোম্যান্টিক মানসে কোথায় যেন একটু অতৃপ্ত কামনা ক্রিয়াশীল ছিল, সেবাপরায়ণা শর্মিলা যা পূর্ণ করতে পারেনি। একনিষ্ঠ দাম্পত্যর বাইরে যাবার মত জোর শশাঙ্কর ছিল না, কিন্তু শ্যালী-ভগ্নীপতির আপাতনিরীহ মধুর সরস সম্পর্কের সূত্রে হয়তো অজান্তেই তার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করলো। তখন তার আবেগ ও উচ্ছলতা এমনই বাঁধনহীন হল যে স্ত্রীর কথা ভাবার সময় রইলো না এমনকি তার ব্যবসাও ফেল পড়লো।

অনদিকে শর্মলা নিজের বোনের সঙ্গে স্বামীর হৃদয়গত সম্পর্ক অনুমান করতে পেরে বেদনার্ত হলেও নিজেকে সংযত করেছে। নিজের রোগের কারণে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী হয়ে না ওঠার অজুহাতে নিজে থেকে বোনের সঙ্গে স্বামীর বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। পাঠকের মনে বিষবৃক্ষের 'সূর্যমুখী'র কথা চকিতে ভেসে ওঠে। সেখানে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহে সম্মতি দেয়। এখানেও শশাঙ্ক ঊর্মিকে বিবাহে মত দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে এই বিবাহ হয়ে ওঠেনি। শশাঙ্কর ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় ঊর্মি যেন নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়েছে, যে বোধ তার মনে প্রথমাবধি সুপ্ত ছিল—এই আঘাতে তা স্পষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠে ঊর্মিকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রায় প্রণোদিত করেছে। অন্যদিকে শর্মলা প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শশাঙ্ক নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে ফিরে আসে শর্মিলার কাছে—

> "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে...যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই, একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলাও তার বুদ্ধি ও বোধ এবং হৃদয় দিয়ে স্বামীর অনুতাপকে বুঝতে পেরেছে—তাই তাদের যথার্থ মিলনে উপন্যাস পেয়েছে সুখ পরিণতি। ঊর্মির চরিত্রের ট্র্যাজিক আভাস অনেকটাই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে।

এই তিনটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে চতুর্থ চরিত্র—নীরদ, প্রথমাবধি যাকে ঊর্মির ভাবী স্বামী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চারটি চরিত্রকে নিয়ে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করে উপন্যাসের চারটি অংশ চারজনের নামে চিহ্নত করা হয়েছে। তবে চতুরঙ্গের মত একটি প্রধান চরিত্র এখানে একা কথকের দায়িত্ব পালন করেনি।

আয়তনের দিক থেকে 'দুইবোন-কে ছোট উপন্যাস বলা যায়। অবশ্য এজাতীয় পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে বারবার করেছেন। দুইবোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায়-এর আয়তন ছোটগল্প 'নষ্টনীড়ে'র মত। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' আয়তনে নষ্টনীড়ের চেয়ে কম। তবু রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প এবং দুইবোন-মালঞ্চকে উপন্যাস বলেই চিহ্নিত করেছেন। এর রচনারীতিতে আছে সংহত সংযম ও নাটকীয় চমৎকারিত্ব। ফলে একাধারে ছোটগল্পের সংযম, নাটকের শীর্ষসংঘাত এবং উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিলে এই উপন্যাসিকা হয়ে উঠেছে শিল্পিত এক সাহিত্য মাধ্যম।

৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)

দুইবোনের সমকালে লিখিত 'মালঞ্চ' উপন্যাসের বিষয়ও সমধর্মী। মনে হয় 'দুইবোনে' যা বলতে চেয়েছিলেন, তারই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপ—মালঞ্চ। 'মালঞ্চ'-তে দুইবোনের মতই এক পুরুষের দুই নারীতে আসক্তি ও আকর্ষণ, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় এক পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এমন মিল আর দেখা যায় না। তবে আন্তর ধর্মে কিছু প্রভেদও আছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে ধরদা পড়েছে নামকরণে। 'দুইবোন' যেখানে চরিত্রের ভাবদ্যোতক, মালঞ্চ সেখানে অনেকটাই প্রতীকধর্মী। 'মালঞ্চ' কেবল সাজানো বাগানই নয়—তা যেন আদিত্যর মানস-উদ্যানও। আদিত্য ফুল ফোটানোর কারিগর। তার প্রিয় বাগান তার ফুলের ব্যবসার উৎস। দোকানের দিক তার ব্যবসায়ী দিক, আর বাগান তার মনের রোম্যান্টিক দিক। ফুলের বাগান আদিত্য গড়ে তুলেছে স্ত্রী নীরজার সঙ্গে, তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবন ভরে উঠেছে মালঞ্চের পুষ্প লাবণ্যে। সন্তান সম্ভাবনার অঙ্কুর বিনিষ্ট হবার পর থেকেই কঠিন রোগে শয্যাগতা হল নীরজা। তার সেবা ও বাগানের পরিচর্যার কারণে সংসারে আগমন ঘটলো সরলার—আদিত্যর সঙ্গে তার আছে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র। দুইবোনে শর্মিলার অসুস্থতার কারণে ঊর্মিমালার আগমনের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে। তবে নীরজা যেমন শর্মিলা নয়—সরলাও ঊর্মির সমগোত্রীয় নয়। চরিত্রগুলি আন্তরধর্মে সদৃশ নয়, যদিও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিস্থিতি অনেকটাই এক হয়ে উঠেছে।

সরলার জ্যাঠামশাই আদিত্যর সম্পর্কিত মেসোর কাছেই তার ফুলের শিক্ষা লাভ। নীরজার সঙ্গে বিয়ের আগে আদিত্যর সরলার সঙ্গে যে সখ্যতা ছিল, তার গভীরে অন্তর্লীন থাকা প্রেম আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেল। অসুস্থ স্ত্রীর বাগানে অনুপস্থিতির সুযোগে আদিত্যর জীবনে জেগে উঠলো সুপ্ত প্রণয় মধুরিমা। 'মালঞ্চ' নতুন পুষ্পে হল মঞ্জরিত। সরলা 'দুইবোনে'র ঊর্মিমালা নয়—সেই উচ্ছলতার পরিবর্তে তার চরিত্রে আছে অন্তর্মুখী গভীরতা। সে নিজেকে আড়াল করে রাখতেই ভালোবাসে।

এ কাহিনীতেও দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র আছে—রমেন। দুইবোনের নীরদের সঙ্গে তার স্বভাবের কোনো মিল নেই। সরলা সম্পর্কে তার মনে আছে স্নিগ্ধ অনুরাগ। এই পারিবারিক উপন্যাসে রমেনের চরিত্রই রাজনীতির সূত্রে সামাজিক পরিমণ্ডলের স্পর্শ নিয়ে এসেছে। ১৯৩০ থেকে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আইন-অমান্য আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল এ কাহিনীতে সেই প্রসঙ্গ এসেছে তাতে রমেনের সক্রিয় যোগদানের সূত্রে। রমেন কারাবরণও করেছে, এমনকি সরলাও বে-আইনী সভাসমাবেশে যোগ দিয়ে জেলে গেছে। অবশ্য সরলার ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি—আদিত্য-নীরজার সংসার মালঞ্চ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা।

এ উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে চারটি চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিত্য-নীরজার দাম্পত্য সুখ নীরজার অসুস্থতায় সরলার উপস্থিতিতে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। নীরজার ঈর্ষায় আদিত্য-সরলার সুপ্ত নুরাগ খুঁজে পেয়েছে প্রকাশের পথ। আবার রমেন তার প্রেম নিবেদন করেছে সরলাকে—যদিও আদিত্যকে ঘিরে সরলার হৃদয় দৌর্বল্য তার অজানা ছিল না। সরলার হৃদয় আদিত্যর কাছে বাঁধা পড়েছিল—কৈশোরকালের অঙ্কুর তরুণ যৌবনে মঞ্জরিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছিল যদিও রমেনের প্রতিও ছিল তার এক ধরনের অনুরাগ। নীরজা চেয়েছে রমেনের সঙ্গে সরলার বিয়ে দিয়ে জটিল রহস্যের সহজ সমাধান। আদিত্য কর্তব্যপরায়ণ স্বামী কিন্তু সরলার মধ্যে তার প্রথম প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশে তার প্রেমিক সত্তা নীরজার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে। চারটি চরিত্রের এই মানস আন্দোলনের ছবি উপন্যাসে দেখেছি—কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক সময়ই আড়ালে থেকে গেছে। অনেকটা ক্রমভঙ্গ রীতিতে লিখিত এই উপন্যাসে নাটকীয়তা অনেক বেশি। সম্ভবত এজন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

দুইবোনের সমস্যা একই ধরনের হলেও সমাপ্তি কিন্তু ভিন্নতর। দুইবোনে ঊর্মি দিদির সংসার বাঁচাতে নিজে চলে যায় এবং শশাঙ্ক-শর্মিলার মিলন ঘটে। মালঞ্চ-তে কিন্তু শেষপর্যন্ত নীরজার মৃত্যু ঘটে। শেষ অধ্যায়ে নীরজা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে যে চিরবিদায়ের আগে সে প্রসন্নমনে সরলাকে দিয়ে যাবে আদিত্য ও মালঞ্চর সব দায়িত্ব। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সরলা যখন তার কাছে এল তখন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে নীরজা বুঝতে পারলো তা সে পারবেনা। তাই তার অন্তিম উক্তি—

> "দিতে পারবো না, পারবো না....। জায়গা হবে না তোর.... আমি থাকবো, থাকবো, থাকবো।"

এ কাহিনী তাই শেষপর্যন্ত বিষাদকরুণ হারাকারেই সমাপ্ত হয়েছে।

৩.১৩ চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস—চার অধ্যায়। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাস প্রকাশকালে তর্কবির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাও বিশেষ সমালোচিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেসের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র, এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মদ্যে যে তীব্রতা যে বদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়।"

লেখকের এই উক্তি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রেমকাহিনীকেই আলোকিত করতে চেয়েছ। সমকালীন রাজনীতির ক্লেদাক্তরূপ ও বিপ্লবের ব্যর্থতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের সূচনার 'আভাস' অংশটির কথা মনে আসে। এইঅংশে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গেগ কবির শেষ সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। আলাপ আলোচনার শেষে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে বলেন—'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে।'

এই ঘটনাটি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল, যদিও পরে সেটিকে বাদ দিয়ে দেন। মনে হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই সকরুণ স্বীকারোক্তি উপন্যাসের উৎস রূপে কাজ করেছে। সন্ত্রাসবাদী এই বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অস্ত্যর্থক ছিল না। দেশপ্রেমের নামে সন্ত্রাস, সুলভ ভাবাবেগ, আদর্শের নামে গুপ্তহত্যাকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করেননি।

সেই বিরোধী বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে নায়ক অতীনের মুখে। বিপ্লবপন্থায় আস্থা না থাকলেও সে আছে ইন্দ্রনাথের বিপ্লবী দলে, যেখানে আছে নায়িকা এলা-ও। এলা ও অতীনের প্রেম এই ঝোড়ো আবহাওয়াতেও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। কিন্তু দলের আদর্শ ওদের মিলতে দিল না। এইদলের মধ্যে আছে পুলিসের গোপন চর বটু—যে মনে মনে এলাকে কামনা করে, অতীনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে দলের সকলে এলার মৃত্যু কামনা করে এবং ইন্দ্রনাথ অতীনকেই দিয়েছিল এলাকে হত্যা করার দায়িত্ব। এলাকে বটুর হাত থেকে এবং পুলিশী নির্যাতন থেকে বাঁচাতে অতীন নিজেই নেয় তাকে হননের দুরূহ ভার। প্রেমের তীব্র গভীরতাতেই সে এলাকে চিরতরে ঘুম পাড়াবার দায়িত্ব নেয় এবং দুজনের আবেগতপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।

রাজনীতি দিয়েই উপন্যাসটি সূচিত হয়, শেষও হয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, কিন্তু তার মধ্যে নরনারীর প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষা বাঁধা পড়ে যায়। শেষ দৃশ্যের নাটকীয় মুহূর্তে অতীন এলার সংলাপ ও আচরণে যে আবেগ সংরাগের

রক্তিম উচ্চারণ ভালোবাসার অনন্ত তৃষ্ণার প্রকাশ—এমটি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনায় দেখা যায়নি। অগ্নিযুগের প্রলয়ঙ্কর পটভূমিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কাহিনীর অতীন ও এলা প্রেমের জয় ঘোষণাই করে গেছে।

তাই দলপতি ইন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক কানাই গুপ্ত, গুপ্তচর বটু মিলে যে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাকে ঘনিয়ে তুলে থাকুক না কন, আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রণয়পিপাসাতুর দুই নরনারীর প্রেমবাসনার ছবিকেই এখানে অনন্তের ফ্রেমে বন্দী করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রলয়রূপকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'পতনে'র স্বীকারোক্তি তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছিল মনে হয়।

'চার অধ্যায়' নামকরণ সম্ভবত এর গঠনরীতি অনুসারে করা হয়েছে। এর প্রধান চরিত্র তিনটি কিন্তু চারটি বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এর কাহিনী রচিত হয়েছে নাটকীয় পদ্ধতিতে। গল্প বলার দিকে নজর না দিয়ে লেখক সংলাপমুখ্য নাট্যরীতিতে কাহিনীকে গতিশীল করেছেন।

৩.১৪ অনুশীলনী

১। বাংলাসাহিত্যের প্রথম সার্থক আধুনিক উপন্যাস হিসাবে 'চোখের বালির' মূল্যায়ন করুন।
২। মহাকাব্যির উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র পরিচয় দিন।
৩। 'ঘরে-বাইরে' নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
৪। চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কী? প্রধানত শচীশ চরিত্র অবলম্বনে উত্তর দিন।
৫। যোগাযোগ উপন্যাসের দাম্পত্য সংকটের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সংঘাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।
৬। কাব্যধর্মী উপন্যাস হিসাবে শেষের কবিতার মূল্যায়ন করুন।
৭। যুগল উপন্যাস দুইবোন ও মালঞ্চর তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৮। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'চার অধ্যায়'-এর সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিন।
৯। রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী চরিত্রের স্বরূপ ও বিবর্তনের পরিচয় দিন।
১০। রবীন্দ্র উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ—সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত।
২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু।
৪. রবীন্দ্রমনন—রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৮৭।
৫. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯৪।
৬. রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে—ভূদেব চৌধুরী।
৭. রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (দে'জ)
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।
৯. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-নবমূল্যায়ণ (১৯৮৩-) অমরেশ দাশ।
১০. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—সহদেব দে (১৯৭১)।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

একক ৪ □ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও প্রবন্ধ

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা ঃ গল্প
৪.২ গল্প পাঠ ও আলোচনা
৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি
৪.৪ প্রস্তাবনা ঃ প্রবন্ধ
৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা
৪.৬ অনুশীলনী
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

"গল্পগুচ্ছ আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তাই।"—বুদ্ধদেব বসুর (রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য) এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভুবন আলোকিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের হাতেই রচিত হয়েছিল যথার্থ বাংলা ছোটগল্প। তাঁর আগে ও জাতীয় রচনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হলেও এবিষয়ে সকলেই একমত যে তিনিই বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের স্রষ্টা। প্রধানত সাময়িক পত্র-পত্রিকার তাগিদে তাঁর গল্প লেখা শুরু হয়, যদিও সেই উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে তিনি অসামান্য ছোটগল্পের সায়কে লক্ষ্যভেদ করেন সাহিত্যক্ষেত্রে। তাঁর রচিত জীবনরস নিটোল ছোটগল্পগুলি সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ।

যৌবনে পদ্মার বুকে সঞ্চরমান তরুণ কবিকে যখন মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে জাগিয়ে রাখছিলো তখনই শুরু হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পের ধারা। একই সময়ে লিখিত ছিন্নপত্রের চিঠিতে দেখি তাঁর আত্মকথন—

> "এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।"
>
> (ছিন্নপত্র—৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩)

এই পর্বে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে যেন সঞ্চিত আছে কবিহৃদয়ের সেই সুখানুভূতি যা বাস্তব প্রেক্ষিতে স্থাপিত হয়ে অনন্য রসমাধুরী লাভ করেছে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ রবীন্দ্র ছোটগল্পসমূহকে সাতটি বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—সূচনাপর্ব, হিতবাদীপর্ব, সাধনা-ভারতীপর্ব, সন্ধিপর্ব, সবুজপত্রপর্ব, লিপিকাপর্ব ও অন্ত্যপর্ব।

প্রথম পর্বের গল্পের সঙ্গে অন্ত্যপর্বের গল্পের রচনারীতিতে অনেক পার্থক্য দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে মানব মনস্তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ণ রূপে তাঁর গল্পগুলি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবাহী। সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আমরাও সহমত যে—

> "তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ছোটগল্পের মতো একাধারে, একই কাঠামোর মধ্যে, কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রসৃষ্টি, নাটকীয়তা ও কবিত্ব, সমাজস্বদেশ ও বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য বেদনার এমন অপূর্ব

উদ্‌ঘাটন এবং মানবমনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণ বাংলাসাহিত্যে অন্যত্র দূরের কথা, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরল।"

(অজিত দত্ত—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প')

৪.২ গল্পপাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণি' ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি গল্পরচনার প্রথম প্রয়াস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ একে ছোটগল্পের যথোচিত মূল্য দিতে অস্বীকার করেন, তাই গল্পগুচ্ছে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প—'ঘাটের কথা'। ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকরা অনেকেই এটিকে ছোটগল্পের পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে গল্পচিত্র বা গল্পাভাস বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে প্রাচীন এক ভাঙা ঘাটের রূপকে জীবনের সুখদুঃখময় কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কবির অনুভব ও গল্পকারের জীবনমুখী দৃষ্টি সমন্বিত হয়ে নিটোল একটি ছোটগল্পরূপে 'ঘাটের কথা' বাণীমূর্তি লাভ করেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাট যেন প্রাচীন কোনো কথক—যে শুনিয়ে চলেছে সুখ-দুঃখ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িত অনেক পুরোনো কথা। সেই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই কুসুম নামের মেয়েটিকে, দেখতে পাই নবীনকান্তি সন্ন্যাসীকে। গল্পের সমাপ্তিতে জেগে থাকে একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ—গল্পটি লীরিক ব্যঞ্জনায় মধুর হয়ে ওঠে।

সূচনাপর্বের অন্য গল্প—'রাজপথের কথা'। প্রথম দুটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ আত্মকথনরীতি ব্যবহার করেছেন। দুটিতেই আছে পথের কথা—প্রথমটিতে ঘাটের বর্ণনায় পায়ে চলার পথ এবং দ্বিতীয়টিতে রাজপথের বর্ণনায় পথিক মানুষের চলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। এ গল্পটি আদিতে বিচিত্রপ্রবন্ধে সংকলিত হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'রাজপথ'। শেষে অবশ্য কবি স্বয়ং একে গল্প অভিধা দান করেছেন।

দুটি রচনা ঘাটের কথা ও রাজপথের কথার প্রায় সাত বছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। এই পর্বে দেনাপাওনা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, পোস্টমাস্টার, ব্যবধান ও গিন্নি গল্প রচিত হয়েছিল। এই সময় ছিল রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহ পর্ব—যখন বোটে করে পদ্মার বুকে ভাসমান অবস্থায় তিনি গ্রামবাংলার জীবনের মুখ দেখেছেন। পোটমাস্টার গল্পে তার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। এই গল্পের বীজ ছিন্নপত্রে চিঠিতে প্রচ্ছন্ন আছে। সাহজাদপুরের এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সেসময় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে ভেবেই পোস্টমাস্টার গল্পটির সূচনা। অবশ্য এর বিস্তার ও পরিণতির ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনাই ছিল প্রধান।

'দেনাপাওনা' গল্পটি বাংলায় বধূনির্যাতন ও পণপ্রথা সম্পর্কিত নিষ্ঠুর বেদনাকরুণ কাহিনীর নিপুণ চিত্রায়ণ।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত সাধনা-ভারতী পর্ব। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' দিয়ে এই পর্বের শুরু। আবার এই গল্পেই প্রথম প্রমত্তা পদ্মানদীর আবির্ভাব ঘটলো রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে। শিলাইদহে বোটে সঞ্চরমান কবির কাছ পদ্মা যে একটি বিশেষ ভূমিকায় প্রবহমান, তা তাঁর সাহিত্যে বারেবারে নানাভাবে প্রভাব রেখে গেছে। এই গল্পে পদ্মা যেন মৃত্যুরূপা—সমালোচক এই মন্তব্য করে পদ্মার জলরাশির মধ্যে খোকাবাবুর হারিয়ে যাওয়াকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই গল্পে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ও অন্তর্লোকের জটিলতা মিশে গেছে। এর মধ্যে লেখকের সত্যদৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন না হয়ে তা যেন বাস্তবের অনুলিখন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে বাস্তব নির্মম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের লীরিকধর্মী গল্পের পাশাপাশি এই গল্পটিতে নিষ্ঠুরতার এক বীভৎস ছবি লক্ষ্য করা যায়। যখের ধন-এর লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এ গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। কিন্তু নির্মম প্রথার বর্ণনা ছাড়িয়ে গল্পটি অসামান্য ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে ছোটগল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষিত নাগরিক সাহিত্য পাঠকের কাছে পল্লীজীবনের এই চিত্র, এই গ্রামীণ সংস্কার অজানা ছিল। জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথকে যখন পল্লী প্রকৃতি ও সমাজের কাছাকাছি যেতে হলো—তখনই তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবনদৃষ্টি দিয়ে তিনি পল্লীজীবনের দুঃখসুখ আনন্দবেদনার ছবিকে প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রকম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে, কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ, রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে"

গল্পগুচ্ছের অন্যতম গল্প 'দালিয়া'-তে ইতিহাসের ভগ্ন এক টুকরো থেকে এমনই গল্পাভাস খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহসুজার ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী সূত্রে মোগল হারেম থেকে আরাকান রাজপরিবার পর্যন্ত পটভূমিতে বিস্তৃত এই গল্পে আছে এক মধুর প্রেমকথা, যা পাঠককে নাটকীয় চমৎকারিত্বে মুগ্ধ করে রাখে।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুরাশা' গল্পের পটভূমি-ও ঐতিহাসিক। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গল্পে মাত্র চারদশক পূর্বের ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট বর্ণিত। বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর জীবনকথায় দেখি রোম্যান্সের কল্পলোককে ভেঙে দিয়েছে নির্মম জীবনসত্য। আচারধর্ম, সংস্কার ও হৃদয়ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতময় এমন ট্র্যাজেডি সাহিত্যে অল্পই দেখা যায়।

এই পর্যায়ে রচিত প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প-কঙ্কাল। ব্যক্তিগত বাল্য-স্মৃতির অনুষঙ্গে রচিত গল্পটি আসলে এক প্রেমবঞ্চিতা নারীর জটিল মনস্তত্ত্বের কাহিনী। বক্তা-শ্রোতা রীতিতে পরিবেশিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ঘরে ছিল এক কঙ্কাল, সেটির সাহায্যে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা অস্থিবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। বহুকাল পরে ঘটনাচক্রে সেই ঘরে শয়ন করতে এসে তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলার কঙ্কালটির কথা। সেই প্রসঙ্গে বর্তমান গল্পে একটি অনস্তিত্বের অস্তিত্ব ঘটে, মনে হয় হারানো কঙ্কালের খোঁজে একটি রমণীর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এক অতৃপ্ত নারীর উদগ্র প্রেমবাসনা ও ব্যর্থ বসন্তের শোচনীয় মর্মান্তিক পরিণতি গল্পটিকে ঘিরে রাখে।

"জীবিত ও মৃত" গল্পটি অতিপ্রাকৃত নয় কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিকও নয়। সম্মোহিত, স্বপ্নাচ্ছন্ন ও নিদ্রাজাগর অবস্থায় মানুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয় সত্তা এই গল্পের উৎস। এ সম্বন্ধে নিজেই একবার বলেছিলেন কোনো এক গভীররাত্রে একাকী সঞ্চরমান অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল "যেন এ আমি আমি নই। যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে।"

এই বোধ থেকেই তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি উৎসারিত হয়েছে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের নায়িকা কাদম্বিনীকে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন "বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিঃসঙ্গ মানুষ"। এই পর্বের বিচিত্র গল্পসম্ভারের মধ্যে নানা রসের বিভিন্ন গল্পাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্কাল, নিশীথের মত অতিপ্রাকৃত রসাশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পাশাপাশি একরাত্রির মত গীতিধর্মী প্রেমের কাহিনী, প্রকৃতি লালিত সুভা তারাপদ ও ফটিকের সাক্ষাৎ যেমন মেলে—তেমনি নিখিল পিতৃহৃদয়ের অনুভবঋদ্ধ কাবুলিওয়ালা, জীবনরসনিটোল মধ্যবর্তিনী, রহস্য কুহেলি আলো আঁধারি ক্ষুধিত পাষাণ, সামাজিক ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব জটিল 'অনধিকার প্রবেশ', রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জীবনের হাসিকান্নার 'মেঘ ও রৌদ্র', নির্মম সমাজসত্য—শাস্তি, অথবা 'বিচারক', ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দগ্ধ প্রেমের প্রতীক 'মহামায়া' কিংবা গভীর জীবনদ্বন্দ্বের অসামান্য রূপায়ণ 'নষ্টনীড়'-এরও দেখা পাই।

বিভিন্ন বিষয়ক এই গল্পগুলির সাধারণ ধর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন। বিষয়ের একমুখিনতা, ঘটনাবাহুল্যের অভাব, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণামের অতৃপ্তিজনিত জিজ্ঞাসাচিহ্নিত উপসংহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। একটি ক্ষণমুহূর্তে অনন্তের ব্যঞ্জনা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবনসত্যের চকিত উদ্ভাসন রবীন্দ্রছোটগল্পের লক্ষণ। তাঁর গল্পে ঘটনার চেয়ে অনুভবই প্রধান। অনেকসময়ই সমগ্র কাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে বিশেষ একটি ভাবের উপর।

এই প্রসঙ্গে 'সাধনায়' প্রকাশিত 'একরাত্রি' গল্পটির কথা মনে আসে—যেখানে একটি অনুভূতির দ্বিধা থরোথরো চূড়ে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র গল্প প্রতিমা। সুগভীর প্রেমানুভবের অনুচ্চারিত উচ্চারণে গল্পটি হয়ে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের মত সকরুণ, অশ্রুবিন্দুর মত নিটোল। আবার কাবুলিওয়ালা গল্পে ধরা পড়েছে নিখিল পিতৃহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের করুণমাধুরী।

গল্পগুচ্ছের এই পর্বের উপাদান যদিও মূলত বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও মানব সমাজ—তবু বিষয় অনুসারে এগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

ত্যাগ, মহামায়া, অনধিকার প্রবেশ, প্রায়শ্চিত্ত, দুরাশা প্রভৃতি গল্পে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের কথা আলোচিত। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, স্বর্ণমৃগ, দানপ্রতিদান, প্রতিহিংসা-তে অর্থসম্পত্তির প্রতি আসক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আবার মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, মানভঞ্জন, নষ্টনীড়, ত্যাগ, মাল্যদান, একরাত্রি, দুরাশাতে দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্রেমানুভবের চিত্রণ দেখতে পাই। মানবহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দিদি, আপদ প্রভৃতি গল্পে। কঙ্কাল, নিশীথে, মণিহারা ও ক্ষুধিত পাষাণে অতিলৌকিক পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে।

শাস্তি, সম্পত্তি সমর্পণ, পুত্রযজ্ঞ গল্পে দেখি নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যরূপ। সুভা ও অতিথি গল্পে দেখেছি প্রকৃতিমগ্ন চরিত্রায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রসঙ্গে 'লীরিকধর্মী, বিশেষণটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাঁর কবি পরিচয়ের প্রভাব তাঁর বহু গল্পে পড়েছে একথা সত্য—কিন্তু রবীন্দ্র গল্পে বাস্তব দৃষ্টির যথাযথ প্রয়োগও দেখা গেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—তাঁর ছোটগল্প তার থেকে একেবারেই মুক্ত তত্ত্ববিনির্মুক্ত বাস্তব সমাজচিত্র এখানে উপস্থিত। উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি নাগরিক বৈদগ্ধ্যময় তিনিই গল্পগুচ্ছে নেমে এসেছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সোনারতরী পর্বে মানুষ ও প্রকৃতির একেবারে অন্তরঙ্গ সখ্যতায় এসেছেন তিনি। ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছে সেই মর্ত্যধূলির স্পর্শ লেগে আছে। এমনকি তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পও বাস্তব ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "সমগ্র গল্পগুচ্ছ পড়ে উঠলে আমাদের মনকে প্রবলভাবে এই কথাটিই আঘাত করে যে এর বেশির ভাগ গল্প আক্ষরিক অর্থে বাস্তব, সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায় এখানে।"

এই প্রসঙ্গে 'শাস্তি' গল্পটির কথা মনে আসবে। এখানে প্রমত্তা পদ্মার ভীষণ রূপটি আবার দেখা যায়। পল্লী অঞ্চলের বর্ষাকালের ছবি এ গল্পে দেখি। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে
তার পাশ দিয়ে তেতে গা কেমন করে"

নগরজীবনে প্রতিপালিত রবীন্দ্রনাথের শিলাহদহ পূর্বে পল্লীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি নিজেই লিখছেন—

"পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার জন্য কিছু করবো এই
আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল।"

এরই ফলশ্রুতির সাহিত্যিক প্রকাশ এই পর্বে লিখিত গল্পগুলি যেখানে পল্লীজীবন তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বাস্তবমৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'শাস্তি' গল্পে ভূমিহীন দীনদরিদ্র কুরি পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদামের জীবনের একটি দিনের একটি ঘটনার ভিত্তিতে যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার মধ্যে আর্থসামাজিক বঞ্চনা ও জীবনের বিচিত্র রহস্য উদঘাটিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিধর্মি কল্পনা প্রাবল্য গল্পভূমিকে সিক্ত করেন—এমন অভিযোগের উত্তরে 'শাস্তি' গল্পের নির্মম বাস্তব চিত্রণকে তুলে ধরা যায় যেখানে মেঘের মিনারের কল্পলোকের কুয়াশা নয়, বজ্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তা চন্দরার শাস্তিই কি গল্পের নামকরণে প্রকাশ পেয়েছে? প্রকৃতপক্ষে এ শাস্তি যত না চন্দরার—তার চেয়েও বেশি ছিদামের। দাদাকে হত্যাপরাধ থেকে বাঁচাবার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে যে তাৎক্ষণিক ভুল ছিদাম করেছিল, তারই শাস্তি তাকে আমৃত্যু বহন করতে হবে। এখানেই 'শাস্তি' নামকরণ খুজে পেয়েছে তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা। চন্দরার শেষ উক্তি 'মরণ' শুধু চন্দরার অপমানিত লাঞ্ছিত মানবীসত্তার মৃত্যুই নয়, বেঁচে থেকেও মরণাহত ছিদামের অনন্ত শাস্তি ভোগের ব্যঞ্জনা বহন করে। ছোট প্রাণের ছোট ছোট ব্যথাবেদনার এমন নিটোল কাহিনী রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আছে, যার মধ্যে ধরা পড়েছে পল্লীবাংলার আবহমান বাস্তব।

এই বাস্তবের সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির সুনিবিড় যোগের পরিচয় বহন করে সুভাষ অতিথি, ছুটি, পোস্টমাস্টারের মত অনন্য গল্পগুলি। এই গল্পগুলিতে বাংলার সজল স্নিগ্ধ প্রকৃতি যেন প্রেক্ষাপট রচিত করেছে। সুভা, তারাপদ ও ফটিক যেন গল্প তিনটির প্রধান চরিত্রই কেবল নয়, মর্ত্যমৃত্তিকাজাত শ্যামলিমা দিয়ে ঘেরা তিনটি সত্তা, যারা নাগরিক বন্ধন বা শৃঙ্খল থেকে মুক্তি কামনা করেছে। মূক সুভার সুগভীর বেদনা প্রকৃতির করুণ বিষাদে যেন মিশে গেছে। তার গোপন ব্যথা, অন্তর্লীন বেদনা, হৃদয়রহস্যের তরঙ্গাভিঘাত প্রকৃতির লীলায় যেন আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বালক ফটিক তার সজীব প্রাণের চাঞ্চল্য নিয়ে পল্লীপ্রকৃতিতে যে মুক্তির অবাধ স্বাধীনতায় ছিল আনন্দঘন, শহর কলকাতার কঠিন প্রাচীরের বন্ধ গৃহে সে বন্দীবিহঙ্গের মতই কাতর অসহায়। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা তার কাছে মৃত্যুরই অন্য নাম। আবার 'অতিথি' গল্পের তারাপদ যেন নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্ত স্বাধীনসত্তা। তার স্বভাবেই আছে অনাসক্তির বীজ তাই কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। ক্ষণকালীন উপস্থিতিতে সে মনোহরণ করেন সকলের, কিন্তু ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে সে চলে যায় সুখী গৃহকোণ ছেড়ে অনন্তের উদারতায়। এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে।

'সমাপ্তি' গল্পেও কিশোরী নায়িকা মৃন্ময়ী প্রকৃতির মুক্তি থেকে ধরা পড়ে গৃহের বন্ধনে। এখানে রমণী হৃদয়ের চির রহস্য আভাসিত। এ যেন আকাশের পাখির গৃহকোণে ধরা দেওয়ার ব্যঞ্জনা। মৃন্ময়ীর বাল্যজীবনের সমাপ্তিতেই এই গল্প এক মধুর উপহারে সমাপ্ত হয়েছে। এই গল্পের বীজ সুপ্ত ছিল ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে—যেখানে নদীর ঘাটে দেখা এক বালিকার দীপ্ত লাবণ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর গল্পের নায়িকাকে। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পগুলি রচিত হয়েছিল।

এই পর্বেই রচিত হয়েছে অনন্য প্রেমের গল্প 'একরাত্রি'র যেখানে অনুচ্চারিত প্রেমানুভব স্নিগ্ধ সুরভির মত, বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে আছে। একটি অনুভূতির শীর্ষে স্তম্ভিত এই গল্পটি গদ্যে রচিত অনন্য লীরিক যা কবিতার মতই মৃদু-কোমল, একটি মুহূর্তের অনন্ত প্রতিমা।

এই প্রসঙ্গে 'পোস্টমস্টার' গল্পের প্রকৃতিমগ্নতার কথা আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে। হিতবাদী-তে প্রকাশিত এইগল্পে পল্লীবাংলার সজল প্রেক্ষাপটে দেখা গেল স্নিগ্ধ করুণ এক বালিকা মূর্তি প্রস্ফুটিত পুষ্প কলিকার মতই বাল্য-কৈশোরের সন্ধিলগ্নের পল্লীবালা—রতন। গল্পটিকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্কমূলক কাহিনী অথবা মানবজীবনের অন্তর্লোকের নিগূঢ় রহস্যলীলার কাহিনী বলা যায় কিনা এ সম্ভবন্ধে বিতর্ক উঠতে পারে। তবে পোস্টমাস্টার ও রতনের বিচিত্র অনুরাগসিক্ত সম্পর্ককে অনেকেই প্রকৃতির প্রেমের সঙ্গে উপমিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি সমমরণ করা যায়—

> "পোস্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রকৃতির প্রেমের মতই, বসন্তের ফুলকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায়—এই গল্পের পরিণামও তাই। প্রকৃতির উদ্দাম বিষণ্ণতার মধ্যেই ছোট জীবননাট্যটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।"

সাধনা পর্বে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও শশিভূষণ ও গিরিবালার সম্পর্কে এমন এক মিশ্র অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেছেন। পোস্টমাস্টারে বালিকা রতনের বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারি হৃদয়ানুভূতি ছিল গল্পের মূল থিম। মেঘ ও রৌদ্রে শশিভূষণ-গিরিবালার হৃদয়ানুভবের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মিলে এক অন্যতর মাত্রা দান করেছে।

এই পর্বের ত্যাগ ও মহামায়া গল্পে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও প্রেমের এক রহস্য কুহেলির ছায়াপাত দেখি। 'ত্যাগ' গল্পে সমাজ ও সংস্কারের প্রশ্নে দোলাচল নায়ক হেমন্তর জীবনে শেষ পর্যন্ত প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতিই সত্য হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথার ওপর প্রেমকে জয়ী করেন। এই ভাবটি তাঁর বিভিন্ন নাটকেও পরিণততর রূপে প্রকাশিত হতে দেখেছি।

মহামায়া এক আশ্চর্য কাহিনী। কৌলীনপ্রথাও সতীদাহের নির্মম ঘটনা এর প্রেক্ষাপট। তারই কাঠামোর উপর রচিত কাহিনীসৌধে বিচিত্র প্রেমের এক গল্প—আশ্চর্য নারী ব্যক্তিত্ব মহামায়া যেখানে কেন্দ্র বিন্দু। "মহামায়ার প্রেম তার নারীজীবনের স্বভাবফসল, কিন্তু সে প্রেমও তার ব্যক্তিত্ব গৌরব তথা অহমিকা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত! এ গল্পে লেখক ব্যক্তিত্বকে মুখ্য করে তুলেছেন। হৃদয় স্বাতন্ত্র্যের জন্যই যে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করেছে, ভালোবাসাকে স্বীকার বা অমান্য করেছে—" অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের এই মন্তব্যের আলোকে মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় এই ব্যক্তিত্বাচিহ্নিত আত্মবিনাশী প্রেমের গল্পে পরিস্ফুট হতে দেখি।

সাধনা পর্বের আর একটি অনবদ্য ছোটগল্প—মধ্যবর্তিনী, যার সঙ্গে ঘটনা অনুষঙ্গে আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে—নিশীথে। অবশ্য নিশীথে কিছুটা অন্য ধরনের অতিপ্রাকৃত প্রেক্ষিতে স্থাপিত অনবদ্য মনস্তাত্ত্বক গল্প। 'মধ্যবর্তিনী'-তেও মনস্তত্ত্বের জটিল জাল আছে। নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবনে অসুস্থ স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুরোধ জানাচ্ছে দুটি ক্ষেত্রে। দুটি গল্পের পরিণতি অবশ্য ভিন্নতর। মধ্যবর্তিনী-তে দ্বিতীয়া পত্নী শৈলর মৃত্যুর পর স্বামীস্ত্রীর মধ্যবর্তিনী হয়েই সে বেঁচে রইল—অনস্তিত্ব অস্তিত্বের অসামান্য প্রয়োগ। 'নিশীথে' গল্পের আবহাওয়ায় রহস্যের আভাস। এখানে প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর নায়ক দক্ষিণাচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমকে নিয়ে দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত। বহিরঙ্গে এক অশরীরী পরিমণ্ডল তৈরি হলেও অন্তরঙ্গে সঞ্চিত আছে নায়কের অপরাধবোধ। অসামান্য মনস্তাত্ত্বক বিশ্লেষণে গল্পটি রহস্যকাহিনীর শিহরণকে মনে করায়।

সাধনায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও ভারতীতে প্রকাশিত 'মণিহারা'—রহস্যকুহেলি ও অলৌকিক কাহিনীর অনবদ্য বাণীরূপ। রবীন্দ্রনাথের কথক-শ্রোতা রীতির পরিচিত ভঙ্গী দুটি গল্পেই ব্যবহৃত—যেমন নিশীথে বা কঙ্কাল গল্পেও দেখা গেছে।

সাধনায় প্রকাশিত 'বিচারক' গল্পটি 'বিচারক' গল্পটি নানাকারণেই স্মরণীয়। পতিতা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মনোলোকের গভীর গহনে আলো ফেলেছেন, যার ফলে কলঙ্কিনী পতিতা ক্ষীরোদা

স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিচারক মোহিতমোহন এই ঘৃণিতা পতিতা নারীর মধ্যে আষ্কিার করেছেন তাঁর যৌবনের প্রেমিকা হেমশশীকে। এই দর্শন যেন আত্মদর্শন-প্রেমের অনন্য উপলব্ধি। এর শেষাংশের নাটকীয় চমক উদ্যত ফণা সর্পের মত দংশন করে নায়ককে এবং পাঠককেও।

ভারতী পর্বের শেষদিকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'নষ্টনীড়'। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের অসামন্য বিশ্লেষণী শক্তি ও জীবনের রহস্যগভীর অতলান্তে ডুব দিয়ে চরিত্রের আঁতের কথা বার করার অসামান্য প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। এ গল্পের প্রকরণ বিচারে সমালোচকের মধ্যে বিতর্ক আছে। ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই কাহিনী ভারতী পত্রিকায় দীর্ঘ আটমাস ধরে ধাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। আয়তনের বিচারে এটি উপন্যাসের সমান, মালঞ্চ বা দুই বোনের চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের ছোট গল্প সংকলনেই একে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীতে কিছু ঘটনাবাহুল্য ও অতিরিক্ত চরিত্র থাকলেও ভাবের একমুখিনতাই এর প্রধান বিয়য়। আয়তনে উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকলেও সূক্ষ্ম মনস্তত্বের সংযত ও সংহত প্রকাশে এটি ছোটগল্পের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে।

'সবুজপত্র' পর্বের গল্পগুলি রবীন্দ্রগল্পধারায় অনন্য সংযোজন। শিলাইদহ পর্বে সোনারতরীর যুগে যে গল্প তিনি লিখেছেন—স্পষ্টতই তার সঙ্গে এই পর্বের গল্পগুলির পার্থক্য আছে। কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক নতুন ধরনের মননশীল দীপ্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস এই গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীরপত্র, ভাঁই ফোঁটা, অপরিচিতা ও পয়লা নম্বর—এই পর্বের অসামান্য রচনা। প্রথার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব এবং নারীর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে এই গল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ সবুজপত্রের পৃষ্ঠায়—যেখানে নারী ব্যক্তিত্বের অসামান্য চমকপ্রদ উদ্ভাসন নায়িকা দামিনী চরিত্রে দেখা গেছে। হৈমন্তী, স্ত্রীরপত্র, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর—গল্পগুলিতে নারীর আত্মউন্মোচন ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বের বোষ্টমী গল্পের নামচরিত্রও আপন ব্যক্তিত্বে সমজ্জ্বল। আত্মদর্শনের আলোতে তার চরিত্রের দীপ্তি পেয়েছে ট্রাজিক মহিমা। এই গল্পগুলি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> "আসলে জীবনের রূপরচনা নয়, জীবনের ভাষ্য-রচনাই সুবজপত্র পর্বের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ"
>
> (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ ঃ তপোব্রত ঘোষ)

স্ত্রীরপত্র' গল্পে পত্রাঙ্গিকে কাহিনী বিন্যস্ত। মৃণাল তার পনেরো বছরের আপাত সুখী বিবাহিত জীবন থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে চেয়েছে। স্বামীর শ্রীচরণকমল থেকে নিজেকে সে মুক্ত করেছে। গল্পের শুরু শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "চরণাতলাশ্রয় ছিন্ন" মৃণাল পাঠে। এই পদাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল কিন্তু ভুলুণ্ঠিতা হয়নি, অসীম সমুদ্রের তীরে অনন্ত নীলাকাশের উদারতায় সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

দাম্পত্যজীবনের সত্য আবিষ্কার এভাবেই 'পয়লা নম্বর' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এযুগের গল্পে দেখেছি নারীমুক্তির সমাজতত্ত্ব। তা কখনো সোচ্চার প্রতিবাদে, কখনো বা আভ্যন্তর প্রতিরোধে আত্মপ্রকাশ করেছে। পয়লা নম্ভবরের নায়িকা অনিলার অন্তরের অতৃপ্তি বিদ্রোহে রূপে নিয়েছে। এ বিদ্রোহ পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অন্তরমহলে ঘটে গেছে। তার আত্ম উদ্বোধনই বিদ্রোহ—গৃহত্যাগ তার বাইরের ঘটনাগত রূপমাত্র। স্ত্রীরপত্রের মৃণাল তার নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঘর ছেড়েছিল, বোষ্টমী আনন্দী ঘর ছেড়েছে সত্য অন্বেষণের আশায়। এভাবেই এই পর্বের নায়িকারা জীবনের সত্য দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে—খুঁজে পেয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়।

রবীন্দ্র জীবনের অন্ত্যপর্বের উজ্জ্বল ফসল 'তিনসঙ্গী'—রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবোরেটরী নামের তিনটি অনন্য ছোটগল্প। এই পর্বে রবীন্দ্রছোটগল্প আশ্চর্য আধুনিক হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ ঝলসিত বিদ্যুতের মতই দীপ্ত ভাষা—যাকে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন স্ট্রীমলাইন ভাষা"। অন্তরধর্মেও একান্ত আধুনিক তিনসঙ্গীর গল্পত্রয়ী। নারীপুরুষ সম্পর্কে নবরূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের রচনায় সুস্পষ্ট। পুরুষে সৃষ্টিকার্যে

নারীস্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্যকে তিনি বিশেষ মূল্যদান করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার অন্তরালে রবীন্দ্র মনোধর্মের সনাতনী ঐতিহ্য এতে ছায়া ফেলেছে। তিনটি গল্পেই ত্রিবিধ বিন্যাসে এই অন্তর্লীন সুরটি শোনা যায়। সেইসঙ্গে গল্পভাষাতে হীরকদ্যুতি ঝলসিত।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পরিক্রমায় সূচনা পর্ব থেকে অনত্যপর্বে উপনীত হয়ে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক হই। বাংলাদেশের বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার হৃৎস্পন্দন যেন শুনতে পাই। প্রকৃতি ও মানুষ সমন্বিত হয়ে বিচিত্ররূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নরনারীর প্রণয়, বাসনা-বেদনা, প্রাচীন লোক বিশ্বাস থেকে আধুনিক বিজ্ঞান চেতনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে সামাজিক বিপ্লব, সনাতনী ঐতিহ্য থেকে বিশশতকের আধুনিকতা, প্রথানুগত্য থেকে সংস্কার মুক্তি, আবেগ থেকে মননশীলতাকে বাণীমূর্তি দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে।

গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত না হলেও 'লিপিকা'র কথিকাগুলিকে অনেকেই গল্প নাম দিতে চান। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কুড়িটি রচনার মধ্যে আছে গল্পাভাস। প্রথম চোদ্দটি রচনা অবশ্য আন্তরধর্মে ছুঁয়ে আছে কবিতাকেই—রবীন্দ্র জীবনের প্রথম পর্বে রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র ভাব ও ভাষা তাকে অনুভূতির হীরক দ্যুতিতে বর্ণিল করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আলোচনায় আমরা তাঁর কবিসত্তার প্রক্ষেপকে স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প অন্তরধর্মে লীরিককেই ছুঁয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিমনের স্পর্শ ও প্রতিবিম্বনে ছোটগল্প এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। একটি মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখার প্রয়াস ছোটগল্পে দেখি, ঠিক যেমনটি দেখি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে।

রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী ছোটগল্পের উৎস। বিস্ময়, কল্পনা ও জীবনবোধের গভীরতর ব্যঞ্জনা দানই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। তাই ছোটগল্পের চলনটা গদ্যের হলেও তার চালটা কবিতার। তার মেজাজের সঙ্গে লীরিকের মিল আছে। এজন্যই শ্রেষ্ঠ লীরিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর ছোটগল্পে অনুগ্র গভীরবোধ ও আত্মিক জিজ্ঞাসার প্রতিফলন দেখি। এই বৈশিষ্ট্য মনে করায় বিশ্বসাহিত্যের অনন্য ছোটগল্প শিল্পী রুশ লেখক আন্তন চেকভকে। তাঁর সূক্ষ্মকাজ রুচিশীল পাঠকের অনুভূতি প্রবণতাকে স্পর্শ করে। প্রবৃত্তির উগ্রতা একটা আপাত শান্ত গভীর রূপের মধ্যে যেন আত্মস্থ। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পৃথিবীও মৃদু শান্ত। তাঁর লেকার প্রশান্তি, লীরিক আভাস সূক্ষ্ম কারুকার্য ও মনের অতলান্ত গভীরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা পাঠককে চেকভের কথা মনে করায়।

সাধারণ দুঃখ, তুচ্ছ ক্ষণমুহূর্তের বেদনা, প্রাত্যহিক জীবনের শূন্যতাও যে সার্থক ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে, এই সত্য দেখেছি চেকভের গল্পে—রবীন্দ্রনাথেও। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির মুক্তি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটপ্রাণের দুঃখকথার জীবনরসসিঞ্চিত নিটোল ছোটগল্প লিখেছেন। নাতিদীর্ঘ আয়তন, স্বল্পসংখ্যক চরিত্র, একটি তাৎপর্যময় অংশের বা নিবিড় ভাবানুভূতির রূপায়ণ, ইঙ্গিতময় রহস্যময়তা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবসত্যের চকিত উদ্ভাসন—রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর প্রথম দিকের সাধনা-ভারতী পর্বের গল্পে দেখেছি আনন্দ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে আত্মস্থ ভাবমধর্মী রূপায়ণ।

সবুজপত্র পর্ব বা অন্ত্যপর্বের গল্পগুলি শিল্পরূপের বিচারে অধিকতর পরিণত, কিন্তু অনুভবের দ্যোতনায় প্রথম পর্বের গল্পগুলি আরো গভীর, অতলান্ত রহস্যবহী,—যেখানে গল্পের উপসংহার পাঠকচিত্তে এক গভীর জীবন উপলব্ধির জগৎকে উদঘাটিত করে, পরিণতিহীন করুণতার ছবি যেন অনন্তবিষাদকে স্পর্শ করে। 'একরাত্রি' গল্পটি এর অনবদ্য নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাই গভীরতর ব্যঞ্জনায় হৃদয়কে প্রকাশ করে, নাটকীয় সমাপ্তির চেয়ে মৃদু রস সঞ্চার করে পাঠককে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে, অনন্তকে ছুঁয়ে যায়।

এখানেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পরিচয়।

৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
ভিখারিণি	ভারতী	শ্রাবণ, ১২৪৭
করুণা	”	আশ্বিন, ১২৮৪
ঘাটের কথা	”	কার্তিক, ১২৮৯
রাজপথের কথা	নবজীবন	অগ্রহায়ণ, ১২৯১
মুকুট	বালক	বৈশাখ, ১২৯২
দেনাপাওনা	হিতবাদী	১২৯৮
পোস্টমাস্টার	”	”
গিন্নি	”	”
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	”	”
ব্যবধান	”	”
তারাপ্রসন্নর কীর্তি	”	”
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১২৯৮
সম্পত্তি সমর্পণ	”	পৌষ, ১২৯৮
দালিয়া	”	মাঘ, ১২৯৮
কঙ্কাল	”	ফাল্গুন, ১২৯৮
মুক্তির উপায়	”	চৈত্র, ১২৯৮
ত্যাগ	”	বৈশাখ, ১২৯৯
একরাত্রি	”	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯
একটা আষাঢ়ে গল্প	”	আষাঢ় ১২৯৯
জীবিত ও মৃত	”	শ্রাবণ, ১২৯৯
স্বর্ণমৃগ	”	ভাদ্র, ১২৯৯
রীতিমত নভেল	”	আশ্বিন, ১২৯৯
জয়পরাজয়	”	কার্তিক, ১২৯৯
কাবুলিওয়ালা	”	অগ্রহায়ণ, ১২৯৯
ছুটি	”	পৌষ, ১২৯৯
সুভা	”	মাঘ, ১২৯৯
মহামায়া	”	ফাল্গুন, ১২৯৯
দানপ্রতিদান	”	চৈত্র, ১২৯৯
সম্পাদক	”	বৈশাখ, ১৩০০
মধ্যবর্তিনা	”	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০
অসম্ভব কথা	”	আষাঢ়, ১৩০০
শাস্তি	”	শ্রাবণ, ১৩০০

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	”	ভাদ্র, ১৩০০
সমাপ্তি	”	আশ্বিন, ১৩০০
অনধিকার প্রবেশ	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	”	আশ্বিন, ১৩০১
সমস্যাপূরণ	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
বিচারক	”	পৌষ, ১৩০১
নিশিথে	”	মাঘ, ১৩০১
আপদ	”	ফাল্গুন, ১৩০১
দিদি	”	চৈত্র, ১৩০১
মানভঞ্জন	”	বৈশাখ, ১৩০২
ঠাকুরদা	”	১৩০২
প্রতিহিংসা	”	”
ক্ষুধিত পাষাণ	”	”
অতিথি	”	”
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী	১৩০২
দুরাশা	ভারতী	১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ	ভারতী	১৩০৫
ডিটেকটিভ	”	”
অধ্যাপক	”	”
রাজটিকা	”	”
মণিহারা	”	”
দৃষ্টিদান	”	”
সদর ও অন্দর	প্রদীপ	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	”	”
ফেল	”	”
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	১৩০৭
নষ্টনীড়	ভারতী	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	”
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	১৩০৯
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	১৩১৪
গুপ্তধন	ভারতী	১৩১৫
রাসমণির ছেলে	”	১৩১৮

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
পণরক্ষা	”	১৩১৮
হালদার গোষ্ঠী	সবুজপত্র	১৩২১
হৈমন্তী	”	”
বোষ্টমী	”	”
স্ত্রীরপত্র	”	১৩২১
ভাইফোঁটা	”	”
শেষের রাত্রি	”	”
অপরিচিতা	”	”
তপস্বিনী	”	১৩২৪
পয়লানম্বর	”	”
পাত্র ও পাত্রী	”	”
নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	১৩৩২
সংস্কার	”	১৩৩৫
বলাই	”	”
চিত্রকর	”	”
চোরাইধন	ছোটগল্প	১৩৪০
রবিবার	আনন্দবাজার	১৩৪৬
শেষকথা	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬
ছোটগল্প	দেশ	১৩৪৬
ল্যাবোরেটরি	আনন্দবাজার	১৩৪৭
বদনাম	প্রবাসী	১৩৪৮
প্রগতিসংহার (পূর্বনাম কাপুরুষ)	আনন্দবাজার	১৩৪৮
শেষ পুরস্কার	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৪৯
মুসলমানীর গল্প	ঋতুপত্র	১৩৬২

৪.৪ প্রস্তাবনা : প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। কবি পরিচয়ের অলোকসামান্য বিভায় তাঁরগ অন্যান্য পরিচয় কিছুটা আচ্ছন্ন হলেও একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে যে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। পরিমাণের বিশালতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যের অজস্রতায় তাঁর প্রবন্ধ আমাদের বিস্মিত করে।

সাধারণ প্রবন্ধ বলতে আমরা বুঝি জ্ঞানগর্ভ গদ্য রচনা যা প্রমামের দ্বারা কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করে, কোনো নতুন বিষয় বা সিদ্ধান্তকে উপস্থাপিত করে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কিন্তু তিনি নিরাসক্ত ভূমিকা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন না। রচনাটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের পরিপূরক। বাংলা প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ রূপকার যে রবীন্দ্রনাথ তা সমালোচকের মন্তব্যে নিশ্চিত ধরা পড়ে।

"প্রবন্ধ যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়— অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি (রবীন্দ্রনাথ) পরতে পরতে প্রবিষ্ঠ হয়ে আছেন। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ-এক কথায় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ"

(রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প : বুদ্ধদেব বসু)

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ তার পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর অএনক আগেই বাংলায় প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়েছিল বটে। কিন্তু সার্থক শিল্পরূপ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের প্রথম যুগের প্রবন্ধের উপকরণ ছিল সামাজিক ও নৈতিক আলোচনার বর্ণনা ও সংবাদ পরিবেশন। প্রায় সমগ্র উনিশ শতকের গদ্যে তথ্য ও তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। গদ্য নিঃসন্দেহে আধুনিক চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশের যোগ্যতম মাধ্যম, বিচার-বিতর্ক-জিজ্ঞাসার ভাষাও গদ্য। রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের হাতে এভাবেই বাংলা প্রবন্ধের স্থায়ীরূপ নির্মিত হল। বাংলা প্রবন্ধ রচনার আদিযুগকে রামমোহন বিদ্যাসাগর যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সদ্যসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই স্থিত হয়েছে বক্তব্য প্রধান, স্পষ্ট, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ছিল তখনকার প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমীযুগের পরেই গদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের পরিমণ্ডল বর্ধিত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন গদ্যে মুদ্রিত করেছিলেন। সেকালের গদ্যের বিষয়প্রাধান্যকে স্বীকার না করে রবীন্দ্রনাথ আত্মভাবমূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, এমনকি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধেও তাঁর আত্মগত ভঙ্গি প্রবল ছিল। তাঁর প্রায় কৈশোরে লিখিত প্রবন্ধেও সংযমী ভাবুকতা ও বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর রচনার এই প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লক্ষ্য করেই মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন— 'বাস্তবিক এত অল্প বয়সে মানসশক্তির (Intellect) এমন জাগরণ কবি জীবনে অতিশয় বিরল"

রবীন্দ্র প্রবন্ধে এই পরিণত মনন ও বিচারশক্তি লক্ষ্য করা যায়। বহিরঙ্গ প্রসাধনা ও অন্তরঙ্গ সাধনায় তাঁর প্রবন্ধ অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেই কেবল নয় তাঁর ব্যক্তিত্বের দিব্যস্পর্শে তাঁর প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠত্বের সীমা স্পর্শ করে।

৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন পনেরো বছর বয়সে এবং তাঁর শেষ প্রবন্ধ রচিত হয় আশি বছর বয়সে। ইং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'জ্ঞানাংকুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম প্রবন্ধ—সমালোচনামূলক গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ম রায়ের 'অবসর সরোজিনী' ও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী'।—এই তিন গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য নিয়ে অনেকটা বঙ্কিমী রীতিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে এই রচনায় কিশোর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরচনাগীতির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সম্পাদক। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্য' ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর নিজের কথায় 'অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে' তিনি এই তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"

কয়েকবছর পরে ভারতীতেই (১৮৮২) 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—ঝানসীর রানী 'বাঙ্গালির আশা ও নৈরাশ্য', বিজনচিন্তা ও সান্ত্বনা।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ভারতীর দ্বিতীয়বর্ষ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর প্রবন্ধ—'সামুদ্রিকজীব ঃ কীটানু' প্রকাশ পায়। পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ তাঁর বিলাতযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মনে হয়। এ দুটি হল 'ইংরেজদিগের আদব কায়দা' ও 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গলোস্যাকশন সাহিত্য'।

ভারতীয় পরবর্তী তিনটি সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের তিন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে প্রেমের বিচিত্র রূপের অণ্বেষণ করেছেন। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ ত্রয়ী হল— 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'প্রিত্রর্কাও লরা' এবং 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'। এই তিনটি প্রবন্ধ একটি অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত বলে মনে হয়।

ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—সেগুলিতে তাঁর বিচিত্রমুখী মননের পরিচয় পাই। এগুলি হল 'নর্ম্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্ম্মান সাহিত্য', 'য়ুরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র', 'চ্যাটার্টন-বালক কবি', 'বাঙ্গালি কবি নয়' এবং 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন?' 'অকারণকষ্ট', নিঃস্বার্থ প্রেম', 'পারিবারিক দাসত্ব'।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল বেথুন সোসাইটির আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাধারণ সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেটি পরে 'ভারতী' পত্রিকায় 'সঙ্গীত ও ভাব' নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ—'জুতাব্যবস্থা' ভারতীয় পৃষ্ঠাতেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। তৎকালীন ইংলিশম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল এই প্রবন্ধটি তারই সাহিত্য পরিণাম। এছাড়া 'চীনে মরণের ব্যবসায়' রচনাটিও ভারতীর আলোচ্য সংখ্যাতেই (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল 'যথার্থ দোসর' নামে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবনার এক প্রবন্ধ যেটি ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্যের বিষাদ বেদনার বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে লিখিত।

আলোচ্য সময়কাল রবীন্দ্র জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে যাপিত কয়েকটি মাসের স্মৃতি তাঁর কাছে অবিস্মরণীয়। তখনই চলেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার পালা। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন—

> "গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখতাম। সেও কোনো
> বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা"

—এই 'যা খুশি' লেখাগুলিই 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এর রচনাকালীন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এসময় তিনি নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছিলেন। এই গদ্য রচনার মধ্যে উল্লখযোগ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার স্ফুরণ ঘটে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ থেকে পরবর্তী পর্যায়ের পরিণত মনস্ক বহু চিন্তামূলক প্রবন্ধের প্রকাশ ঘটেছিল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়।

১৮৭৬ থেকে ১৮৯০ (বঙ্গাব্দ ১২৮৩ থেকে ১২৯৭) সালকে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার প্রথম যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের মধ্যবর্তী সময় থেকেই তাঁর প্রবন্ধের মুদ্রত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মোট ছ'টি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), বিবিধ প্রসঙ্গ (১২৯০ বঙ্গাব্দ), আলোচনা (১২৯২ বঙ্গাব্দ), সমালোচনা (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), চিঠিপত্র (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ও মন্ত্রি অভিষেক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। পত্রাকারে লিখিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (ইং ১৮৮১) রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু ইংরেজি ১৮৮৩তে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

ইং ১৮৯০ পরবর্তী রবীন্দ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে মাত্র তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (প্রথম খণ্ড ১৮৯১), য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (দ্বিতীয়খণ্ড ১৮৯৩) এবং পঞ্চভূত (১৮৯৭)।' শেষোক্তর প্রবন্ধগুলি 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে নিয়ে বিচিত্র আলাপ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গাজীপুর থেকে ফেরার পরে মেজদাদা সতেন্দ্রনাথের বাড়িতে যে সাহিত্যিক আসর বসতো, রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের নানা মন্তব্য ও বাদ প্রতিবাদ 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে আলোচনা খাতায় লিখে রাখতেন। এটিই পরে 'পঞ্চভূতের ডায়েরি'তে পরিণতি লাভ করেছে।

পঞ্চভূতের আড়ালে সজীব উপস্থিতি অনুমান করেছেন বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে 'পঞ্চভূতে'র এক একটি ভূত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। এই অভিনব প্রবন্ধ গ্রন্থে একাধারে মিলেছে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের সমস্যা— সম্ভাবনার রূপায়ণ এবং ভাষাভঙ্গির মাধুর্য। বিষয়ের অভিনবত্বে ও গদ্যরীতির অসাধারণত্বে এই গ্রন্থ শুধু রবীন্দ্রসাহিতেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এই গ্রন্থ আমেরিকান লেখক ওয়েনডেল্ হোমসের 'পোয়েট এ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল্' গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র, আসলে আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা ও অসামান্য বিচারশক্তির সমন্বয়ে 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে।

বিশশতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার তৃতীয় পর্ব। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের একটিই প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল—'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম'। এরপর সাময়িক বিরতির পর ১৯০৫-এ 'আত্মশক্তি' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৬-এ প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সাতখানি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়— বিহচিত্রপ্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, ব্যঙ্গকৌতুক, আধুনিক সাহিত্য।

গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগরূপে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অসামান্য নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকাতে মন্তব্য করেছেন—

> "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য
> থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা রস সম্ভেভাগে।"

কবিমনের মাধুরী মেশানো এই প্রবন্ধের রচনাভঙ্গীর স্বাদুসরসতা এর বৈশিষ্ট্য। লীরিকের সঙ্গে এই রচনাগুলির এক অন্তর্লীন সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। প্রবন্ধের আকারে লিখিত এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবি মনের স্পর্শ পাই।

'চারিত্রপূজা'-র সব রচনাই স্বতন্ত্রভাবে 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'ভারতপথিক রামমেহন রায়' ও 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। জীবনী প্রবন্ধের ধারায় এই প্রবন্ধত্রয়ী উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'প্রাচীনসাহিত্য' সমালোচনা ধারায় এক অনন্য নিদর্শন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যের অতীতাশ্রয়ী রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি এই সাহিত্যলোচনায় ধরা পড়েছে। প্রাচীন ভারতের চিররহস্যময় সৌন্দর্যপুরীতে প্রবেশের চাবিকাঠি যেন এই গ্রন্থ। 'লোকসাহিত্য' বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে। লোকসাহিত্যের যে সাহিত্যমূল্য ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে, তা রবীন্দ্রনাথই এ গ্রন্থের আলোচনায় প্রথম তুলে ধরেন। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন এই গ্রন্থ।

'সাহিত্য' গ্রন্থে প্রধানত সাহিত্যের তুত্ত্বালোচনামূলক রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যবিচারে তিনি পূর্ববর্তী নীতিবাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন নন্দনতত্ত্বে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের রস ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'ব্যঙ্গকৌতুক'—ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটিকাসহ সমজাতীয় প্রবন্ধ সংকলন। এরর প্রবন্ধ অংশটিতে ব্যঙ্গাত্মক নয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'আধুনিক সাহিত্য' উনিশটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন। সমকালীন লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। তবে বিচার বিশ্লেষণ কন্টকিত সমালোচনা এ নয়—সাহিত্যের রসবিচারই এই রচনার মূল কথা।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মোট ছয়টি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এগুলি হল—সভাপতির অভিভাষণ, রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ,সমাজ, শিক্ষা।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত ভাষণের লিখিতরূপ 'সভাপতির অভিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত সত্যবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হতে শুরু করেছিল। এই গ্রন্থেৰ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের যে ভবিষ্যতের চিত্র নির্দেশ করেছিলেন তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

সমজাতীয় অপর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—'সমূহ' ও 'স্বদেশ' এবং সমাজবিষয়ক রচনার সংকলন গ্রন্থ—'সমাজ'। কবি রবীন্দ্রনাথের গভীর সমাজ চিন্তার প্রতিফলন এই গ্রন্থে পাই।

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'শিক্ষা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিফলন এই প্রবন্ধগুলিতে মিলবে। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার স্বরূপ ও সামঞ্জস্য বিষয়ে তাঁর অসামান্য চিন্তাশীল মননদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—শব্দতত্ত্ব, ধর্ম শান্তিনিকেতন উপদেশমালা।

শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার চিত্র 'ধর্ম' গ্রন্থ। কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা গড়ে ওঠেনি, বিশ্বজীবন থেকে তিনি ধর্মজীবনের সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা সভায় বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণেরগ অনুলিখন—'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। যে ধর্ম ও দর্শন রবীন্দ্রজীবনের ভিত্তি স্বরূপ তারই সহজ অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য এই 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। এই ভাষণমালার পরবর্তী ভাগগুলি ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দুটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র। গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যায়। গদ্যরীতির দকি থেকে জীবনস্মৃতি এক অতুলন সৃষ্টি। সাধুভাষার বহিরঙ্গ আবরণ ভেদ করে চলতি ভাষার আমেজ এর অন্তরঙ্গ সুর মিলে গেছে। এই অনন্য স্মৃতিচারণা বালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

এই বছরে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্র' আরগ এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায় ছন্নপত্রের যুগে শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনের হাসিকান্নার কলগান কবি জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা। ছিন্নপত্রে সংকলিত ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত ১০৭ খানি পত্রের (সব কটিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা) একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছে। এই বিপুল পত্রসম্ভার কবির কাব্যানুভূতির সহজ পরিচয় বহন করে, সেই সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সহজ সাধারণ পরিচয়কেও প্রকাশ করে। এই পত্র সাহিত্য একাধারে সাহিত্য ও জীবনদর্শন। এরপর রবীন্দ্ররচনায় প্রবন্ধের দেখা মিলেছে ১৯১৫-তে শান্তিনিকেতন 'ভাষণমালা'র পরবর্তী পর্যায়ে। ১৯১৬-তেও এর পরবর্তী ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'জাপানযাত্রী'। ১৯১৬ সালে জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচির আমন্ত্রণে কবি জাপান গিয়েছিলেন। সেই সফরের কাহিনীই 'জাপানযাত্রী'। পত্রকারে লিখিত এই ভ্রমণাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থটি কবি মনের মাধুরী মেশানো অনুপম রচনা।

দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাত্মক গদ্যরচনা 'যাত্রী' প্রকাশিত হয়। এটি 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র একত্র সংকলন। এ জাতীয় রচনা তাঁর হাতে একাধারে ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ ও পত্র হওয়াতে একই সঙ্গে তথ্যবহুল ও রসস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা রাণু অধিকারীকে লিখিত এই পত্রগুচ্ছ 'রাণুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ স্বরূপ' প্রকাশিত হয়েছিল।

রাশিয়ার চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবজাগ্রত রূপ দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাকে 'তীর্থদর্শন' বলে বর্ণনা করেছেন। নবজাগ্রত রাশিয়ার সমাজজীবন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির একটি সুস্পষ্ট দলিল 'রাশিয়ার চিঠি'। ১৯৩২ সালে একটি ভাষণ পুস্তিকা প্রকাশ পায়—যাতে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষণ স্থান পেয়েছে।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'-এর পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সুবাদে দিলেন 'কমলা বক্তৃতামালা'; তাই 'মানুষের ধর্ম' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনবছর আগে অক্স ফোর্ডে প্রদত্ত "Religion of Man" বক্তৃতামালার বাংলা রূপান্তর এই পুস্তিকা।

১৯৩৫ সালে 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা' দুটি খণ্ডে কবি কর্তৃক মার্জিত ও নূতন সংযোজনযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে সঙ্গে পত্রালাপ 'সুর ও সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে চারখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—ছন্দ, জাপানে-পারস্যে, সাহিত্যের পথে ও প্রাক্তনী।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, তত্ত্ব ও স্বরূপ বিশ্লেষণের অনবদ্য প্রকাশ 'ছন্দ'। 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থটি পূর্ব প্রকাশিত 'জাপানযাত্রী' ও নূতন 'পারস্য ভ্রমণের' একত্র সংকলন।

সাহিত্যের বিচিত্রতত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার আলোচনা 'সাহিত্যের পথে'। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত ভাষণের সংকলন পুস্তিকা—'প্রাক্তনী'।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলা যেতে পারে।

এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসচেতন চিন্তার অনবদ্য সাহিত্যিক প্রকাশ 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ পায়। এ দুটি হল—'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়'। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র পত্রগুচ্ছ শ্রীমতী রাণী মহলানবিশকে লিখিত।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ—'বাংলাভাষা পরিচয়'-এ ভাষা সম্বন্ধে রহস্যবোধ এবং ভাষা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পত্র প্রবন্ধ সংকলন 'পথের সঞ্চয়'। এগুলি ১৯১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে য়ুরোপ আমেরিকা থেকে লেখা পত্রাবলীর সংকলন।

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য স্মৃতিচিত্রণ 'ছেলেবেলা' প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিশীল কবিচিত্ত অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। অনবদ্য চলিত ভাষা ও রীতিতে লেখা—'ছেলেবেলা'। 'জীবনস্মৃতি' যেমন সাধুভাষায় রবীন্দ্রগদ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, 'ছেলেবেলা' তেমনই কথ্যভাষায় রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম আত্মকথন।

জীবনের শেষ বেলায় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'সভ্যতার সংকট'। এটি কবির আশি বছরের জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত সভায় লিখিত অভিভাষণ। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ রচনা পালা শুরু হয়েছিল 'জ্ঞানাংকুর' পত্রিকায়, মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে আশি বছরে লিখিত এই অভিভাষণে তার পরিণত রূপের পরিচয় মেলে। মানবসভ্যতার ক্রান্তিকালকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এই ভাষণে। শতাব্দীর সূর্য রক্তসন্ধ্যায় অস্তগামী। সভ্যতার সেই সংকটকেই এই ভাষণে তুলে ধরেছেন কবি। কিন্তু মানবতার কবি সেই নৈরাশ্যেই শেষ ন'ন। বিশ্বাস ও প্রত্যয়েই তাঁর প্রবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সংকট উত্তীর্ণ এক শুভবোধ ও মঙ্গলচেতনায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের সর্বশেষে প্রকাশিত গ্রন্থ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত এই প্রবন্ধ গ্রন্থ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতী থেকে কবির বহু অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত রচনা উদ্ধার করে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাতের বিপুল পরিমাণ পত্ররাশি যা অদ্যাবধি প্রকাশমান।

১৯৪১-এর ৭ই আগষ্টের পর প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপচরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'মহাত্মাগান্ধী', 'বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', সমবায়নীতি, ইতিহাস বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, ছিন্নপত্রাবলী, পল্লীপ্রকৃতি, স্বদেশীসমাজ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব প্রকাশিত কয়কেটি প্রবন্ধ ও রচনার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এগুলি হল—স্বদেশীসমাজ (১৯৬৩), পারস্যযাত্রী (১৯৬৩), সঙ্গীত চিন্তা (১৯৬৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯৬৮), অরবিন্দ ঘোষ (১৯৭২) বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৭৭)।

আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি নিছক সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যমই নয়, কবির আত্মবিকাশের দলিল হয়ে উঠেছে, মননশীল আলোচনার প্রশস্ততায় রূপ নিয়েছে প্রবন্ধের।

তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়টি মনে হয় কিছুটা অনালোচিত অথচ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনিই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। মননশীল বিষয়চারী গদ্যরচনায় তিনি সারা জীবনই অক্লান্তভাবে ছিলেন সকর্মক। বিদগ্ধ সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকহিবর মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগভৈবব।.....এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।"

রবীন্দ্রপ্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিমনের প্রতিফলনে দীপ্ত অসামান্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন, যা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই সঙ্গে আরো আছে আত্মকথা, চিঠিপত্র, ভ্রমণকথা এবং কবিমনের মাধুরী মেশানো কিছু অসাধারণ গদ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যকে স্থূল বিষয়গত নির্দেশে শ্রেণীবিভক্ত করা দুরূহ। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রণীত গ্রন্থ তালিকায় রবীন্দ্রপ্রবন্ধকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল—জীবনকথা, জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকথা, ধর্ম, শিক্ষা, পত্রাবলী, বিবিধ। বর্ণানুক্রমে সেগুলি এরূপ—

১। **জীবনকথা** ঃ অরবিন্দ ঘোষ, আত্মপরিচয়, খৃষ্ট, চারিত্রপূজা, ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব, ভারতপথিক রামমেহান রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী।

২। **জাতীয় আদর্শ** ঃ কালান্তর, স্বদেশ, সভ্যতার সমকট।

৩। **ভাষা ও সাহিত্য** ঃ আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, বাংলাভাষা পরিচয়, লোকসাহিত্যে, শব্দতত্ত্ব, সাহিত্যে, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ।

৪। **শিক্ষা** ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শিক্ষা।

৫। **ভ্রমণ কথা** ঃ জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পথে, পথের সঞ্চয়, পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি, পারস্যযাত্রী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি রাশিয়ার চিঠি।

৬। **ধর্ম** ঃ ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়।

৭। **বিজ্ঞান** ঃ বিশ্বপরিচয়।

৮। **পত্রাবলী** ঃ চিঠিপত্র (একাধিক খণ্ড), ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী।

৯। **বিবিধ** ঃ আলোচনা, ইতিহাস, কবির ভণিতা ছন্দ পঞ্চভূত, বিচিত্রপ্রবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, সঙ্গীত চিন্তা, স্বদেশীসমাজ, সমবায় নীতি।

—আলোচনা থেকে বোঝা যায় গ্রন্থ নাম অনুযায়ী রবীন্দ্রপ্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির মত এবং তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা আটশোর-ও বেশি। এই বিপুল সংখ্যা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়।

৪.৬ অনুশীলনী

১। সাধনা ও হিতবাদী পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্পের পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পে বাস্তবতা বনাম গীতিধর্মিতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। সবুজপত্রে যুগে রবীন্দ্র ছোটগল্পের রীতি প্রকৃতি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। রবীন্দ্র ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ কিভাবে শিল্পিত সুষমায় পরিবেশিত—তার পরিচয় দিন।

৫। রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।
৬। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীমনস্তত্ত্ব কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
৭। লিপিকার কথিকাগুলিতে ছোটগল্পের অঙ্কুর কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তার পরিচয় দিন।
৮। তিনসঙ্গীর গল্প তিনটিতে রীতি ও প্রকৃতিতে আধুনিকতা পূর্ণ প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে—বিচার করুন।
৯। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্দেশ করুন।
১০। "পঞ্চভূত' প্রবন্ধসাহিত্য ধারায় অনন্য সংযোজন"—এ বিষয়ে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন।
১১। স্মৃতিকথামূলক গদ্যরচনার অনবদ্য প্রকাশ হিসাবে জীবনস্মৃতির মূল্যায়ন করুন।
১২। "কবি দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক ও অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর অসামান্য পত্রগুচ্ছ ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত"—মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরূপণ করুন।
১৩। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১৪। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।
১৫। শিক্ষণ চিন্তার আলোকে রবীন্দ্রপ্রবন্ধের পরিচয় দিন।
১৬। রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ (১৯১২), কাব্যপরিক্রমা (১৯১৪)
২. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিরশ্মি (১ম : ১৪০৫, ২য় : ১৪০৫)
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫)
৪. নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪৩)
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৮৪)
৬. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ (১৯৩৯), রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ (১৩৬২), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬২) রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৩৬২), রবীন্দ্র সরণী (১৯৬৫)
৭. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড : (১৯৯৮)
৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড : ১৯৩৩, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬)
৯. প্রশান্তকুমার পাল : রবি-জীবনী (৭ম খণ্ড : ১৩৮৯, ১৩৯১, ১৩১৪, ১৩৯৫, ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০৪)
১০. ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (১৯৯৬), চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৪০১), সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ (১৯৯০), রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪), চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি (১৯৯৪)
১১. ভূদেব চৌধুরী : রবীন্দ্র-উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে (১৯৮৪)
১২. শঙ্খ ঘোষ ' কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র-নাটক (১৯৯৫)
১৩. তপোব্রত ঘোষ : রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ (২০০১)
১৪. অমরেশ দাশ : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নব মূল্যায়ন (১৯৮৩)
১৫. সহদেব দে : রবন্দ্র-উপন্যাস-সমীক্ষা (১৯৭১)
১৬. মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তকবিপণি)—রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা (২০০৩)
১৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ—কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : তাঁর গল্প
১৮. রথীন্দ্রনাথ রায়—ছোটগল্পের কথা
১৯. ক্ষেত্র গুপ্ত (২০০২)—রবীন্দ্র গল্প : নারী বিদ্রোহিনী
২০. নন্দদুলাল বণিক—আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.